খণ্ডবিখণ্ড

খণ্ডবিখণ্ড

আফসার আমেদ

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ

১৯৬০

প্রকাশক

সুধাংশুশেখর দে

দে'জ পাবলিশিং

১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট

কলকাতা-৭০০০৭৩

ISBN-81-7079-080-8

প্রচ্ছদ

যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

মুদ্রাকর

বিজয়কৃষ্ণ সামন্ত

বাণীশ্রী

১৫/১ ঈশ্বর মিল লেন

কলকাতা-৭০০০০৬

IBRARY
SL/R.R
MR NO (R.K /GEN)

যাঁদের সীমাহীন স্নেহ ও ভালবাসায়
বেড়ে উঠেছি
প্রিয়ব্রত দেব
স্বপ্না দেব
শ্রদ্ধা ও ভালবাসায়

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

ঘরগেরস্তি

বসবাস

আফসার আমেদের ছোটগল্প

সানু আলির নিজের জমি

আত্মপরিচয়

স্বপ্নসম্ভাষ

খণ্ডবিখণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিষাদ

ট্রেন থেকে নেমে শ্লথ শরীরে ও মনে জনস্রোতে সমর্পিত হয়েছিল মিতা। দেহের এক গন্ধ আছে তার, সে গন্ধ নিজে পায়। মানুষের স্রোতে মিশে গিয়েও স্খলিত শিকড়বিহীন শাখাপ্রশাখাসহ গাছের মত ছিল সে উদ্ধারহীন। নিজের দেহের গন্ধ সে নিজে পায়। গন্ধের ভেতর সে ছিল একা। জনস্রোত তাকে উজিয়ে নিয়ে যায়। চন্দনস্নিগ্ধ নিজের গন্ধে নিজে মরে থাকে। স্রোত তার গন্ধ নেয় না, সে স্রোতের গন্ধ নেয়। অথচ প্রবলতর সে একা বোধ করে।

মিতা তাকায়। শুধু মানুষ। জনস্রোত। জনস্রোতের নিজস্ব এক গতি আছে। সেই গতির ভেতর তার সমস্ত ইচ্ছা হারিয়ে ফেলে মিতা। ভেতরে সে মিশে যায়। কেউ পেছন থেকে ধাক্কা দেয় শরীরের স্পর্শ দিয়ে। কারো কনুই এসে পড়ে তার বুকে। কেউ তার কোমরের খাঁজে হাত দিয়ে ঠেলে। পাছায় শরীরের ঠেলা পায়। শরীরে এক শিহর অনুভব করে।

বয়স তার ছাব্বিশ। বিধবা। সে বিধবা, এই বোধ থাকলে, মনে মনে তার আরো বয়স বেড়ে যায়। কিন্তু দেহের গন্ধে নিজে মরে থাকা জনস্রোতের ভেতর যুবতী মনটা তাকে ভাসিয়ে দেয় এখন। যা তার প্রবহ ইচ্ছার শরীর চায়। যুবতী। যুবতী মনটাও বেরিয়ে আসে। অন্তর্বাসসহ সে জামা পরে। শাদা শাড়ি না পরে সে ছাপা রঙিন শাড়ি পরে। আর রেস্টুরেণ্টের আয়নায় তার এই চেহারার ছবিটা নিজেই দেখেছে। জনস্রোতের ভেতর সে যুবতীই হয়ে যেতে পারে? স্খলিত শিকড়বিহীন ছিল তার বিধবামন। সেজন্যে মিতা এমন আত্মনিয়ন্ত্রণহীন, আচ্ছন্ন। এই ঘোর নিজের মধ্যেই তৈরি হয়, এবং সে নিজেই আত্মতাড়িত হয়ে তৈরি করে। এই ঘোরের মধ্যে থাকা ছাড়া তার উপায়ও নেই। একার ভেতর যখন থাকে, তখন এই ঘোর তাকে পেয়ে বসে, কিছুতেই ছাড়িয়ে নিতে পারে না নিজেকে। ক্রমশ মিশে যায়, ক্রমশ সমর্পিত হয়। জনস্রোত, সার সার বাড়ি, দোকান, হাঁকাহাঁকি, কোলাহল, ট্র্যাফিক-পুলিস, পুলিস, গাড়িঘোড়া, রিকশো সাইকেল, ছায়া রোদ এইসব তার পাশে থাকে। চতুঃপাশের জীবনের সাড়া। কলকাতার জীবন। তার ভেতর মিতা সমর্পিত হয়। মন নেমে আসে ভ্রূসন্ধিতে, অথবা নাকের ডগায়।

বারাসাত লোকাল থেকে শেয়ালদা স্টেশনে নেমে ডানদিকের এক নম্বর গেট দিয়ে মির্জাপুরে পড়তে পারত সে। কিন্তু স্রোত তাকে ঠেলে নিয়ে এল চার

নম্বর গেটের দিকে। নীচে, দুটি পামগাছের দিকে। সন্ধ্যায় আলোকিত জলের ফোয়ারা যেখানে থাকে। যেখানে ঢাকিরা পুজোর দুদিন আগে ঢাক নিয়ে বসে, বাজায়। ট্যাক্সি-স্ট্যান্ড বাঁ-দিকে। দুটি ফুটপাথের চা-দোকান। স্রোতের ভেতর সে স্রোত হয়ে যায়। চলতে চলতে সে সুড়ঙ্গের ভেতর চলে আসে। ছায়া যেখানে স্নিগ্ধ হয়ে আছে। উঁচু-নিচু পাথুরে রাস্তায় স্যান্ডেল ফট ফট শব্দ করে উঠছে। কাঁধের ফোমের ব্যাগটার ডান্ডিটা বাঁ-হাতে চেপে ধরে মিতা। গলার আঁচল টেনে ধরলে বেণীর গিঁট পিঠে অনুভব করে।

চুল এখনো ভিজে আছে তার! এখন সকাল আটটা কুড়ি! সকালের স্নান অনেকক্ষণ শীতলতা ধরে রাখে। সাতটা দশের বারাসাত লোকাল। সকাল ছটায় স্নান। খাওয়া, কাপড় পরা, টিফিন নেয়া, এসব করতে করতেই পৌনে সাতটা বেজে যায়। কাঠগোলা থেকে দুদ্দাড় দেড় কিলোমিটার হেঁটে ট্রেনটা ধরে। মাঝে মাঝে ট্রেনে বসতেও পায়। আহা! সাতটা দশ না ধরলেই নয়। সকাল সাড়ে পাঁচটায় তার ওঠার কথা। ঘুম থেকে জেগে ওঠার কথা। কিন্তু মিতা জেগে ওঠে অনেক আগে। কখনো দুটো আড়াইটে, কখনো তিনটে। রাত এগারটায় শুতে গিয়ে ঘুম আসে দেরিতে। নানান চিন্তা আসে। ঘুম আসে না। আবার কখন সে ঘুমিয়ে পড়ে নিজেই টের পায় না। এক সময় ছ্যাঁৎ করে ঘুম ভেঙেও যায়। দেয়ালে আঁটা পেরেকে ঝোলানো নরম আলোর শিখাটা শুয়ে শুয়ে হাত বাড়িয়ে ডাগর করে, বালিশের তলা থেকে হাতঘড়িটা চোখের সামনে নিয়ে আসে মিতা। দুটো আড়াইটে তিনটে। জেগে থেকে শুয়ে শুয়েই সে সাড়ে চারটে পাঁচটা বাজিয়ে দেয়। অসহ্য হয়ে ওঠে বিছানা তার। দরজা খুলে বেরিয়ে আসে তারপর।

রবিবার ছাড়া তাদের দিনের রোদের উঠোন সে দেখে না। সকালে বেরিয়ে এসে রাতে বাড়ি ফেরে কখনো আটটা নটা দশটা। তারপর রাত এবং একা এবং অন্ধকার এইসব মিলিয়ে সে কেমন বিষণ্ণ হয়ে থাকে. সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত যখন কাজের মধ্যে থাকে, এমন তীব্রতা তার থাকে না। তবে কাজের মধ্যেও থাকে। রাতে দিপু তার কাছে শোয় না। তার কাকিমার কাছে শোয়। দু-বছর ধরে বিন্দুরই বেশি ন্যাওটা হয়ে গেছে দিপু। অন্ধ শ্বশুরের কাশির শব্দ সারারাত পায়। দেওর টিউশনি করে নিজের পয়সায় বি. এ. পড়ে হাবড়া কলেজে। সে নিঃশব্দে ফেরে ঘরে, রাতে। দিপু থাকে মেজকাকিমার ঘরে। মিতার মেজ দেওরের মসলন্দপুরে সাইকেল সারাইয়ের দোকান আছে। মুলিবাঁশের কাঠামোয় টানা তিনখানা দরমা দেয়া ঘর। একটাতে মেজ দেওর বউ ছেলে নিয়ে থাকে। একটায় অন্ধ শ্বশুর আর ছোট দেওর। বাকি ঘরটায় মিতা। নিচে চিলতে উঠোন। একটা পেঁপেগাছ হাড়ে গোড়ে পেঁপে বুকে নিয়ে ঠিক অন্ধকার জানলার সামনে থাকে। একটু তফাতেই দত্তদের পুকুর। ঘাট। কাঁটাঝোপ, অন্ধকার, রাত আর নৈঃশব্দ। চাঁদের আলোতেই ঘরের ছায়া

উঠোনতলায় নেমে আসে।

আজ উনিশ শো অষ্টআশি সাল। পূর্ববঙ্গে তিন বছর আগে মিতা বিধবা হয়। এক বছর বিধবা অবস্থায় পূর্ববঙ্গে, বাংলাদেশে ছিল। দু-বছর হল বারাসাতে। শ্বশুর দেওররা আগে আগে ভারতে চলে আসে। মিতা ও তার স্বামী আসে নি। দেশ ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের সায়েসপাড়া, নয়াবাড়ি গ্রামে। শ্রীনগর থানা। এখন ও-দেশ আর দেশ নেই মিতাদের। নেই। ওখানেই তার স্বামীকে হারিয়ে এসেছে। বুক হু হু করে ওঠে। নেই নেই। ভারত বাংলাদেশ দুই রাষ্ট্র। নয়াবাড়ির শ্মশানে তার স্বামী ছাই হয়ে গেছে। ধোঁয়া হয়ে বাতাসে মিশে গেছে। কোনোদিন ফিরে যাবে না, তাদের জন্মভূমি দেশ রাষ্ট্রে। কখনোই ফিরে পাবে না তার স্বামীকে। এখানে এসে সে রাষ্ট্রিক ভেদ আর পুরুষহীন ছিন্নতায় দিবসযামিনী কাটায়।

এখন মিতা নিজের দেহের গন্ধ নিজে পায়। বিষাদে স্খলিত শ্লথ হয়ে থাকে। কাছেই তার কর্মস্থল। সকাল নটা থেকে সন্ধে পাঁচটা পর্যন্ত তার ডিউটি। বাঁধাইখানায় কাজ করে, পাটোয়ার বাগানে। দু-তিন ঘণ্টা ওভার-টাইমও করে থাকে কোনো-কোনোদিন। ফর্মা ভাঁজাই, সেলাইয়ের কাজ করে। মানুষের পড়ার বই হয়। সকালবেলা বারাসাত থেকে ট্রেন ধরে তাকে কলকাতা চলে আসতেই হয়। না এসে উপায়ও নেই। আর না এসে শান্তি পায় না। এলো-বেণী চুল ভিজে থাকে স্টেশনে নামার পরও।

স্টেশনে নেমে ডান দিকের একনম্বর গেট ধরে মির্জাপুরের দিকে চলে যায় প্রতিদিন। জগৎ সিনেমা আর রাজাবাজার ট্রামডিপোর মাঝামাঝি গলিটা দিয়ে ঢুকে যেতে হয় তাকে প্রতিদিন। আজ সে চার নম্বর গেট দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। যে-দিকটা জনস্রোত বেশি ছিল। মাঝে মাঝে এ-রকমটা তার হয়ে থাকে। সুড়ঙ্গ পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীলরতন হাসপাতাল ও প্রাচী সিনেমার সামনে দাঁড়িয়ে থমকে যায় মিতা। এখানে এসে ভুল করেছে, বুঝতে পারে। অনেকটা তাকে হেঁটে যেতে হবে। অনেকটাই স্বপ্নোত্থিতের মত দাঁড়িয়ে চার-দিকে দেখে সে। বাস লরি ট্যাক্সি ট্রাম স্কুটার মোটরসাইকেল নানা গাড়ি উড়াল পুলের ওপর উঠে পড়ছে। নেমে আসছে উড়ালপুল বেয়ে। পুব দিকে সে দাঁড়িয়ে আছে। পেছনে সকলের সূর্য। রাস্তার ওপর মিতার লম্বা ছায়া পড়ে। গাড়িঘোড়াগুলি মিতার ছায়াকে পিষে যায়। মিতা শিউরে ওঠে না। অনেকটাই সে ভয়শূন্য। স্খলিত। রাস্তাটাকে পেঁচিয়ে কুড়ি নম্বর ট্রাম ঘড় ঘড় শব্দে উড়ালপুলে উঠে যায়।

হঠাৎই মিতা রাস্তা পেরিয়ে, বাঁ-হাতে প্রাচী সিনেমা রেখে উড়ালপুলে উঠে যায়। হালকা পায়ে উড়ালপুলের বুক বেয়ে উঠতে থাকে। বাঁ-হাতে কোলে মার্কেট, মানুষ বয়ে যায় নদীর মত। বড় বড় বাড়ি, হোটেল, অফিস। ডান দিকে শেয়ালদা স্টেশন, বি-আর সিং হাসপাতাল। শেয়ালদা স্টেশনটা

বিশালতায় তার চোখে ধরা পড়ে। সেখান থেকে বেরিয়ে আসছে অসংখ্য মানুষ। উড়ালপুলের বিশালতা আর শেয়ালদা স্টেশন আর জনজোয়ার এইসব কিছু মিতা তার চৈতন্যে নিয়ে নেয়।

সে জানে অন্যায় করেছে ফ্লাইওভারে উঠে। মানুষের হাঁটাচলা ও ধীরগতি যান উড়ালপুলে নিষিদ্ধ। এটা জেনেও অন্যায়টা করতে চেয়েছিল মিতা। তাকে উঠে পড়তেই হয়েছিল উড়ালপুলের ওপর। তার উপায় ছিল না। এবং সে এইভাবেই যাবে। তার ক্রোধ, ক্রোধ, অভিমান না। তার ইচ্ছা, ইচ্ছা, করুণাপ্রার্থনা না।। অসম্ভব একটা জেদ খেলছে রক্তের ভেতর। এভাবেই যাবে। আর মনের গতির আচ্ছন্নতায় এভাবে যাওয়াটাকে অবলম্বন করছিল মিতা।

এখনো সকালের হাওয়া মরে যায় নি রোদের তাতে। হাওয়ায় তার আঁচল উড়ছিল। পেছন থেকে আসা গাড়িগুলির হাওয়া লাগছিল তার শরীরে। গাড়িগুলো যেভাবে তার পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল, তাতে শিহরিত হতে পারত, কিন্তু ভ্রূক্ষেপহীন আঁচল উড়িয়ে দ্বিধাশঙ্কাহীন সে উড়ালপুলের ওপর দিয়ে হাঁটতে থাকে। নীচে গিজ গিজ করছে মানুষ। ব্রিজের তলা। নানা রকম দোকান। নানা শব্দ হেঁকে নানা রকম জিনিশ বিক্রি করছে। সংসারের নানা কিসিম।

শেয়ালদা স্টেশনের ঘড়িতে আটটা বত্রিশ বাজে। কোনো মানুষই উড়াল-পুলের ওপর হাঁটছে এটা দেখতে পেল না মিতা। এবং সে দেখল এদিক-ওদিক থেকে উর্ধ্বশ্বাসে গাড়িঘোড়া ছুটে এসে কেমন যানজট পাকিয়ে ফেলল ব্রিজের সব জায়গা জুড়ে। দু-দিকের গাড়ির স্রোত তার চোখের সামনেই থেমে গেল। সেইসব গাড়ির ভয়ংকর ভয়ংকর সব চাকার গা ঘেঁষে সে-ই এক-মাত্র বিনা বাধায় খানিকটা হেঁটে গেল। কিছুটা এগিয়ে গিয়েই দেখল পর পর কয়েকটা গাড়ি ব্রিজের রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। গলে যাবার কোনো পথই নেই তার সামনে। থেমে গেল মিতা।

উড়ালপুলের যেখানে শীর্ষ, ঠিক সেইখানে যানজট। গায়ে গা-ঘেঁষে সারি সারি লরি বাস-ট্যাক্সি-প্রাইভেট কারগুলি। একচুও নড়ে না। যেখান দিয়ে উড়ালপুল নেমে গেছে মহাত্মা গান্ধি রোডে। এই সন্ধিমুখে গাড়িগুলি জড়িয়ে গেছে। একটুকু ফাঁক নেই, যেখান দিয়ে গলে যেতে পারে মিতা। হাওয়ায় তার আঁচল ওড়ে। শরীর তার স্থির হয়ে থাকে।

কতকগুলি গাড়ির গর্জন। ধোঁয়া। আকাশে ধোঁয়া ওড়ে। বিন্দু বিন্দু সময় চলে যায়। হাওড়ার দিকে যাওয়া গাড়ি হাওড়ায় যেতে পারে না। শ্যামবাজার আড়িয়াদহ সিঁথি বাগুইআটি লেকটাউন দমদম সল্টলেক-সেচভবনের গাড়ি ব্রিজের ওপর থমকে আছে। এদিকে এসপ্ল্যানেড ঢাকুরিয়া গড়িয়া বেহালার গাড়িও থমকে থাকে। সময় চলে যায়, আর মিতা স্থির থাকে।

শেয়ালদা স্টেশনের ওপর দিয়ে সোজা প্লেন উড়ে যায়। প্লেনের শব্দে হঠাৎই কেঁপে ওঠে মিতা। তার যখন ছ সাত বছর বয়স তখন বাংলাদেশে যুদ্ধ হয়েছিল। জয়বাংলা হয়েছিল। ভয়ংকর ছিল তখন এই প্লেনের শব্দ। এখনো প্লেনের শব্দ শুনলে চমকে ওঠে সে। তেমনি, পাটোয়ার বাগানে চোদ্দর তিনের মালিকটাকে দেখলে মিতা চমকায়। গায়ের রঙ, চুল, চেহারা চোখ সবকিছু যেন মিলে যায়। হুবহু তার স্বামীর মত দেখতে। এবং সে প্রতিদিন চোদ্দর তিনের গলি দিয়ে ঢুকে তার মালিকের কারখানায় যায়। যেতে যেতে চলার ভেতর দিয়ে যতটুকু দেখা যায় চোখ তুলে ততটুকুই দেখে। ফেরার সময়ও দেখে। জানে লোকটা অন্য-একজন। গলার স্বর আর মিতার দিকে তাকানোর মধ্যে বিস্তর ফারাক। সেই কারণেই মিতা সঙ্গে সঙ্গে সরে যেতে পারে। কিন্তু দেখে যায় প্রতিদিন। প্রবেশ প্রস্থানে। তেমনি মালিকের কারখানাঘরে কারো গলার স্বর, তাকানো, হাতের মুদ্রা, এত অদ্ভূতভাবে মিলে যায় যে, মিতা চমকিত হয়। মানুষটা সকলের মধ্যে উঠে আসে। কিন্তু মানুষটা নেই। বাংলাদেশে সে মরে গেছে। ভারতবর্ষেও সে নেই।

চাকাগুলি স্থির ছিল, নড়ে ওঠে। গর্জন করে ওঠে গাড়িগুলি। ধোঁয়ায় আকাশ ভরে যায়। ক্রমশ বেপরোয়া হয়ে ওঠে গাড়িগুলি। মিতা ফাঁক পেয়ে একটু এগোয়, পেছনের গাড়ির চাকা এসে তার ওপর হামলা করে। গর্জন করতে থাকে ভয়ানক। আরো আঁচল তার উড়ে যায়। পেট্রল ডিজেলের গন্ধে বাতাস ছটফট করে। তার ভেতর দিয়ে মিতা এগোয়, গাড়িও এগোয়।

ট্রাফিক পুলিসকে সে চমকে দেয়। ট্রাফিক পুলিস ব্যস্ত। অবলীলায় উড়ালপুলের ক্রশিং পেরিয়ে যায়। এবং পেছনের গাড়িগুলি স্রোত হয়ে যায়। হাওড়ার গাড়ি হাওড়ার দিকে ছোটে। দক্ষিণের গাড়ি দক্ষিণের দিকে ছোটে। উত্তরের গাড়ি উত্তরের দিকে যায়। উড়ালব্রিজের বাঁদিক ঘেঁষে নামতে নামতে সেই স্বপ্নোত্থিত অবস্থা ফিরে পায় আবার মিতা। গাড়ির স্রোতের সঙ্গে মিশে গেছে। সন্ত যোহনের গির্জা ডান দিকে। পাশে বিশাল এক হোর্ডিং। এক গির্জায় লেখা দেখেছিল, 'তুমি আইস, তোমাকে আমি শান্তি দিব।' বাংলা ভালই পড়তে পারে মিতা। গির্জার ভেতরে কী শান্তির জাদু আছে জানেনা। প্রতিদিন হাঁ করে দেখে। কখনো দেখে, খাকি হাফপ্যান্ট-পরা মেথর বেরিয়ে আসে, বা কখনো খবরের কাগজওয়ালা কাগজ দিতে যায়। কিংবা ঘণ্টা বাজে। গির্জার ঘণ্টার শব্দ শূন্যতাকেই বাড়ায়।

মির্জাপুরের মোড়টায় একটা ট্রাম জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখে, সোজা আর যায় না মিতা। মির্জাপুরের ট্রামলাইনের মাঝখান দিয়ে হাঁটতে থাকে। পেছনের ট্রামটা তার দিকে ধাওয়া করে। ডান দিকে ট্রামলাইনে সরে যায়। সামনে থেকে একটা ট্রাম আসছে। এ-পাশ ও-পাশ কোথায় যাবে, ছটফট করে মিতা। দুদিকে রেলিং-ঘেরা ফুটপাথ। মুহূর্তেই রেলিঙের একটা রড

ভাঙা দেখতে পায়। তার ভেতর দিয়ে টুক করে ঢুকে যায় মিতা। ট্রাম দুটি গড় গড় করে তার গায়ের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। মুহূর্তেই বুকটা ধুক-পুক করে ওঠে শরীরের ভেতর। শরীরের ভেতর বুক জেগে ওঠে। মুহূর্তে আত্মসংকটের শঙ্কায় থমকে যায়। তারপর চলতে থাকে আবার। এখানে কাগজের দোকানগুলি সারি সারি। এই ট্রামলাইন মিশেছে পূরবী সিনেমার কাছে। আর একটু ভেতরে অরুণা সিনেমা। সোজা কলেজ স্ট্রিট। বইপাড়া। কলেজ স্কোয়ার। কলেজ স্ট্রিট মার্কেট। ট্রামের তার, ক্রশিংয়ের ট্রাফিক আলো। অনতিদূরেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পাশে মেডিকেল কলেজ। আরো পেছনে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ পেরিয়ে গেলে লালবাজার। তারপরেই রাইটার্স বিল্ডিং। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। জি পি ও। আরো পেছনে নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং। গঙ্গার ধার। বাবুঘাট আর্মেনিয়া ঘাট। জগন্নাথ ঘাট। হুগলি নদীর ওপর ঝুলে আছে বিশাল হাওড়ার ব্রিজ। সামনেই বড়বাজার। হাওড়া ব্রিজের মুখ থেকে বিশালতায় উড়ালপুল ব্রেবোর্ন রোড-এ পড়ে। ক্যানিং স্ট্রিট। চীনেবাজার। ওদিকে পোস্তাবাজার, শোভাবাজার, বাগবাজার, শ্যামবাজার। এদিকে এসপ্ল্যানেড, হাজরা, কালীঘাট, টালিগঞ্জ, বালিগঞ্জ। সিঁথি, বেহালা দুদিকে দু-প্রান্তে। মিতা কলকাতায় আছে।

বাস্তুহারা ব্যবসায়ী সমিতির পাশ দিয়ে রামনাথ বিশ্বাস লেনে ঢুকে পড়ে। নিজের হাতের ঘড়িতে সময় দেখে। নটা পাঁচ। একটু যেতেই বুদ্ধু ওস্তাগর লেনে পড়ে। ডান দিকে অ্যান্টনিবাগান লেন।

কালী সোম স্ট্রিট আর পাটোয়ার বাগানের ছ-নম্বর সংলগ্ন ছোট একটা গলি আছে। গলির মুখে ঢাকনিসহ এক ম্যানহোল। পা দিলে স্ল্যাবটা নড়বড় করে। অথচ এই গলিতে ঢুকলে ম্যানহোলের ঢাকনিতে পা দিতেই হয়। এই গলিতে এলে শরীরটা একবার নড়ে ওঠে। গলির মুখে দেয়ালে কর্পোরেশনের একটা বাল্ব দেয়া আছে। সন্ধেবেলা গলির ছায়া আলো লেগে তরল হয়ে যায়। দিনে অদ্ভুত এক ছায়া।

এ-রকম গলি চোদ্দর তিন, চোদ্দর চার আরো অনেক অনেক। এ গলি পেরলে চোদ্দর তিন পাটোয়ার বাগান, তার পর চোদ্দর চার। প্রতিদিনই অভ্যাসমত তাকে চোদ্দর তিনের গলিতে ঢুকে যেতে হয়। দশ মত মিনিট। চোদ্দর তিনের গলির ভেতর দশ বাই ছয় বাঁধাই কারখানার ভেতর একটা নির্দিষ্ট জায়গায় বসে থাকে লোকটা। দরজার সোজাসুজি বসে থাকে। আজ দেখা গেল উল্টো দিকে মুখ করে কী একটা খোঁজাখুঁজি করছে। ভেতরটা চমকিত হয় প্রতিদিনের মত মিতার। এই চেহারা, চুল, চোখ মুখ, ঘাড়, পিঠ, হাত-পা এ সব-কিছুর এত মিল যে, মনে হয় সেই দেহটা অন্য-আত্মা নিয়ে বসে আছে। সেজন্যে সে দেখেই শান্ত হয়। লোকটার নাম, আত্মপরিচয় একেবারেই অন্য। জাভেদ মিয়া। অথচ অদ্ভুত মিল তার স্বামীর চেহারার সঙ্গে। এখান দিয়ে

তাই তাকে প্রতিদিন যেতে হয়, আসতে হয়। কেউ এর রহস্য জানে না। এমনকি জাভেদ মিয়াও না। জাভেদ মিয়া জানবে কী করে! জাভেদ মিয়ার চোখে চোখ পড়ায় কি কিছু আঁচ পায়? জানে না মিতা। জানে শুধু চোদ্দর তিনের গলির ভেতর বিশ বাইশটা বাঁধাই কারখানার ভেতর জাভেদ মিয়ার একটি। তাতে দু-চারজন লোক নিয়ে জাভেদ মিয়া কাজ করে। বউ ছেলেমেয়ে তার থাকে এখানেই। কারখানার পেছনে, আরো একটু ভেতরের দিকে। ছোট একটা ঘরে। এই গলির ভেতরই কর্পোরেশনের টাইম কলটায় জাভেদের বউ, মেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সালোয়ার কামিজ পরা তার প্রায় যুবতী মেয়েটা গামলায় কাপড়চোপড় নিয়ে সাবান ঘষে, ধোয়। বালতি ভরে জল নিয়ে যায়। জাভেদের বউ রোগা, চিকণ শরীর। নানা চিৎকার চেঁচামেচি করে। সদ্যোজাত শিশুকে বুকে জড়িয়ে গলিতে ঘুরে বেড়ায়। বাইরে, ডাক্তারখানা, কেনাকাটা, দরগা-মাজার-থানে গেলে বোরখা পরে যায়।

চোদ্দর চা'রর ভেতর ঢুকলেই বুকটা ধক্ করে ওঠে মিতার। প্রায়, প্রতিদিনই। ছ ফুট বাই আট ফুট ছোট ঘরটায় খদিজা বেগম থাকে। তার তিন ছেলে মেয়ে। শিশুপুত্র কোলে। আটমাস হল তার স্বামী টি. বি-তে মারা গেছে, মুখে রক্ত তুলে। এই ঘরে তিনজন মেয়ে কারিগর নিয়ে নাম্বারিং করায়। তিনজন আর তাকে নিয়ে চারজন। চারটে তক্তিতে ঘরটা ভরে যায়। ঘুমন্ত শিশুপুত্রকে পাশে শুইয়ে রাখে। দরজার সামনে খদিজা বেগম প্রায় গালে হাত দিয়ে বসে থাকে। মাঝে মাঝে কাঁদে গলা ছেড়ে। গলিটা চোখের জলে যেন ভাসতে থাকে। ছায়ায় আলোয়, ক্লিন্ন, এঁটো উচ্ছিষ্টে, পূতিগন্ধ-ময়তায় গলি যেন কারো কারো হৃদয় হয়ে ওঠে।

মাজদের কারখানার দরজায় মুখ বাড়ায় মিতা, নীচে সকলে কাজে বসে গেছে। মালিক ওস্তাদ কারিগর সাগরেদ বয় সকলে কাজের ভেতর নীরব হয়ে আছে। নৈর্ব্যক্তিক অভ্যাসের চোখে সকলে তাকে দেখল চোখ তুলে। বুকটা হু হু করে উঠল। এমনটাই অনুভূতি হয়। সকলের তাকানোর প্রতিক্রিয়ার ভেতর মিতাকে চলে যেতে হয়। পেছনে কেউ তাকে তাড়া করেছিল যেন, এমন ভাব নিয়ে দশ ফুট বাই বারো ফুট কারখানাটার গোপন আড়ালটার দিকে চলে যায়। মুহূর্তে যেন কপালে ঘাম ফুটে উঠল বিন বিন। কাটিং মেশিনের পেছনে গোপন আড়ালে চলে যায় মিতা। ওপরে মাচায় খুটখাট নড়াচড়ার শব্দ হয়। তার সেলাইয়ের সঙ্গী সবিতা ঠিক সময়ে এসে গেছে। মিতার একটু দেরি হল। কাটিং মেশিনের আড়ালে গিয়ে ব্যাগটা ঝুলিয়ে রাখে একটা পেরেকে। মেশিনের পেছনে দেয়াল ঘেঁষা সরু ফালি জায়গাটা আড়াল। কিন্তু ফাঁক থাকে। মেঝেয় পুরুষেরা যারা কাজ করছে, তারা যদি এদিকে তাকায়, তা হলে মিতাকে দেখতে পাবে। দেখার অনেক মুহূর্ত গড়ে ওঠে। না দেখতে দেবার জন্যেই ত তাকে এই আড়াল বেছে নিতে হয়। এখানে

সে শাড়ি বদলাবে। ছাপা শাড়িটা গা থেকে খুলে ফেলে। শুধু সায়া আর ব্লাউজ পরে থাকে। নীচু হয়, শাড়ি গোছায়, নিজের বুক নিজে দেখে। স্তনদুটি নিজেরাই কাঁপে। চোখের পাতা নেমে আসায়, ভূমিতে যেন সে নমিত হয়। শাড়ি খুলে ফেলবার পর এইভাবে সে কিছুক্ষণ থাকে। এবং তাকায় না কারু দিকে। নিজের দিকেই তাকিয়ে থাকে। নিজের দেহের দিকে। মুখ নত করায় চোখের ছায়ায় চোখ কালো কাজল হয়ে থাকে। নাকের একপাশে ছায়া, অন্য পাশে আলোর রেখা। ব্লাউজটা নীচের দিকে টেনে দেয়। স্তনদুটি নাড়া খায়। রেখে যাওয়া কাজের শাড়িটা পরতে শুরু করে। নিজের দেহের দিকে তাকিয়েই। শাড়ি পরে, আর নিজেকে দেখে। শাড়ি পরা হয়ে যেতে মেশিনের ফাঁক দিয়ে পুরুষগুলোর দিকে তাকায়। কেউ তাকিয়ে নেই তার দিকে।

কেউ কি তাকে একবারও দেখে নি? সে যদি শাড়ি পরার সময় সতর্ক চোখে পুরুষগুলোর দিকে বার বার তাকাত, তাহলে পুরুষগুলো তাকাবার বাধা পেত। সে ত দেখে নি। শাড়ি বদলানো হয়ে যাবার পর সে তাকায়। এই নিত্যদিনের স্বভাব থাকলে, পুরুষগুলোও তাকাবার বাধা পাবে না। সেইটুকু সময় দেখে নেয় হয়তো।

কারো দিকে না তাকিয়ে মই বেয়ে মাচায় উঠে যায় মিতা।

পা দুটো ছড়িয়ে নিজের মনে ঘন হয়ে সবিতা তক্তির ওপর বই রেখে সেলাই করছে। ফর্মার ওপর ফর্মা সেলাই করছে। তক্তির দু-পাশে পা দুটো ছড়ানো। কোলের কাছে শাড়ি গুটিয়ে রেখেছে। জঙ্ঘা থেকে পা পর্যন্ত সম্পূর্ণ নগ্ন। ফর্সা পা দুটি। পড়ে কেটে যাবার শৈশবের দাগ হাঁটুতে, ফোঁড়া ঘায়ের দাগ দেখা যায়। নির্বিকার কাজ করে চলে সবিতা। নিজের তক্তিটা টেনে নেয় মিতা। সবিতা মিতার দিকে তাকাচ্ছে না। কাজের স্রোতের মধ্যে আছে।

মিতাও কাজ শুরু করে দেয়। তারা দুজনেই বিধবা। সমবয়সী।

পাটোয়ার বাগান চোদ্দর তিন, চোদ্দর চার গলি দুটি, দুটি চরিত্র হয়ে উঠছে। অপ্রশস্ত, প্রায়ান্ধকার, দুর্গন্ধযুক্ত এই গলি। মূল চরিত্রও এই দুই গলির সংলগ্নতাকে মানে। চোদ্দর তিনের গলির মধ্যে বিশ বাইশটা খাতা বাঁধাইয়ের কারখানা আছে। যার মধ্যে গড়ে সাতজন কাজ করে থাকে। দুজন কারিগর, দুজন সাগরেদ, একজন বয় ও দুজন মহিলা শ্রমিক। এই শ্রমিকরা যে সব সময় একই ঘরে থাকে তা নয়। তবে হিশেবটা একই রকম হয়। চোদ্দর তিনের সঙ্গে চোদ্দর চারের গলির ফারাক এমন কিছু নয়। এতেও বিশ বাইশটা ছোট খাতা-বই বাঁধাইয়ের কারখানা আছে। কাটিং মেশিনের কোপের শব্দ, লেইয়ের গন্ধে দুটি গলিই একই রকম। সংলগ্নতার ভেতর দুটি গলি দুটি চরিত্র হয়ে ওঠে।

সকাল সন্ধে বিকেল রাত গলির আলোছায়া নানা রঙে বদল হয়। একই রকম থাকে না কখনোই। কখনো আলোটা কমে, কখনো ছায়া বাড়ে। কখনো আলো বাড়ে, ছায়া কমে। কখনো সমান আলোছায়া। সম্পূর্ণ অন্ধকার থাকে কখনো, কখনো কিন্তু সম্পূর্ণ আলো থাকে না, কখনোই। কখনো স্যাঁৎসেতে ভিজে থাকে। কখনো শুকনো খটখট করে। তখন মাছিও এঁটোতে রস পায় না। গলিগুলি রাস্তার দিকে গড়ানে। বর্ষায় সম্পূর্ণ ডুবে যায়। লোডশেডিংয়ে মোম ও কেরোসিনের আলোয় টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে। যেখানে আলো পড়ে সেখানে গলিটা আছে। যেখানে আলো নেই, সেখানে অনস্তিত্ব অনন্ত কালো। গলির মুখে কর্পোরেশনের বাল্ব। রাতের বেলা আলোছায়ায় ভরে থাকে।

গলিতে চলাফেরা করলে মাটি কাঁপে, ইট কাঁপে, দেয়াল কাঁপে। গলির দু-পাশের কারখানাগুলি উঁকি দিয়ে থাকে। ভেতরে খালিগা শ্রমিক, মেঝে, কাটিং মেশিন, মাচা, ফর্মার স্তূপ, বই-খাতার স্তূপ। অধিকাংশ মানুষ গ্রাম থেকে আসে। রাতে এই গলি নিষ্প্রাণ শূন্য হয়ে যায়। দরজায় তালা ঝোলে। কোনো কারখানায় রাত জেগে কাজ হয়।

কাজের মধ্যে নিঃশব্দ নীরবতা থাকে। নিরীহ একটি প্রাণেরই বাস যেন এইখানে। যার কোনো ক্রোধ নেই, যার কোনো উচ্চারসম্ভিভ হাহাকার নেই, নেই অপ্রাপ্তি প্রকাশ। কাজের মধ্যে তারা মিশে যায়। হয়তো এইটাই প্রকাশের ধরন। গলিটাও বাক্‌হীন একটা চরিত্র হয়ে যায় তাই।

গলিটায় মুটে আসে, ঠেলার লোক আসে। টেম্পোওয়ালা, রিক্সাওয়ালাও আসে। শিশু শ্রমিক তার শরীরের ওজনের চেয়ে বেশি কাগজ-বই-খাতা বয়ে নিয়ে যায়—গলির ভেতরে কারখানায়, কারখানা থেকে গলির বাইরে। কারখানার মালিকটা এতই মালিকহীন যে, শিশু শ্রমিকটা তার সন্তানপ্রতিম হতে পারে না। এই শিশু শ্রমিক দেখতে দেখতে তার চোখের সামনে সাগরেদ হয়ে যাবে, কারিগর হয়ে যাবে, মজুরি বেড়ে যাবে তার। শিশুর পর্বান্তর তার চোখে ধরা পড়ে। শিশুটা শ্রমিকই হয়ে যায় তার ওজনের চেয়ে বেশি ওজন মাথায় নিলে। কর্মোপযোগী হয়ে ওঠে শিশু শ্রমিকটা। তখনই কাজে তার প্রয়োজনের দিকটা ধরা দেয়। শিশু শ্রমিকটা কামাই করলে তার সামান্য মজুরি থেকে কেটে নেবার কথা তাকে ভাবতে হয়। শিশুটাকে ভাবতে হয় ঠিক ঠিক মজুরির কথা। কাজের পর্ব ভাঙলে ন্যায্যতা নিয়ে কথা বলে। কাজের যোগ্যতায় অন্য কারখানায় ঢুকে যেতে পারে। শিশুটা আসলে সন্তান-প্রতিম শিশু নয়, শিশু শ্রমিক! সপ্তাহে পনের টাকা তার আয়। মাসে ষাট টাকা। সাগরেদ হলে সপ্তাহে একলাফে পঞ্চাশ টাকায় উঠে যায়। বয়সটা তখন তার পনের ষোল হয়ে যায়। বয় ও সাগরেদরা সাধারণত কারখানাতে থাকে। অনেক বয়রা পেটভাতে থাকে। তাদের সকাল থেকে রাত এগারটা

পর্যন্ত কাজ করতে হয়। রান্নার যোগাড়, জল তোলা, ধোয়ামোছা সব কিছু তাকে করতে হয়। কারিগর ওস্তাদ হয়ে ঠ্যাংয়ে ঠ্যাং তুলে বসে থাকে। কোনো কোনো কারিগরকেও কারখানায় রাতে থাকার ডেরা নিতে হয়। সেও সপ্তাহে আশি থেকে নব্বই টাকা পেয়ে থাকে। তিরিশ পঁয়ত্রিশ টাকায় সাতদিনের নিজের খোরাকি করে। কিছু টাকা জলখাবার বিড়ি চায়ে। বাকি চল্লিশ পঞ্চাশ টাকায় পরিবারের চার পাঁচজনের চালাতে হয়। বয়সাগরেদদের কাছে সে শাহেনসা। কাজ ভুল করলে মারধোর করে। কেন না তারও শৈশব কেটেছে এই গলিতে, অথবা এই ওয়ার্ডের অন্য কোনো গলিতে।

আজ যারা পুরুষ মধ্যবয়স্ক, বুড়ো, তারা শৈশবেই এই গলিতেই কারখানার খোপে ঢুকে পড়েছিল। দেখা যায় কারো বাবা তাকে শিশু রেখে মারা গেছে কিংবা তাদের শৈশবে করুণ এক কাহিনী ছিল। বাবা মদ খেতো, অনেকগুলো ভাইবোন, অন্য কোনো হাতের কাজে ঢুকতে গেলে খোরাকি দিতে পারবে না বলে এই কাজে ঢোকা। এই কাজে ঢুকলে মালিক খোরাকি দেয়। পনের টাকা থেকে তিরিশ টাকা, তিরিশ টাকা থেকে পঞ্চাশ টাকা, পঞ্চাশ টাকা থেকে আশি টাকা। মাসে সাড়ে তিনশো, ওভারটাইম করলে চারশো সাড়ে চারশো টাকা।

কারখানার কারিগর চারশো টাকা মাস মাইনেতে বয় সাগরেদের চোখে শাহেনশা হয়ে যায়। তার গায়ে ছেঁড়া জামা, লুঙ্গি। সংসারের চাপে পড়ে রাতে এ-কারখানা থেকে অন্য কারখানায় ওভারটাইম করে। সাগরেদ থাকতে থাকতে দু-চারবছর পরে কারিগর হয়ে বিয়ে করেছে। চল্লিশ বছর বয়সে আধবুড়ো। পাঁচ ছ সন্তানের পিতা। নামাজ করে না, রোজা করে না, মন্দিরে যায় না, দীক্ষা নেয় না, পুজো করে না। পুজোয়, ঈদে, মহরমেও ওভারটাইম করে থাকে। চোখ ঢোকা, চোয়াল ভেঙে গেছে। চুলে তেল নেই, গা খড়ি। মলিন চোখ। সিনেমা দেখে না।

সাগরেদরা সংসার করে নি। তিরিশ টাকায় সপ্তাহে খেয়ে বাকি টাকায় সপ্তাহে তিনটে করে সিনেমা দেখে। তারাও একদিন কারিগর হয়ে যাবে। সংসার করবে। সিনেমা দেখে আনন্দ করবে না। তাদের স্মৃতি থেকে তাদের কেউ বলবে দুঃখের সিনেমা খুব ভাল। কেউ বলবে মারপিটের ছবি ভাল। ঘুমবার সময়টুকু তারা ঘুমবে, আর এই গলির ভেতর তারা মুখ থুবড়ে মরে যাবে।

গলিটা চরিত্রের একজন হয়ে ওঠে। ক্ষুধার্ত মৃতপ্রায় নেড়িকুকুর এক ধারে নীরবে শুয়ে থাকে। নিরীহ চোখ, আস্ফালনরহিত লেজ নাড়া। বাইরের চুঁইয়ে পড়া আকাশের আলো পড়ে, বাদুড়ের ডানা যেন উড়ে যায়।

গলিটার এক কারখানার দরজার মুখে খদিজা বেগম গালে হাত দিয়ে বসে থাকে প্রায়। একদিন সে হিন্দু ছিল। বছর কুড়ি-বাইশ আগে মা বাবা ভাইবোন মিলে পূর্ববঙ্গ থেকে চলে এসেছিল ভারতে। শেয়ালদা স্টেশনের গায়ে রেললাইনের ঝুপড়িতে কিছুদিন থেকেছে। কিছুদিন ছোট ভাড়া ঘরে এখানে ওখানে থেকেছে। মধ্যবয়সী বাবা কবিরাজ ছিল ঐ দেশে। এখানে কোথায় গাছগাছড়া, কোথায় রোগি, কোথায় পসার। সংসারে না খেতে পাবার যন্ত্রণায় একদিন দুই বোন রজঃস্বলা কুমারী তারা বেশ্যালয়ে না গিয়ে এখানে চলে আসে। বেশ্যালয়ে যাবারও যেমন এক সূত্র থাকে,—এখানে আসারও সূত্র আছে। পাড়ার মেয়েরা আসে। তাদের সঙ্গে চলে আসা গেল। মালিকের ঘরে কাজ করতে করতে এক মাসের মধ্যে মালিকের সঙ্গে প্রেম। মুসলমান মালিক পূর্ববঙ্গ থেকে আসা দুই ছিন্নমূল নিরন্ন যুবতীদের কাজ দিয়েছিল।

ইতিহাস জানে এই গলিটা। ব্রিটিশ আমলে দপ্তরিপাড়ার কাজ পূর্ব-বঙ্গীয়রাই করত। দেশভাগে তারা নিশ্চিহ্ন। তারা মুসলমান ছিল। আবার সে জায়গা পূরণ করছে পূর্ববঙ্গীয়রা।

ইতিহাসের ধারায় বই বাঁধাই, খাতা বাঁধাই পূর্ববঙ্গীয় মুসলমানদের রুজি-রোজগার ছিল, এ কথা গলিটা জানে। তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়, কলকাতা-সন্নিহিত তিন জেলার মুসলমান শিশুরা। যারা সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত খেটে একদিন কারিগর হয়। মালিকের পা টেপা থেকে সবকিছু ফাইফরমাসে লেগে থাকতে হত। ব্যবসায় পূর্ববঙ্গে তাদের জমি-জেরেত হয়, সংসার থাকে। দেশ-ভাগের ধাক্কা লাগলে এই শিশু শ্রমিকদের থেকে কারিগর হওয়া, তাদের মধ্যে হস্তান্তরিত হয় কারখানা। ব্যবসার মায়া ত্যাগ না করতে পেরে চোরাপথে দু-চার বছর যাতায়াত করতে করতে পাসপোর্ট ভিসার কবলে পড়ে। একদিন তারা ওদেশে মরে যায়।

স্বাধীনতাউত্তর নানা পরিবর্তনের সঙ্গে এই গলিতেও সেই ঢেউ লাগে। শেয়ালদা স্টেশন সব সময়ই ছিন্নমূলদের আশ্রয় দেয়। এখনো দিয়ে আসছে। এই এলাকায় ঢুকে পড়া তাদের কাছে সহজ হয়। কাজের জাত-কৌলিন্য ভেঙে যায়। দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে থেকে তারাও কারখানার মালিক হয়ে যায়। মালিকানার নির্দিষ্ট একটা সংখ্যা আছে। তার মধ্যে পূর্ব-ধারা মধ্যধারা নব্য-ধারার মিলামিশ। ধর্ম নেই। সাম্প্রদায়িকতা একেবারেই নেই। প্রতিদিনের খাদ্যের অনিশ্চয়তায় ধর্মসাম্প্রদায়িকতা দূরে সরে থাকে। অথচ ধর্মবিশ্বাস আছে। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মেলামেশা অপূর্ব সম্প্রীতিপূর্ণ। শ্রমের মধ্যে এক নিশ্ছিদ্র ঐক্য। সেই ঐক্য ক্রমশ সত্য হয়ে ওঠে। মিথ্যে হয়ে ওঠে, দেশ-ভাগ, স্বাধীনতা।

দু-বছর আগে বাংলাদেশে বিধবা হয়ে আসা মিতা বিপদের ভার বাড়িয়ে

তোলে। শেয়ালদা ফ্লাইওভারের ওপর ক্রোধ ও অন্তর্দাহে উঠে পড়তে হয় তাকে। ফ্লাইওভার কেঁপে ওঠে বুঝি। গলিটা স্পর্শ নেয়, পুরুষহীন, বীরভোগ্যাহীন নারীর। এবং বাঁধাই কাজের নির্দিষ্টতায় মেয়েরা এক কাজে চিহ্নিত হয়েছে—ভাঁজাই সেলাই কাজে। এই নারীরা অধিকাংশই বিধবা। কেন? সংসারে থাকার সেলাই ফোঁড়াইয়ের রূপান্তর! তা যদি ধরা হয়, তাদের সংসার নেই, সেলাই ফোঁড়াই তারা পেয়ে যায়। আসলে তা সত্য নয়। আসলে এই নারীরা কেউ নারী-পুরুষ উভয়েই অর্থনৈতিক শ্রমের মধ্যে ছিল না। দেশভাগের পর নিরন্তর পূর্ববাংলা থেকে চলে আসার গতির মধ্যে চলে এসেছে। হয়তো কেউ আগে বিধবা হয়েছে, কেউ পরে বিধবা হয়েছে। তাদের স্বামীরা কেউ চাষে খাটত, রিক্সা চালাত। তাদের বউরা সন্তানপ্রসব, সন্তানপালন, সংসারের হাঁড়ি খুন্তির কাজ করত। সেই মিথ্যে দেশভাগ, মিথ্যে স্বাধীনতার পাপের নিরন্তর গতির মধ্যে এদেশে চলে আসে। শুধু-বধূটি যে ছিল না, সে বাবুর বাড়িতে কাজ, জোগাড়ে, ছাদপেটাই, চাল, সবজি ব্যবসা, ফিরির মাল বেচা, এসবের মধ্যে চলে যায়। কিন্তু যে ছিল শুধু-বধূটি, যে তার স্বামীর কাছে তার দেহকে উপাচার ভাবতে পারত। মাঠ প্রান্তর নদীনালার ভেতর যার অনুভূতি ছিল স্বামী-সর্বস্বতায়, সন্তানস্নেহের আর্দ্রতায়, তার পুরুষহীনতায় অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ভেঙে যায়। যে-কাজে সহজে ঢোকা যাবে, এবং তার কাছে শ্রমসাধ্য হবে, এবং যে কাজটা শিখতে সময় লাগে না, এই কাজেই ঢুকে পড়বে বিধবাটি। মজুরি কম, এই হিশেব প্রথমে তার নজরে আসবে না। পরে এই কাজের মধ্যে স্ক্রুর মত এঁটে যাবে যে এই মজুরির মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়তে হবে। দুর্যোগের রাতে ঘরের ভেতর যেমন মোমের আলোয় শিখা একা একা কেঁপে ওঠে, তেমনি একা ভীরুতা ও বিষাদে ভরে থাকবে।

কাঁথা সেলাইয়ের মুদ্রায় বাঙালি নারীদের বিষাদের এক ধারণ মুদ্রা আছে। সঞ্চারী রসের সংযোগ ঘটে। নত হয়ে পড়ে মুখ। মন ভারী হয়ে আসে। মুখ নোয়ালে বুকে ভাব নেমে আসে। সমস্ত বিষাদ বিরহ অপ্রেম দু হাতে, ভঙ্গিমায় খেলা করে। ক্রমশ একার ভেতর ঢুকে যেতে হয়। এইটাই তাদের গতিহীন গতি। এই টুকরো অন্ধকারের মধ্যে তারা খেলতে পারে। এতেই সে তার সময়কে নিপাত করে। উদ্ভিন্নতা ছেড়ে এসে অনিবার অশান্ত যৌবন শরীরে নিয়ে থাকে। বাইরের জীবন সমাজ সংস্কার ভেতরে শিলনোড়ার মত পাথর হয়ে যায়। এই সবের প্রতিক্রিয়া, প্রতিবাদ সমস্ত কিছুই তার বিষাদের মধ্যে থাকা। ওর শরীর, যৌবন, দেখে কে বলবে, ওর শরীর যৌবন বিষাদের কেউ নয়! ও বেশ্যালয়ের গলির দর্জায় লাস্যময়ী পটিয়সী হতে পারত। ওর বুক-যৌবন নিয়ে চড়া দামদস্তুর করতে পারত, স্বচ্ছন্দে। সেখানে আর-এক সমাজ, সংস্কার।

ঘরে থাকতে পারে না। ঘরে বিছানা আছে। টুকরো উঠোন আছে।

৭০। ১৫৫

পুকুর ঘাট। ঘরের খুঁটি। এ সমস্ত কিছু আছে। বিষাদের নিজস্ব এক রঙ আছে, আধার আছে, শান্তি আছে। এর ভেতর ঢুকে পড়তে না পারলে শান্তি নেই। আর এখানে পুরুষের গায়ের গন্ধে, নানা মুদ্রা, কণ্ঠস্বরে শান্তি পায়। যেন বাতাসের মত অবয়বহীন স্পর্শতা, অনুভূতি। শরীর ও মনের ধর্মে এই তাপ সরিয়ে রাখতে পারে না। গ্রাহ্য করে। ক্রমশ সেইটুকুতেই শান্ত থাকার অভ্যাস গড়ে ফেলতে হয় তাকে। কারিগরের হাত বুক শরীর তাকে বিধুর করে। মালিক হাত ধরলে যেন সে গলে যেতে পারে। এই রকম মাঝে মাঝে ঘটে, কারিগর হাত জাপটে ধরে চোখের কাছে টেনে নিয়ে মনিবন্ধের ঘড়ির সময় দেখে। এর বিনিময়ে সে লেই ছোঁড়ে। কারিগর পুরুষটি চুল টেনে সমস্ত শরীরে দোলা লাগিয়ে দেয় তার। মেয়েটি জিভ ভ্যাংচায়। পুরুষটি এবার গলা টেপার ভঙ্গিতে ঘাড় ধরে। মেয়েটি ছদ্ম কান্নায় টুপ করে কামড়ে নেয় পুরুষটির বুকে। হাসি ও ছদ্ম ক্রোধের ভেতর মেয়েটি ছটফট করে। পুরুষটির স্পর্শ তার শরীরের ভেতরে সত্তায় মিশে যায়। মুহূর্তমাত্র। তার পর দুজনেই বিচ্ছিন্ন হয়। মিতা একেবারে নিস্তরঙ্গ গম্ভীর হয়ে মই বেয়ে মাচায় উঠে যায়। সঙ্গী সবিতা ফর্মার ওপর চোখ রেখে নীরবে কাজ করে চলে। এই ঘটনায় দুজনের মধ্যে ঈর্ষাজনিত বিচ্ছিন্নতা জন্মায়। বেদনা ক্রোধ ঈর্ষার ভেতর দিয়ে সঙ্গীকে আঘাত করে চলে। নিজেও নীরবে ক্ষতবিক্ষত হয়। মিতাও এই ঘটনা স্পর্শের ভেতর থাকতে চাইবে, সবিতাকে ক্ষমাহীন একা রেখে। কাজ ধরার চেষ্টা করবে, সহজে কাজ ধরতে পারবে না। ভাঁজাই করতে লাগা ছোট চিরুনিটা ডান হাতে নিয়ে চুলের ওপর তুলবে। সদ্য ঘটনার আনন্দের মধ্যে থাকতে চাইবে। চিরুনিসহ ডান হাতটা মাথার ওপর উঠে গেলে, গলা থেকে মুখটা তার ভেঙে পড়বে। বুক তার এখনো কাঁপছে, চোখে তার আবেশ, মন ভিজে গামছার মত নরম। তেমনিই সবিতা মুখ গুঁজে থাকে। মাঝে মাঝে তারা এখানে গুন গুন করে গান গায়। গান গেয়ে ওঠার পরই থেমে যায় মিতা। সবিতা আরও নীরব হয়ে পড়ছে তাতে।

তারপর নীরবে সবিতাকে দেখতে দেখতে, তার সদ্য আনন্দ মুছে ফেলতে ফেলতে, তার খুলে ফেলা বিষাদ ফিরে পেতে পেতে, নিজস্ব অন্ধকারে ডুবে যায়। এক সময় সাবেক স্বরে কথা বলে ওঠে। 'সবিতা, ফর্মাগুলো দে ত।' সবিতাও চেনে এই স্বর। স্বাভাবিকতা ফিরে পায়। বাড়িয়ে দেয়।

সম্পূর্ণ বিষাদের মধ্যে ডুবে যেতে হলে কাজে ডুবে যেতে হয় সবিতাকে।

তারপর কিছুক্ষণ তারা নীরবে কাজ করে চলে।

কিছুক্ষণ পর দুজনে কথা বলবার পরিবেশ তৈরি হয় দুজনের মনে, মাচার আলোছায়ার ভেতর। সেলাইয়ের মধ্যে গা নাড়া, বাঁ-হাতে সুতোতে টান দেয়া শরীর স্থিরতা থেকে বেঁকে ওঠে। এই নড়াচড়ার প্রতিক্রিয়ায় কথা বলার পরিবেশ তৈরি হয়। মিতা কেশে নেয়, এটাও প্রতিক্রিয়াজনিত। সবিতা বলে, 'কালকে

ওষুধ কিনে নিয়ে যেতে ভুলিস নি ত ?'

মিতা হেসে ফেলে। 'একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। গিয়ে শুনলাম শ্বশুর ডাক্তারখানা নিয়ে গিয়েছিল।'

'তোর যত ভুলো মন। ছেলের জন্যে কিছু কিনে নিয়ে যেতে বললে আমি ঠিক কিনে নিয়ে যাই।'

'তোর ছেলে-অন্ত প্রাণ! আমার ছেলেটা তার কাকিমার কাছে মারধোর খেয়ে মানুষ হয়। সত্যি বলছি, ভুলেই যাই ছেলেটার কথা।'

'আমারও ত ছেলেটা আমার ন্যাওটা নয়। তার মামিমার কাছে ন্যাওটা! আমাকে পাচ্ছে কখন ? তোর ছেলের কাকিমা ত ন্যাওটা। তার মেজকাকা হাত ধরে বাজারে নিয়ে যায় শুনি। বলিস ত।' সবিতা হাঁ করে প্রশ্ন করে,, তোর ছোট দেওর ?'

'সে ত ঘরেই থাকে না। পার্টি করে, কলেজে পড়ে।'

'অফিসার হবে !'

'জানি না।'

'আমার ভাইটা আবার উটকো ঝামেলা ঘরে নিয়ে আসে। মারধোর, পেটা-পেটি করছে সব সময়। কারখানার কাজ ছেড়ে এখন ভেরেণ্ডা ভাজছে। এর উপকার করে, ওর উপকার করে।'

'শ্বশুরটা সারারাত কাশে।'

'মরবে নাকি ?'

'এই অলুক্ষণে কথা বলিস না। শ্বশুর আমাকে মেয়ের মত ভালবাসে। শ্বশুর আমাকে প্রথম দেখায় আংটি আশীর্বাদী করেছিল।'

'আংটিটা নেই ?'

'দূর সে কবে কোথায়'—মিতা তারপর একটু থেমে স্বাভাবিক কথা বলার গতি পায়—'মামাশ্বশুর বাংলাদেশ থেকে এসেছিল। দেশে খুব বন্যা গেল।'

'মনে হয় যেন ওদেশে চলে যাই ! তোর মন কেমন করে না ?'

কাজ ফেলে দুজনে দুজনের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। স্থির। দেশটার সুখস্মৃতি তাদের টানছে। দুই দেশ। দুই রাষ্ট্র।

সমস্ত কিছুর মধ্যে একটা বন্ধন থাকে, সংলগ্নতা থাকে। সেই সংলগ্নতা ও বন্ধনের ভেতর দিয়ে অভ্যাস গড়ে ওঠে। ছ নম্বর পাটোয়ার বাগানের গলিটার টলোমলো স্ল্যাবটা সেই বন্ধন সংলগ্নতার অভ্যাস গড়ে। জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। কর্পোরেশনের কোনো কলে ঝির ঝির জল পড়ে। কোনো কলে পলিথিনের পাইপ ঢুকিয়ে জল টানতে হয়। কৃপণ জলধারার প্রতি অভ্যাস গড়ে ওঠে। ঘুপচি খোপে, মাচায় কাজ করতে করতে অভ্যাস গড়ে ওঠে। দৈনিক বারো চোদ্দ ঘণ্টা কাজের মধ্যে থাকার অভ্যাস গড়ে ওঠে। সমস্ত কিছু

মেনে নিয়ে শান্ত থাকাও এক অভ্যাসের ফল।

কারখানার পাশে কারখানা—সংলগ্নতা। পরস্পর পরস্পরে সম্পর্ক সংলগ্নতা। ঐ লোকটার একটা চোখ কানা, ওর ঐ অসঙ্গতি মেনে নেবার অভ্যাস গড়ে ওঠে। ও খোঁড়া, ও প্রতিদিনের সম্পর্কের ভেতর মিশে যায়। অভ্যাসের মধ্যে চলে আসে গলির সংকীর্ণতা, অন্ধকার, দুর্গন্ধ। দরিদ্রজীবন অভ্যাসের টুকরো টুকরোতে যে সমগ্রতা পায় তা তাকে আপাত শান্ত নিরীহ রাখে।

সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডটি কলকাতারই অংশ, অন্তর্গত। কলকাতার ভেতর আরেক কলকাতা আছে। মনে হবে এরা কলকাতার কেউ নয়। অথচ কলকাতার অস্থিতে মজ্জায় মিশে থাকে। আরেক কলকাতার এরা অংশ। আরেক কলকাতার আয়তনটা নেহাৎ কম নয়। সীমাবদ্ধতার অভ্যাসে মানুষ যেখানে নীরব নিথর হয়ে থাকে। অনুচ্চারিত জীবন অভ্যাস, জীবন ধরন।

আকাঙ্ক্ষা অতি সামান্য। অভ্যাসের ভেতর সমর্পিত থাকে। আত্মসমর্পণ। প্রত্যাখ্যান নেই। বিরোধ নেই। লগ্নতার এক বন্ধনের মধ্যে জীবন আকাঙ্ক্ষাকে উচ্চারিত করে। এর কাজ ও করে দেয়। একসঙ্গ ছুটি হলে, সঙ্গীর জন্যে অপেক্ষা করে। অসহিষ্ণুতা নেই। অথচ কেউ কারো বাড়ি যায় না। ঘুটুম্বিতে নেই। কেউ ট্রেন ধরে, কেউ বাস ধরে। কাছের যা, তাকেই আঁকড়ায়। নিজের কথা যেমন বলে, অন্যের কথাও শোনে। নিজেকে অপদস্থ করে সকলে হাসে। হাসতে হাসতে এক সময় তারা নীরব হয়ে যায়। কাজের মধ্যে ডুবে যায়। একজন আরেকজনকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়। অন্যজন আরেকজনকে। অংশ অংশ কাজ সমগ্রতা পায়। সমগ্রতার অংশ টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সংলগ্নতায় সমগ্রতা গড়ে। সেলাই আছে, ভাঁজাই আছে। আস্তর দেয়া, পুস্তানি দেয়া, কাটিং করা, প্যাঁচ মেশিনে বই চড়ানো, পুট মোড়াই করা, জেল ধরানো, লেই পিলানো, বই হটপ্রেসে চড়ানো, বই প্যাকেট করা—অংশ অংশ কাজ সমগ্রতা পায়। গলির বাইরে রাস্তার আলো সময়ের ধারাপাতে নানা রঙ পায়, গলিতেও এসে পড়ে তা নানা রঙ পায়। নানা আলো অন্ধকার পায়। সময়ের পতন হয় এইভাবে। সকাল পেরিয়ে দুপুর হয়। দুপুর পেরিয়ে বিকেল হয়। বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যা। রাত। ভোর। সময় থেমে থাকে না।

গরমে কাজ করতে করতে মিতা সবিতা দুজনে এক সময় জামা খুলে ফেলে। মাচার ওপর ছাদের উচ্চতা সামান্যই। তিন ফুট মত। এখানে শাড়ি বদলানো যায় না, কিন্তু জামা খুলে, ফের পরে নেয়া যায়। নিজেরাই একটা দড়ি টাঙিয়ে রেখেছে, তাতে জামাগুলি মেলে দেয়। ছোট জামা, বড় জামা। হুক মাঝে মাঝেই আলগা হয়ে যায়। অন্তর্বাসের ক্লিপে মর্চে লেগে থাকে। ঘামে নেতিয়ে পড়ে জামাগুলি। একটা ছোট সেপ্টিপিন থাকে তাতে। আলগা বুকে আঁচল চাপা দেয়। কাজের শাড়িটা একেবারে সাধারণ। চুলের বেণী, কপালের টিপ এই শাড়ির সঙ্গে মেলে না। তবুও ব্লাউজ অন্তর্বাসের সঙ্গে

মানাচ্ছিল। কিন্তু শরীর এক অনন্য সজ্জায় থাকে। জামা খুলে ফেলে নিজের শরীর নিজের মধ্যে আরো ঘন করে পায়। কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম চোখের পাতায় পড়ে।

আলগা বুকের আলাদা এক শিহরন আছে। মাঝে মাঝে চুলকে নিলে, ডলে নিলে চমৎকার আনন্দ পায়। মিতা একসময় কখন জামা খুলবে, কাজ শুরু করার পর অপেক্ষায় থাকে। খুললে বেশ ভাল লাগে। দেহের মধ্যে এক আত্মমগ্নতা তৈরি হয়। ঘরে, রাতের বিছানায় প্রায় বিবস্ত্র থাকে। এটাই সে চায়। দেহের ভেতর এক আচ্ছন্নতা তৈরি হয়। নিজের দেহের গন্ধ নিজে পায়। এবং নিজের দেহের গন্ধে নিজে মরে থাকে।

সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ড জুড়ে যে ব্যাপ্ত নীরবতা থাকে, তার ভেতর থেকে মিতা কতকগুলো শব্দবন্ধ পায়। তা নীরবতাকে আরো স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক করে। এমনই তার লয়, সুর, ছন্দ। কাটিং মেশিনের কোপ, রিক্সাওয়ালার ঠুং ঠাং দূরের দিকে যাওয়া। পাঞ্চিং মেশিন, স্টিচ মেশিনের শব্দ। পুরনো দিনের হিন্দি গান। কলের জল পড়ার আবেগহীন শব্দ। গলির ভেতর কুকুর ছপ ছপ হেঁটে যায়।

সুদূর বাংলাদেশের গ্রাম জেগে ওঠে। নদী নালা খাল বিল। মাঠ প্রান্তর। নৌকো। কথার আবেগ। ঘর উঠোন। পাড়া পড়শি। ফাল্গুন চৈত্র বৈশাখ। অমাবস্যা, পূর্ণিমা। অশ্বত্থ, বট। গোবর। ছাই। ঘাস। ফড়িং। কান্না। হাসি। স্পর্শ। মৈথুন। কাম। প্রসবের স্মৃতি। কানে কানে কথা বলা। এই সব তাকে আরো মগ্ন নিশ্ছিদ্র করে। বিষাদের মধ্যে থাকা ছাড়া তার কোনো উচ্চারণ নেই। থুতনি বুকে নেমে আসে। চোখের পাতা পাথরের মত ভারী স্থির হয়ে যায়। হায় বাংলাদেশ! পূর্ববাংলা! ওখানে তার পুরুষ হারিয়ে এসেছে। নারীর আর কোনো অহংকার থাকতে নেই। পুরুষহীন থাকলে তার অহংকার থাকে না, সে মরে যায়। পুরুষহীন শরীর পুরুষহীন। নিজের গন্ধে নিজে মরে থাকে। কখনোই ফিরে পাবে না তার পুরুষকে। কখনোই ফিরে পাবে না তার জন্মভূমিকে। পুরুষ আর জন্মভূমি তাকে সমান বিষাদ এনে দেয়। যেন একে অপরে পরিপূরক। স্বামীর স্মৃতিতে অন্য দেশ আসে, রাষ্ট্র আসে, অন্য প্রকৃতি আসে।

বারোটা থেকে একটা, একঘণ্টা টিফিন। বাড়ি থেকে টিফিন কৌটায় আনা একটু ভাত আর আলুসেদ্ধ নুন দিয়ে মেখে খেয়ে নেয় মিতা আর সবিতা। টিফিনের দশ মিনিটের মধ্যে এই খাওয়াটা শেষ করে ফেলে। আর এই সময়টা যে-যার ইচ্ছে মত বাইরে বেরয়। বাইরে ঘুরে বেড়ায় কেউ কেউ। কেউ কেউ চেনা পরিচিত কারখানায় ঘোরাফেরা করে। কেউ রাস্তার ধারে ছোট সরু রকে বসে থাকে নিরুত্তেজ শীতল হয়ে। চায়ের দোকানে ভিড় জমে। গলির মুখে, রাস্তায় ছোট ঘরে ভাত রুটি ভাজি গরুর মাংসের হোটেল। দু-টাকা পঁচিশ

পয়সা দিয়ে গরুর মাংস দিয়ে ভাত খাওয়া যায়। নোংরা, এঁটোর গন্ধ, ধোঁয়া কালি মলিনতা সবকিছু মিলিয়ে খাওয়ার এক স্বাদ আছে। গলিগুলির সংলগ্নতা নিয়ে এলাকাটি অতি ঘিঞ্জি। এর মধ্যে দু-চারটি ছোট প্রেস ঢুকে আছে। ট্রেডল মেশিন চলে। ভিক্টোরিয়া মেশিনে নানা রঙিন লেভেল ছাপার শব্দ হয়। ভার্নিস লেমিনেশনের মেশিন ঢুকে গেছে দু-চারটি। পাঞ্চিং, সিলস্ক্রিন প্রিন্ট, নাম্বারিং রুলিং মেশিন তার নিজের অবস্থানে নিজস্ব গতিতে শান্ত থাকে। স্থিত-শান্ত, নিরবচ্ছিন্ন।

চোদ্দর তিনের গলির প্রায় মাঝামাঝি জায়গাটায় ছোট এক ঘরে লক্ষ্মী সাহার রুলিঙের মেশিন চলে। দুটো ছোট ছোট মেশিন। একটা লম্বালম্বি আর একটা আড়াআড়ি বসানো হয়েছে। একটাতে রানিং কাজ হয়, অন্যটাতে স্টপ কাজ হয়। লক্ষ্মীদা ও আর একজন কারিগর, আর একজন সাগরেদ কাজ করে। কতকগুলো কাঠের উঁচু টুল আছে। সম্পূর্ণ কাঠের মেশিন। হাতের স্পর্শে প্রাচীন-তেলালো হয়ে আছে।

টিফিনের সময় মিতা বিশ্রাম নিতে লক্ষ্মী সাহার ঘরে প্রায়ই আসে। রুলিং ঘরে কমবয়সী মতির সঙ্গে এক ধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে মিতার। মতির সবে যোল-সতের বছর বয়স। ডায়মণ্ডহারবারের নেতড়ায় বাড়ি। গ্রাম থেকে কম পয়সায় নারকেল কিনে এনে দেয়। তেঁতুল কিনে এনে দেয়। মিতার নানা ফাইফরমাস খাটে। ও লাইনে হটুগঞ্জে বিখ্যাত এক সন্তোষী মার পুজো হয়, সেখানে মতির হাতে পয়সা পাঠিয়ে পুজোও দিইয়েছে।

টিফিন খেয়ে মিতা লক্ষ্মী সাহার ঘরে উঁচু একটা টুলটায় বসে পড়ে, প্রায়ই, আজও এসে বসেছে। মতির গায়ে ময়লা ছেঁড়া গেঞ্জি, পরনে লুঙ্গি। দাঁত-গুলি সুন্দর, রানিং মেশিনে বসে কাজ করছিল। মিতাকে দেখতে পেয়ে হাসে। ফট্ করে মেশিনটা বন্ধ করে দেয়। মালিক স্টপমেশিনে কাগজ লাগাচ্ছিল, কারিগর বিজয় হ্যাণ্ডেল ঘোরাচ্ছিল। বিজয় খট করে হ্যাণ্ডেল ঘোরানো বন্ধ রেখে মিতার দিকে তাকায়। লক্ষ্মী সাহা টুলে বসে বসে কাগজ ঠেলছিল। কারিগর কাগজে 'টানা' বন্ধ রেখেছে, তাই সেও থেমে যায়। বিজয় অদ্ভুত নৈকট্যে কাজ থামিয়ে রেখে মিতাকে সৌজন্য দেয়। বিজয় আবার মুহূর্তের মধ্যেই হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে দেয়। মালিক লক্ষ্মী সাহা কাগজ ঠেলে। কাজটা আবার আগের মত গতি পেয়ে যায়। প্রতিটি কাগজে কারিগর বিজয়ের চোখ কাজ করে। কাগজের একটা নির্দিষ্ট জায়গায় তাকে রুলিঙের পিন ফেলতে হয়। কাগজে রুলিঙের দাগ টানা হয়। নির্দিষ্ট জায়গায় যে পিন পড়ে, তা বিজয়ের হ্যাণ্ডেলের 'ইশারায়'। ইশারায় সরায় কমায়। বাঁ হাতে হ্যাণ্ডেল ঘোরায় আর ডান হাতে পিন নামায়। কাগজের ওপর চোখ ও হাতের ইশারা কাজ করে।

মতি মেশিন বন্ধ করে কাগজ গোছায়। কাগজ 'ঠোকে'। রুলিং টানা

কাগজগুলি গুছিয়ে রাখে। মিতা মতির কাজের দিকে তাকিয়ে থাকে। এক সময় সে থুতনিতে ডান হাতের তালু ধরে রাখে।

মিতা মতির অতিথি, এই সৌজন্যে এবার সে কাজ সেরে মিতার সামনে দাঁড়ায়। 'কালকে এলে না দিদি?'

'দরজার কাছে এলাম না, তখন সেই?'

'ও হুঁ্যা, ভুলে গেছি।'

'তুই বললি, এই সপ্তাহে বাড়ি যাবি!'

'যাব মনে করেছি, লক্ষ্মীদা যেতে বারণ করছে।'

'ভেট্ কাজ কর, শুধু বাড়ি বাড়ি!' এই কথার আবেগে মিতার চমকে ওঠে চোখ। সমস্ত দেহ বিদ্যুতের মত খেলে যায়। হাসির রেখা ঠোঁটে। চোখে হাসি প্রসন্নতায় খেলা করে। এবং মিতা অনুভব করে সে নিজের দেহের ভাল লাগার ভেতর চলে যাচ্ছে। নিজের মনেই নিজে এই অনুভবের ক্রিয়া তৈরি করে। এবং ক্রমশ সে ঢুকে পড়ে, বিদ্যুতায়িত ভঙ্গিমার মুহূর্তের মধ্যে। চোখ যেন তার কোন-এক আনন্দে আলোকিত হয়, নেচে ওঠে। টুলে বসে বসে পা দোলায়। টুলটা দুলুনিতে কাঁপে। মাটিও কেঁপে যায়। কাঁপতে থাকে কাঠের মেশিন দুটি।

মতিও প্রসন্নতায় ভরে ওঠে। একটু আগে যেন সে হাসছিল না। দিদির জন্যে অপেক্ষায় ছিল। তাতে সে যেন আরো বেশি সচল, দক্ষ হয়ে ওঠে।

মতির গলায় একটা স্টিলের হার ও লকেট ঝোলে। তার উবু হওয়া ও উঠে দাঁড়ানো ও চলাফেরায় লকেটটা দুলতে থাকে। ঝিকমিকিয়ে উঠছে।

'কবে কিনলি লকেট?'

'কাল। শ্যালদায়।' সোজা মিতার দিকে এসে দাঁড়ায়, দেখাতে।

পা দোলানো থামিয়ে আরো বেশি শরীরে খুশি নিয়ে মতির লকেটটা ডান হাতে ধরে, ঝুঁকে দেখে। 'বাঃ বেশ সুন্দর ত। কী আছে এতে, এসব?'

'জানি না।'

লকেটটাকে ছেড়ে দিতে মতি শরীরটাকে ঘুরিয়ে নেয় বাঁ দিকে। ঘরের ভেতর দরজার পাশে চলে যায়। ওখানে একটা কেরোসিন কুকারে ভাত ফুটছিল হাঁড়িতে। হাঁড়ির ঢাকা খুলে, চামচ নাড়ে, ভাত টেপে। তারপর তেমনই ঘন মনে হাঁড়িটা তুলে বাইরে গলির ভেতর ভাতের ফ্যান গালতে বসে।

মিতা টুলের ওপর বসে বসেই শরীরটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে দরজা দিয়ে মতির দিকে তাকায়। আসলে তাকিয়ে নেয় চোদ্দর তিনের সেই কারখানাটায়। কারখানার মালিকটাকে খুঁজে পায় না। কোথায় আছে? জাভেদ মিয়া। নেই। ঘরের ভেতর নেই। আরো নিচু হয়ে মাচার দিকে তাকায়। মাচার ওপর নেই। তার এই মুহূর্তের ইচ্ছার মধ্যে জাভেদ মিয়াকে দেখতে চাচ্ছিল। দেখতে না পেয়ে ভেতরে এক অস্থিরতা বিন্ বিন্ করে সহসা চলে আসে। ঘাড় বেঁকিয়ে

চেয়ে থাকে। একই রকম দেখতে। একই রকম হাঁটা চলা, ভঙ্গিমা। মন চলে আসে তার এই ঘরটায়। শুধু একটু চোখের দেখা দেখতে চায় লোকটাকে। জাভেদ মিয়া জানে না। কেউ জানে না। জাভেদ তার স্বামীর মত দেখতে। হুবহু। দেখার সমস্ত-কিছুতে তার স্বামীর মত। চোখে চোখ ফেললে ধরা পড়ে না শুধু। আর গলার স্বর। গলার স্বরের সঙ্গে একেবারেই মিল নেই। একজনের মত দেখতে অন্য একজন, এমন মিল হয় নাকি? আবার এক দেশ থেকে অন্য দেশের ভেদের ভেতর।

কেন এখন জাভেদ মিয়ার কারখানায় জাভেদ মিয়াকে দেখতে পেল না, এই নিয়ে মিতার নিদারুণ অসহায়তা জন্ম নেয়। ঘাড় বেঁকিয়ে তাকিয়ে খুঁজতেই থাকে। যখন দেখতে ইচ্ছে করে জাভেদ মিয়াকে তখনই দেখে যায় মিতা। মাচায় কাজ করতে করতে, ছোট বাইরে যাবার নামে নীচে নেমে এই গলিতে এসে মুখ বাড়িয়ে দেখে গেছে। যেন রাস্তায় কোন গাছ বা মোড়ের কোনো মূর্তিকে দেখার মত। জাভেদের সঙ্গে তার কোনো বিনিময় নেই, জাভেদের সঙ্গে কথাও বলে নি সে। মুহূর্তে দেখে নিয়ে সে চলে গেছে। আবার এখানে এসে, কখন দেখবে, দেখার জন্যে সে ছটফট করেছে। বাড়িতে একার ভাবনায়ও জাভেদ মিয়াকে অবয়বকল্প দেখে। বাঁধাই কারখানায় কাজ করতে করতে জাভেদকে অবয়বকল্প দেখে। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে অবয়বকল্প জাভেদ মিয়াকে দেখে। ট্রেনের ভেতর ভিড়ের মধ্যে দেখে। রাস্তায় জনস্রোতের ভেতর দেখে। সে জানে, তার স্বামী নয়। স্বামীর মতই দেখতে, আর একজন, সে জাভেদ মিয়াকেই দেখে।

তার স্বামীর নাম রতনলাল দাস। জাভেদের নাম জাভেদ। তার মৃত স্বামী আর জাভেদ এক লোক নয়। কিন্তু কলকাতায় এসে চোদ্দর তিন-এর গলিতে জাভেদ মিয়াকে দেখে মিতা চমকে গিয়েছিল। সে এই গলিতে যাওয়া আসা ও মাঝে টিফিনে সবমিলিয়ে তিন-চারবার জাভেদ মিয়াকে দেখে যায় প্রতিদিন। এবং লক্ষ্মী সাহার রুলিং কারখানাটাও বেছে নেয়। আপন করে নেয় মতিকে। আর কমবয়সী মতি তার আর-এক আশ্রয় হয়ে ওঠে। অথচ কারখানায় মাচা থেকে নেমে, কারিগর সাগরেদ-মালিকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হাসা, হাসতে হাসতে কথা বলা, কথা বলা হাসা এবং একে-অপরে পেছনে লাগতে লাগতে, লেই ছোঁড়া, ঠেলে দেয়া, চুল টেনে দেয়া, হাত থেকে কিছু কেড়ে নেয়া, গায়ে-গা ধাক্কাধাক্কি এই সবের মধ্যে সে হারিয়ে যেতে পারে। এর মধ্যে নিজের মনে কোনো বাধা পায় না। বরং উৎসাহ পায়। শরীরের ভেতর এক প্রবল ইচ্ছে সে বোধ করে। তার পরের মুহূর্তেই তাকে আবার চোদ্দর তিনের গলিতে এসে দাঁড়াতে হয়। এ সমস্ত কিছুই তার কাছে একাকার হয়ে যায়।

আসার পথে আজ সকালেও জাভেদ মিয়াকে তার কারখানায় দেখতে পায় নি। কেন পায় নি? কোথায়? পার্টির বাড়ি গেছে কি? না ত! সে বিকেল

পাঁচটায় পার্টির বাড়ি যায়। তার আগে ত নিজে কারখানায় কর্মচারিদের সঙ্গে খাটে। জাভেদ মিয়ার কারখানায় সেলাইয়ের কাজ পেলে ভাল হত। প্রতিদিন, সারা সময়ই জাভেদ মিয়াকে দেখতে পেত। কিন্তু যার কারখানায় সে কাজ করছে, মজিদ মিয়া, তার তাকানো, কাছে থাকার মায়ার মধ্যেও ত এক অভ্যাসের টান পায় মিতা? তা হলে? এখানে আসবে, তাদেরকে ছেড়ে কীভাবে? কীভাবে কারিগর জয়নালভাই, চাচাকে ছেড়ে আসবে? মজিদের কারখানায় যে-রকম স্বাভাবিকতায় আছে, তাতে সে তার বিষাদের ভেতর কিছুটা জীবনের তাপ অনুভব করে।

জাভেদকে না দেখে থাকা অন্য জিনিশ। কাছে যাওয়া, জাভেদের হাত ধরা যায় না। সে তার স্বামীর মত আর একজনকে দেখতে চায়। যে কি না অন্য একজন। অন্য একজনের মত তার স্বামী দেখতে ছিল। তার স্বামী অন্য একজনেও নেই। চোখের সামনে পুত্র অথবা স্বামী মারা যাবার পর যেমন সেই মুহূর্তে মনে হয় তার পুত্র অথবা স্বামী বেঁচে আছে। এই আশ্বাসের মত একটা মৃত, বিলুপ্ত শরীর-জীবন সে ধরতে চায়। বিগত ও মৃত স্মৃতিতাড়নার মধ্যে সে চলে যায়। ঐ জায়গাটা থেকে কিছুতে সে ফিরতে পারে না। কারখানার কারিগর মালিকের মধ্যে থেকে যে তাপ আকাঙ্ক্ষা করে ঠিক তার বিপরীতে স্বামীর স্মৃতি ও জাভেদ এই একার অনুভবে মনে এক ক্ষতের গভীর তৈরি করে। স্বামীর স্মৃতি, স্পর্শ, প্রেম, দেহ, মিলন-মৈথুন কিছুই সে ভুলতে পারছে না। ভুলতে পারছে না, বাংলাদেশে গৃহে প্রকৃতিতে স্মৃতিতে তার স্বামীকে। অন্য রাষ্ট্র দেশের স্মৃতির মধ্যে আছে। অন্য দেশের রাষ্ট্রের মধ্যে থেকে সে অবিরত বিগতের হারানোর বিষাদ নিয়ে থাকে। মিতা জানে সে কিছুতেই এই বিষাদকে খুলে ফেলতে পারছে না। এইটেই তার প্রাপ্য। এবং জ্যোৎস্নায় গভীর এক খাদের সামনে যেন সে দাঁড়ায়। অদ্ভুত এক মৃত্যুর ভেতর নিরবচ্ছিন্ন চলে যাবার স্বাদ অনুভব করে।

নেই। জাভেদ তার কারখানায় নেই। এইখানে একটু বিচলিত হয়ে পড়ে মিতা। মতি তার সামনে একটা খাতা বাড়িয়ে দেয়। তারপর মতি হেসে ফেলে। মতি খাতাটা কেড়ে নিতে চাচ্ছিল, সে জোরে চেপে ধরে। মতি খাতা ছেড়ে মেশিনে উঠে যায়। মিতাকে খাতাটা দেখাবার ইচ্ছা ছিল, সেটাই প্রকাশ পায়। মতি মেশিন চালিয়ে কাজ করতে থাকে। মিতা খাতার মধ্যে কৌতূহলে ঢুকে পড়ে। ভেতরে বিষাদের জটিলতা আর বাইরে এক আর্ত-আনন্দভঙ্গি। দেহ থেকেই নিঃসারিত হয়। মনকে সরিয়ে মন থেকেই বেরিয়ে আসে। খাতার ভেতর এক-একটা পৃষ্ঠায় সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের রঙিন ছবি আঁটা আছে। মতির ভাললাগার মনের অ্যালবাম। এক-একটি পৃষ্ঠায় নায়ক-নায়িকাদের নানা ভঙ্গিমা ধরে রাখা হয়েছে। নায়িকাদের লাস্যের দিকে চোখ রাখা যায় না—চোখ ঝলসে যায়। মতিকে বুঝতে পারে। মতির

বয়ঃসন্ধিকে ধরতে পারে। এসব তার ভাল লাগে। মতির ছিপছিপে গড়ন। হালকা গোঁফের রেখা। নরম কড়াইশুঁটির মত সবুজ। মতির মধ্যে দেহের এক পরিপূর্ণতা এসেছে। এক হালকা স্বপ্নকল্পনার মধ্যে আছে। কিন্তু মতি কি ভারি সরল। মতি কি ভারি তার স্নেহ পাবার জন্যে পাগল হয়। এ/ক এক ধরনের প্রেম, জানে না মিতা। মেশিন বন্ধ করে মতি আবার এসে দাঁড়ায় মিতার সামনে। মিতা খাতাটা হাতে দোলায়। মতি হাত বাড়ায় খাতাটা নেবার জন্যে। মিতা দেয় না। 'পয়সা খরচা করে ফটো কিনে এসব হচ্ছে? খুব সিনেমা দেখছিস?'

মতি মাথা নাড়ায়। 'না না। অনেকদিন সিনেমা দেখি নি। আজ কেউ ধরে রাখতে পারবে নি। সিনেমা যাবই।'

'দেখে কী পাস?'

খাতাটা কেড়ে নেয় মতি। 'কী পাব আর, সিনেমা দেখি। মন ভাল লাগে।'

'মারপিট হয়?'

'হ্যাঁ, মারপিট, নাচ-গান হয়।'

'মন ভাল লাগে?'

মতি বুক চেতিয়ে হাসে। এতে মতির শরীরটা দুলে ওঠে। ঝাঁকিয়ে ওঠে মতির সমস্ত শরীর মিতার চোখের সামনে। মতির যৌবন কথা বলে ওঠে। মতিকে মিতা দেখতে থাকে। মিতা সহজ স্বরেই বলল, - 'চল তোর সঙ্গে আজ সিনেমা যাই।'

টিফিনের পর কাজে বসে প্রকট গরম অনুভব করছিল মিতা। সামান্যই অনিচ্ছা থাকে ব্লাউজ খুলে ফেলার পর অন্তর্বাস খুলে ফেলার। সামান্যই ধৈর্য থাকে। তারপর সমস্তই অধৈর্যে থাকা। অথচ বাইরে শান্ত নির্জন। বাড়ির কথা মনেই পড়ে না।

চোদ্দর তিন গলিটা এখন তার মনে শূন্য অবয়বকল্প। কোথায় গেছে হয়তো জাভেদ মিয়া। নীচে থেকে মালিক তাদের উদ্দেশ্যে রসিকতার কথা বলে উঠলে তার আনন্দ পেতে তাতে কোনো বাধা থাকে না। চমৎকার সে সাড়া দেয়।

মালিক মজিদ নীচের থেকে হাঁকে—'এই যে দিদিরা, আপনারা মোটা সুতো দিয়ে সেলাই করছেন, না সরু সুতো?'

মিতার জবাব দেবার আগেই সবিতা জবাব দেয়—'সরু সুতো।'

'ধ্যেৎ, সরু সুতো দিয়ে একদম সেলাই করবেন না! মোটা সুতো। পার্টি না হলে কাজ নেবে না।'

মিতা তখন কথার জবাবটা আগেই দিয়ে ফেলে। 'দাদা, আপনার টাকা কে

খাবে ? কাজ না নেয় নেবে ?'

মালিক তখন দরজার কাছে সরে এসে, মাচার ফাঁকে এসে দাঁড়ায়। 'কে বললেন ? বড়দি না ছোড়দি ?'

মিতা হামাগুঁড়ি দিয়ে মাচার মুখে এসে মুখ বাড়ায়।

'কেন আমি !' বুকে ভালভাবে আঁচল জড়িয়ে নিয়েছে। মুখে হাত তুলে হেসে ফেলে। চোখে চোখ পড়বার প্রতিক্রিয়াজনিত ছদ্ম লজ্জাসহ দাঁতে জিভ কাটে। 'আপনার পয়সার দুঃখু ?' আবার হাসিতে শরীর হেলতে থাকে দুলতে থাকে।

'ও বড়দি, আপনি ! আপনি ছাড়া এমন কথা কে বলবে ? বাংলাদেশে আপনার জমিজমা ঢের আছে, সে খবর কি আর আমি পাই নি ?'

'পেয়েছেন ? তাহলে আমাকে বড়লোক বলছেন ? তাহলে আমি বড়-লোক !'

'এই দিদি, তুই বড়লোক ? তাহলে আমিও বড়লোক, কি বল ?' সবিতাও ঐভাবে মাচার প্রান্তিকে চলে এসে মুখ বাড়ায়। এবং এই কথা বলার প্রতি-ক্রিয়ায় মিতার পিঠে সবিতা খামচে নেয় বেশ জোরে।

মিতা চমকে ওঠে। 'ঐ, উ' করে ওঠে। 'তুই একটা ডাইনি, খামচালি যে ?'

এই কথায় মজিদ বলে—'দুই সতিনের মত মারামারি করবেন না, গরিব মানুষের মাচাটা ভেঙে যাবে।' মজিদ ওদের সামনে দাঁড়িয়ে তেমনই হাসছে।

সবিতা মিতার পিঠে হাত তুলে দিয়ে আরো একটু এগিয়ে এসে বলে,—'আমাদের বাড়ি আর গেলেন না !'

মিতা পিঠ থেকে সবিতার হাতটা সরিয়ে দেয়।

'চলুন, আজকেই চলুন ! মার্কেটে আর যাব না।'

সবিতা বলে—'চলুন।'

মজিদ বলে—'চলুন।'

মিতা বলে,—'মুখে বলেন, আর যাবার বেলা ফুস।'

সবিতা বলে—'একদম মিথ্যেবাদী !'

সবিতা মিতা এই ক্ষেত্রে এককাট্টা হয়ে ওঠে। দুজনে শালিক পাখির মত ক্যাঁচম্যাচ করে ওঠে।

সবিতা পরমুহূর্তে জেদী হয়ে ওঠে। 'আপনি বললেন যাবেন, আজকেই আপনাকে নিয়ে যাব। ছুটির পরে মার্কেটে যাবেন, আমিও আপনার সঙ্গ নেব। ছাগল তাড়াবার মত নিয়ে যাব। ভাইপোর অন্নপ্রাশনে গেলেন না।'

'মার্কেট যাব না ত বলছি, আপনার সঙ্গেই যাব।' মজিদ হাসছে। চালাকির হাসি।

মিতা এই মুহূর্তেই মাচার মুখ থেকে সরে যায়। বসে বসে দু-হাত মাথার ওপর তুলে এলোচুলে খোপা বাঁধে। সবিতা মজিদের সঙ্গে কথা বলছে বলুক।

স্থির একা হয়ে বসে থাকে মিতা। ধীরে ধীরে নিঃশব্দে এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। অনেক গভীর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়া প্রোষিতভর্তৃকার মত বিছানায় যেন উঠে বসেছে। ঘরে স্বল্প আলোয়, অবয়বে বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নিজের চিন্তার মধ্যে চলে যায়। নিজের বিচ্ছিন্নতার মধ্যে চলে যায়। বাইরে অন্ধকার রাত। ঘরে স্বল্পালোকিত আলো। শ্লথ মূর্তির মত হয়ে ওঠে। স্থির অর্ধনমিত তাকিয়ে থাকলে চোখের পাতায় পাথরকুচি এসে জুড়ে যায়। এমনিতে মাচার ওপর আলো কম। বাইরে এমনি ভাবে আলো মরে আসে। যেখানে, এই এলাকায়, সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ড, ঘিঞ্জি, গলির অন্ধকারতায় ও বিশীর্ণতায় দেয়ালে দেয়ালে সংলগ্ন, ফুটপাথে রাস্তায় সংকীর্ণতা,—এই সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে আলোর ক্রমপরিবর্তন ধরা পড়ে বেশি।

ধরা পড়ে সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডের সংলগ্ন আর আর ওয়ার্ডের অবস্থানের স্বাতন্ত্র্যে। এবং আলো-ছায়ার ক্রম-পরিবর্তনের আলাদা এক ধরন থাকে। এই ওয়ার্ডের আলোর সঙ্গে ও ওয়ার্ডের আলোর চেহারা-স্বভাব হয় ভিন্ন। এবং অন্যনিরপেক্ষ।

আলোর পরেই বস্তু। আলো বস্তুতে পড়ে নানা রঙ ধারণ করে। এই ওয়ার্ডে আলোকে চমকিত ও রঙিন করতে পারে না মলিন বস্তুনিচয়।

বস্তুর পরেই আসে শব্দ। শব্দগুলি মন্থর শ্লথ গতিহীন। শান্ত হেঁটে চলার মত। শীতদষ্ট বুক থেকে দু হাত খুলে ফেলার মত নীরবতা।

তার পরেই আসে গন্ধ। সুগন্ধহীন গন্ধ।

এ-গলিতে ও-গলিতে, সংকীর্ণ রাস্তায় নানা হাঁটাচলা। আসলে একই রকম। মহাত্মা গান্ধি রোডে আর এক রকম। আমহার্স্ট স্ট্রিট কলেজ স্ট্রিট আরেক রকম। গলির ভেতর গলি। রাস্তার ওপর এসে রাস্তা পড়ে। রাজাবাজার ট্রামডিপোর বিপরীত গলি দিয়ে ঢুকলে পাটোয়ার বাগান। ডানদিকে ঢুকে গেলে কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট। বড় রাস্তার দিকটা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। বড় রাস্তার দিক থেকে শুরু হয় অ্যান্টনিবাগান লেন। আরো একটু ঢুকলেই ছকু খানসামা লেন। তার কাছেই বুধু ওস্তাগার লেন। দক্ষিণে ট্রামলাইনের ধারে সূর্য সেন স্ট্রিট। ওদিকে রমানাথ বিশ্বাস লেন ঢুকে গেছে। ওদিকে পটলডাঙা রোড, কাশীনাথ বোস স্ট্রিট ঢুকে গেছে। কালী সোম স্ট্রিটও আছে।

মালিক ছুটির পর মার্কেটে যায়। প্রতিদিনই। পাবলিশার্স পাড়া ঘোরে। পার্টির বাড়ি বাড়ি বিল দেয়, পেমেন্ট নেয়। পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে একটু ফিটফাট পোশাকে মালিককে বেরিয়ে পড়তে হয়। হেড কারিগর জয়নালদার সঙ্গে নিচু গলায় কী বলে মজিদ। কাজের কথা। ব্যবসার কথা। পার্টি এলে কাকে কী বলতে হবে, এসব কথা নিয়ে হেড কারিগর কথাবার্তা বলে। দরজার নীচে, গলিতে, সবিতা জেদী ও বেপরোয়া ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মিতা

তখনো কাটিং মেশিনের আড়ালে শাড়ির কুঁচি ঠিক করছিল। ভেতরে তার গা রী রী করে ওঠে। মালিককে তাদের বাড়ি আজ নিয়ে যাবে এই জেদ ও বেপরোয়া ভঙ্গি নিয়ে দরজার বাইরে গলিতে দাঁড়িয়ে থাকে সবিতা। মালিক কখনোই বলছে না যে, সে যাবে না। রাগ হয় সবিতার ওপর। মালিককে তার বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্যে হামলে পড়েছে। একেবারে বেহায়া বেপরোয়া হয়ে উঠেছে সবিতা।

কাটিং মেশিনের আড়ালে ছটফট করে মিতা। অথচ নিঃশব্দ হয়ে ওঠে।

মালিক বেরিয়ে পড়ে। গলিতে নামে।

সবিতা—'আজ আপনাকে আর ছাড়ছি না।'

'আমি বলছি ত যাব।'

'আর মাঝপথে চালাকি করলে আস্ত রাখব না কিন্তু। আপনাকে চিনি!'

'গেলে, ফিরব কখন?'

'কেন গরিবের ঘর বলে কি থাকতে দিতে পারব না?'

'আর আমার কাজগুলো কে করবে?'

'ওসব জানি না।'

ওরা গলি ধরে রাস্তার দিকে চলতে থাকে। দূরাগত হয়ে ওঠে ওদের কথোপকথন। মিতা রাগে পা ঠোকে। সবিতার ন্যাকামি। সবিতা একেবারে নির্লজ্জ হয়ে উঠেছে। আর মালিক মেয়েদের মন চেনে না? না হয়, জেনে-শুনে চালাকি করছে। মিতা মেঝেতে পা ঠোকে। রাগ হয়। ক্রোধে দেহ অগ্নিময় হয়ে উঠেছে। সবিতার স্বভাবের মধ্যে এই হামলে-পড়া ভাবটা আছে। সবিতা সহজে পেরে যায়। মালিক ছ-সাতজনকে খাটিয়ে সপ্তাহের শেষে টাকা দেয়। ব্যাঙ্কে টাকা রাখে। ভাল হোটেল রেস্টুরেন্টে মাঝে মাঝে খায়। সারা বছরই পার্টির কাছে তার হাজার হাজার টাকা পড়ে থাকে। বোর্ডের দোকানের সঙ্গে তার হাজার হাজার টাকার লেনদেন। কোনোরকমে সই করতে জানে। গ্রামে পাকাবাড়ি করেছে। জায়গাজমিও আছে। নানা গাছপালা বাগান পুকুর ডোবা আছে। স্ত্রীর গায়ে গহনা আছে। চার-পাঁচটি সন্তানের জনক। কম বয়সে বিয়ে করে ফেলায়, এখন তার বয়স মোটেই পঁয়তিরিশের বেশি নয়। কারখানায় একটা কাঠের ক্যাশবাক্সো আছে। সেই চাবিটা কোমরের ঘুনসিতে নিজের কাছে থাকে। নিজেও কর্মচারিদের সঙ্গে কাজ করে। কখনো কাজ থেকে উঠে গিয়ে রেডিও চালায় টেপরেকর্ডার চালায় নিজের ইচ্ছে মত।

লোকটি মালিকই নয়। এক সঙ্গে থাকার মধ্যে নিজেদেরই একজন হয়ে উঠেছে। ঠাট্টা ইয়ার্কি ফাজলামো—এর পেছনে লাগা, ওর পেছনে লাগা, এসব চলতে থাকে। আর সে এই সম্পর্কের মায়ার মধ্যে থাকে, এবং মালিক বলে আলাদা এক তীব্র আকর্ষণ হয়। মালিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে মিতার সঙ্গে সবিতার এক রেষারেষি আছে, এটা প্রতি মুহূর্তে টের পায় মিতা। ধর্ম

সম্প্রদায়জনিত ভেদজ্ঞান ভয়ংকর ভাবে মুছে যায়। এখানে সম্পর্ক ও রক্ত-মাংসের বোধই প্রবল থাকে। সমস্ত দিন এখানেই কাটে। জাগরণের সমস্ত সময় এখানেই কাটে। এই সম্পর্কের ইচ্ছার ভেতর ভয়ংকর ভাবে ঢুকে পড়তে হয়ই মিতাকে। সবিতাও ঢুকে পড়ে। সে কারণেই সবিতার ওপর রাগ হয়। সবিতার সঙ্গে গলি বেয়ে মজিদ হাঁটতে শুরু করলে মিতার তীব্র রাগ হয়। মজিদ যদি একা মার্কেটে চলে যেত, মজিদের চলে যাবার বিচ্ছিন্নতা তাকে এত তীব্র করত না। সবিতার সঙ্গে হেঁটে যায় বলে কষ্ট। আর সেই কষ্ট অস্ফুট প্রতিকারহীন। নিজের মধ্যেই নিজে মরে থাকে। নিজের দেহের গন্ধে নিজে মরে থাকে।

গলিতে নেমে আসে। ক্রোধে পা ঠোকে। চোদ্দর চারের গলিতে ক্রোধে উন্মত্ত পা ঠুকে ঠুকে এগিয়ে যায়। চোদ্দর তিনে ঢুকে কেমন শ্লথ শিকড়বিহীন হয়ে ওঠে। জাভেদের কারখানার দিকে নিঃশব্দ পায়ে হেঁটে যেতে থাকে। ঘেমে ওঠে। নেই। জাভেদ তার কারখানায় নেই। কোথায় গেল জাভেদ? আজ সারাদিন কর্মচারিরা কাজ করে। জাভেদ না থাকায় তার এমন অবলম্বনহীন মনে হয় কেন নিজেকে? স্বামীর স্মৃতি। স্বামীর টান। স্বামী ছিল এইটাই জাগরিত হয়। সে বধূ ছিল এইটাই কুরে কুরে খায়। সে জানে এই বৈধব্য তাকে কুরে কুরে খাবে। সে জানে তার আর বিয়ে হবে না। সে বিয়ে করাটাকে লালন করতে পারবে না। সমাজ-সংস্কার তার ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষাকে মেরে ফেলবে। তাকে এভাবেই থাকতে হবে। জাভেদ মিয়াকে দেখা তার এক অবলম্বন। জাভেদকে দেখতে না পেয়ে আরো শূন্য হয়ে ওঠে মিতা।

লক্ষ্মীদার কারখানা থেকে বেরিয়ে আসে মতি। নতুন প্যাণ্ট জামা পরনে। মিতার মুখোমুখি হতে থমকে যায় মতি। 'চল তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম।'

'কেন?' কথার সূত্র হারিয়ে ফেলেছে যেন সে। সবিতার সঙ্গে মালিককে পাশাপাশি হেঁটে যেতে দেখেছে।

'সিনেমায়।'

'কী সিনেমা রে?' স্বাভাবিকতা ফিরে পেতে পারে মিতা।

'যা হোক একটা দেখব।'

'কেন, তুই একা দেখতে পারবি না?'

'না তুমি চল।' বায়নাক্কা করে মতি! 'আমি দেখাব। দু টাকা পঞ্চাশের সিটে বসাব।'

ঠোঁটে টুকরো হাসির রেখার ভেতর থেকে মতিকে দেখতে থাকে মিতা। মতির আবেগ। মতিকে ঠেকানো যাবে না। আর মতির এই জোরের মধ্যে তাকে ঢুকে যেতেই হবে। সেজন্যেই মতির এই সারল্যের প্রতিক্রিয়ায় হাসে। মতি ভাবে, এই হাসিতে দিদি না যাবার কথা ব্যক্ত করছে। তখন সে চোদ্দর তিন গলির ভেতর মিতাকে হাত ধরে টানে। আর মিতা মতির হাতের টানে

এগিয়ে যায়। কেন? মতি জানে না।

প্রাচী সিনেমার সামনে মিতাকে রেখে মতি টিকিট কাউন্টারের দিকে এগিয়ে যায়। গাড়িঘোড়া লোকজন কোলাহলে জনবহুলতায় রাস্তা ফুটপাথ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সে সিনেমা দেখবে। একা এসে কোনোদিন সিনেমা দেখেনি। কলকাতায় কোনোদিন সিনেমা দেখা হয়নি তাই। আজ দেখবেই। ওভার-টাইম কাজ করলে এমনিতেই রাত করে বাড়ি ফেরে। আজ না হয় আরো একটু দেরি হবে। কিছুই যায় আসে না তাতে। মতি ভিড়ের মধ্যে কোথায় ডুবে যায়। ও হারিয়ে না যায়। হারিয়ে গেলেই বিপদ হবে। মুহূর্ত হারিয়ে যাবে। মুহূর্তের দোলা হারিয়ে যাবে। এদিক ওদিক তাকায়। চেনা মানুষ কেউই চোখে আসছে না। সকলেই অচেনা। কিন্তু একজনকে বেশিক্ষণ ধরে দেখলে চেনা হয়ে ওঠে। তার ঘর বাসস্থান জীবনের সাধারণ সব মুহূর্ত ধরা পড়ে। এমন অসংখ্যজন চেনা হয়ে ওঠে তার চোখে।

তার দাঁড়িয়ে থাকায় নিজেকে মনে করছিল, কোনো একজন সে অফিসের কর্মচারী। অথবা কুমারী কোনো একজন। এমন একটা স্বাদ তার শরীরে খেলে যায়! সে তাকালেও তার তাকানোটা তেমনই হয়। তার দাঁড়ানর ভঙ্গিমায় তেমনটাই গড়ে উঠতে চায়। মনে মনে সুখী থাকার আনন্দ ধরে রাখতে চায় শরীরে। শরীরটা যেন আসনপিঁড়ি অথবা শীতলপাটি। পেতে বিছিয়ে আনন্দই হয়। তেমনের মধ্যে গেলে সে শান্তি পায়। কলকাতার জনবহুলতা নিজের মধ্যে স্থিত রাখতে পারে। সংসারের মধ্যে নয়। প্রায়-অন্ধ শ্বশুর দুই দেওর আর রাতের ঘর নয়। সেখানে সে প্রায় মরে থাকে।

তার শাড়ি পরার মধ্যে এক প্রবীণ চাপল্যের প্রকাশ আছে। শাড়ির রঙটা কখনো কখনো তার সর্বাঙ্গকে রমণীয় করে তোলে। এই শাড়িগুলোর মধ্যে কয়েকটা পুরনো শাড়ি আছে। চার বছর তার স্বামীর সঙ্গে থাকার সঞ্চয়ের দু-একটা ছিঁড়ে গেছে। এখনো দু-একটা আছে। তাতে লেগে থাকে ন্যাপ-থলিনের গন্ধ। ফেলে রেখে আসা দিনের ঘ্রাণ। আঘ্রাত দিনযাপন উঠে আসে।

শুধু শাড়ি পরা ও শাড়ির রঙ সব নয়। দাঁড়ানর ভঙ্গিমাও সুন্দর করে। তাকানো, হাসা, চোখের চাহনি, হাতের মুদ্রা এসবেরও একটা সৌন্দর্য আছে। শ্বশুর-দেওররা তার কেউ নয়। শ্বশুর ঘরে কুকুরের মত শুয়ে থাকে আর কাশে। মেজ দেওর আর বিন্দুর ভরা জীবন। অদ্ভুত খিলবেড়া দরজায়। মেয়েটা রোগাটে, নিরীহ, বোকাও বটে। কিন্তু তার ওপর স্বামীর তীব্র টান আছে। সাইকেল সারাইয়ের দোকানে না ঘুমিয়ে সতীশ প্রতিদিনই ঘরে ফেরে। রাতের ট্রেনে হলেও। শ্যামল, ছোট দেওর কখনো রাতে ফেরে, কখনো ফেরে না। হয় পার্টি অফিসে ঘুমোয়, না হলে পার্টির নানা প্রোগ্রামে থাকে। কখনো

শেষ রাতে ফেরে চোরের মত। আলো না জ্বালিয়ে অন্ধকারের বিছানায়ই শুয়ে পড়ে। রেললাইনে ট্রেন যাবার শব্দ থাকে সারারাত জুড়ে। মালগাড়ি সারাক্ষণই শব্দ করে যাওয়া আসা করছে। ঘরের ছায়া উঠোনে। পেঁপে গাছ। অন্ধকারের দত্তদের পুকুরে জল নিপাট হয়ে থাকে।

শুধু অন্ধকারেই বিছানায় শুয়ে থাকে ছোট দেওর শ্যামল। নিরেট নিঃশব্দতায় তার ঘর ভরে থাকে। অচেনা দ্বীপের কে যেন সে। ঘরে থাকার তার অভ্যাস নেই। ঘরে ফেরেও কম। আর ঘরে অন্ধকার থাকে।

প্রাচী সিনেমার গায়ে পান-সিগারেট কোল্ড ড্রিঙ্কস্-এর দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মিতা। বাড়িতে ফিরতে রাত হবে সেজন্যে তার দুশ্চিন্তা হচ্ছে না। দিপুর কথাও না। দিপু তার ভেতরটায় হারিয়ে যায়। তার সমস্ত অস্তিত্বের ভেতর হারিয়ে যায়। দিপু নিজে হাঁটাচলা করতে পারে বলে তার কোলকে যেন বর্জন করেছে। আর দিপুর সমস্ত হাঁটাচলার সময়কে ত্যাগ করেছে সেও। দিপু হারিয়ে যায় সত্তা থেকে, কোল থেকে।

আর যারা সিনেমা দেখতে এসেছে, তাদের মধ্যে অনেকেরই পোশাক-আশাক আরো চমৎকার। সুন্দর সেজেছে। মলিন পোশাক পরা লোকজনও আছে। বাংলাদেশে তাদের গ্রামে চলে গেলে শুধু তার ঘরে ঘুমিয়ে শান্তি পেত। ঘুমিয়ে পড়ত। কেন চলে এল? এ-দেশে শ্বশুর দেওররা ছিল। ওদেশে তার কেউ ছিল না। এখানে চলে এসে শ্বশুর দেওরদের সঙ্গে কি থাকে? না, সে ত রাতের বিছানায় থাকে। শ্বশুর থাকে অন্য ঘরে অন্য বিছানায়। দেওর থাকে অন্য ঘরে অন্য বিছানায়। কলকাতার কোলাহল জনস্রোতের মধ্যে তাকে থাকতে হয়। কারখানায়, গলিতে। ছায়ায়, আলোয়। জনসমুদ্রের মধ্যে তাকে থাকতে হয়। নিজের দেহের গন্ধে নিজে মরে থাকে।

এই মুহূর্তে মনে হয়, মতিকে তার চাই। মতি তাকে এইখানে দাঁড় করিয়ে চলে যেতে পারে না।

মতি ভিড়ের ভেতর থেকে উঠে এসে মিতার সামনে উদয় হলে, মিতা প্রসন্নতায় ভরে উঠে। মতি সামনে এসে টিকিট দেখায়। মিতা মতির কথায় হাসে।

মতি বলল,—'শরবৎ খাবে বরফ দিয়ে?'

'তোর ত অনেক পয়সা দেখছি?'

মতি অদ্ভুত লায়েক হাসে। এবং ছুটে যায় শরবৎওলার কাছে।

আর মিতা মতিকে দেখছে প্রসন্নতায়।

দু গ্লাস শরবৎ নিয়ে ছুটে এল মতি।

দুজনে শরবৎ খায়?

মিতা বলল,—'তুই সব খরচা করবি নাকি?'

'পয়সা দিয়ে দিয়েছি।'

'পয়সা দিয়ে দিয়েছি' মতির কথাকে ভ্যাংচায়। 'পয়সা যেন গাছে ফলে! তুই যদি আমার নিজের ভাই হতিস, তাহলে আমার হাতের মার খেয়ে খেয়ে মরে যেতিস।'

এই কথার কোনো উত্তর হয় না মতি জানে! তাই হাসে।

'দাঁত বের করে হাসছে দেখ। জামার বোতাম খুলে রাখলে কী হয়! জামার বোতাম খুলে রেখেছিস কেন?' একটু সামনে সরে গিয়ে মতির জামার বোতাম লাগিয়ে দেয়। 'এবার দেখ ত কেমন দেখাচ্ছে তোকে! বাঁদরের মত থাকলে কার ভাল লাগে!'

তারপর এই কথার ভেতর দিয়েই, এই দাঁড়িয়ে থাকার ভেতর দিয়েই কলকাতায় সন্ধ্যা নামে। শেয়ালদা স্টেশন, উড়ালপুল সন্ধ্যায় ভরে ওঠে। এখন এক ধূসরতা। একটু পরেই আলোগুলি জ্বলে উঠবে। এই সবের ভেতর যেন মরে যেতে ইচ্ছে করবে। এই সবের ভেতর এক শূন্যতা। নেই নেই। এইসব চলে ত সব ঠিকঠাক। কোনো ছন্দপতন নেই। অফিস কাছারি ফেরত মানুষ উর্দ্ধশ্বাসে বাড়ি ফিরছে। বিশাল পটভূমিতে আলোর ক্রম-পরিবর্তনের ভেতর চিত্রবিচিত্র হয়ে উঠছে। এত কিছুর মধ্যে নেই, নেই। কিছু নেই। বাংলাদেশের প্রকৃতি জাগে, দেশ জাগে, রাষ্ট্র জাগে। স্মৃতি বিধুরতায় মরে থাকে। মতির সঙ্গে সিনেমায় ঢুকে যায় মিতা। সিনেমা হলে অদ্ভুত বাজনা বাজে। স্বল্পালোকিত এক পরিবেশ। মানুষের নানা গায়ের গন্ধ। সিটে শান্ত নির্জন হয়ে বসে থাকে। হল বেশ ঠাণ্ডা। ঝিম-ঝিম করে ওঠে মাথা। গেঁথে যায় সিটের ভেতর।

বুকটা ধক্ করে ওঠে হঠাৎ ই। সবিতা আর মজিদ সিনেমায় ঢুকেছে। হায়! কান মাথা গরম হয়ে ওঠে মুহূর্তে মিতার। এই দেখার পরেই হল অন্ধকার হয়ে যায়। ঘন অন্ধকার। রঙিন আলো পর্দার ওপর পড়ে। রঙিন দৃশ্য চলাচল করে। অগ্নিজ্বালা ক্রোধে জ্বলে মিতা। মালিকের সঙ্গে সবিতা সিনেমায় এসেছে! ছেনালি ছিল সবিতার। গা জ্বলে যায়। সিটের ভেতর গেঁথে যায় আরো। মালিকের সঙ্গে সবিতা সিনেমায় এসেছে বলে রাগ হয় কেন মিতার? না-রেগে থাকা যায় না। অদ্ভুত এক ক্রোধে নিথর ছটফট করে। কি করে বাঁচবে মজিদের কারখানায়? সবিতাকে সহ্য করবে কী করে! সবিতার সঙ্গে হাসতে হবে, কথা বলতে হবে। তার চেয়ে বাঘিনীর মত ফুঁসে ওঠা অনেক ভাল। সেও ত সিনেমায় চলে আসতে পারে মালিকের সঙ্গে! কেমন সে নিথর আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে।

মতি ক্ষুধার্তের মত সিনেমা দেখছে। পাশে বসে মতিকে দেখছে মিতা। মতি কাঁচা বয়সের ছেলেটি। এক মমতায় মতির কাঁধে ডান হাত ভর দেয়। মতি শক্ত হয়ে থাকে। হালকা অন্ধকার হলের ভেতর। তারপর মতির বাঁ কাঁধের ওপর মাথাটা ভর দেয় এক আচ্ছন্নতায়। কিছুক্ষণ এভাবেই থাকে।

যেন তার ঘুম ধরে যায়। মতি তেমনই শক্ত। অথচ কাঁচা ছেলেটি। ডান হাতের আঙুল দিয়ে মতির মাথায় বিলি কাটে। মতি তেমন হয়েই থাকে। তার কৈশোরের স্নেহঅভ্যাস বুঝি তাকে ধরে রাখে। বাঁ-হাত দিয়ে মতির জামার বোতাম খোলে, লাগায়। মিতা তার ডান গাল মতির কাঁধে চেপে রেখেছে। নিজেকে নত করে রেখেছে মতির দিকে। বাঁ হাতের আঙুল এবার মতির বুকে বিলি কাটে। মতির বুকের শব্দ অনুভূত হচ্ছে ধক্ ধক্ ধক্ ধক্। মতির শরীরের ধর্ম কাঁপে। মতির বাঁ হাতটা হাতে নেয়। চাপ দেয়। রমণী আনন আনত করে যেন ঘুমন্ত শিশুকে সেবা করছে। যেন রুটি বেলছে, মাছ কুটছে, বাটনা বাটছে। বাঁ হাতের আনায় ধরা মুখ। ভ্রু, চোখ, নাক। মুখের পাতা নরম হয়ে আছে। মতির বুকে নুয়ে পড়ে এবার মতির ডান হাতটা নিয়ে থাকে। চাপ দেয়? আঙুলগুলি একটা একটা করে ধরে। টানে। মতির হৃদস্পন্দন পাচ্ছে। ধিক্ ধিক্ ধিক্ ধিক্। মতি নরম হয়ে গেছে। নেই কোনো আত্মউদ্যোগ। তার হাত থেকে আঙুলগুলি খুলে যেতেও পারে। মিতা মতির বুকে মুখ ঘষে। কামড়াতে চায়। কামড়ে নেয় টুক করে। মতি জানে না। মতির জানার দরকার নেই। মতি কিছু না জানুক। বুকে মুখ ঘষছে। দাঁত ঠোঁট ঘষছে। কেন? জানে না মিতা। কোনো প্রশ্নের সে জবাব দিতে পারবে না। বাঁ হাতে মতির হাতটা ধরে। আঙুলে তার হাত পীড়ন করে! মতির কিছু জানার দরকার নেই। মতি না জানুক? এবার মতির ডান হাতটা সে তার বুকে টেনে নেয়। সেই ভারী বুকে। নুসে পড়া বুকে। মতির হাত কেঁপে ওঠে। মতির আত্মউদ্যোগকে ভয় পাচ্ছে মিতা। মতির হাত নিজের বুকে নিয়ে খেলে। মতি নড়ে চড়ে উঠছে। মতির হাতটা তার বুকের ভেতর নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়। মতির হাতটা শ্লথ পড়ে যায় না। মতি একা একা ধরে রাখে। কিন্তু কোনো উদ্যোগ নেই।

কিন্তু না। মতির বুক থেকে মাথা তুলে, মতির হাত বুকে রাখা অবস্থায় চেয়ারে শ্লথ গা এলিয়ে দেয়। মতির হাত তার বুকে রাখা থাকে। তার কোনো উদ্যোগ নেই এবার। মতির হাতও তেমন আছে। ছুঁয়ে আছে। যেন মতির হাত তার বুকে নেই, এই নির্বিকার পড়ে থাকে। যেন তার প্রাণ নেই, তেমন পড়ে থাকে। বুকে রাখা মতির হাত এই নীরবতায় ধীরে ধীরে ফুল হয়ে ওঠে। মতি জানুক, তার চৈতন্য নেই, প্রাণ নেই। সেইভাবে সে পড়ে থাকে। আর মতির হাত তার বুকে প্রচণ্ডতায় খেলা করতে থাকে। আত্মদ্রোহ ছাড়া পথ নেই। আত্মপীড়ন ছাড়া উপায় নেই। মতি পুরুষ। খেলা জানে। অন্ধকারের ভেতর, বোঝাপড়াহীন অন্ধকারের খেলা। মতিকে মুখ ভরে চুমো খেতে ইচ্ছে করে। খায় না। শরীরের ভেতর এক পুলক শিহর উঠে আসে। মতির হাতের ভেতর এক সংকোচ আছে বুঝতে পারে

যখন, তখন মিতা মতিকে সম্পূর্ণ পুরুষ মনে করে যখন, তখন মতির হাতে হাত রেখে তার সজ্ঞানতা জানায়। আর এই জেনে মতি হাত সরিয়ে নিতে চায় সসংকোচে। মিতা মতির হাত টেনে নেয়। উৎসাহিত করে। দুজনে দুজনের সজ্ঞানতার ভেতর ঢুকে যায়। যদিও অন্ধকার। এবং অন্ধকার। এবং অন্ধকার।

শেয়ালদা স্টেশনের রেলের লোহার লাইনগুলি শৃঙ্খলায়িত সমান্তরাল। নীচেটা কংক্রিটে বাঁধানো। শক্তপোক্ত ভাবে আঁটা। ওপরের ছাউনিগুলি টিন-অ্যাসবেসটসের। সন্ধ্যেবেলা কখন হওয়া বৃষ্টির জল ছাউনির গা বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় রেলের লাইনে পড়ে। ফোঁটাগুলি ধীর ও বিলম্বিত। তার এক নির্দিষ্টতা আছে। লাইনগুলি লোহা ও ভারী। তার চারপাশ তেমনই বজ্র-কঠিন। লাইনের ওপরটা ঘর্ষণে চকচকে মসৃণ হয়ে আছে। তার ওপর আলো ঝিকিয়ে যায়। বিদ্যুতের প্রভা চমকে ঠিকরে যায়। ওপরের তার টান টান, কালো। তার ওপর ধরে রাখা বৃষ্টির জল বহু সময় অন্তর এক ফোঁটা টুপ করে গড়িয়ে পড়ে। এবং আবার পড়বে। তাতে লোহার লাইন, কংক্রিট, কাঠিন্য থেকে সরে থাকে না।

সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমোয় নি শুধু বিন্দু। মিতার মেজ জা। ছোট দেওর শ্যামল ফেরে নি তখনো। কুকুরটা জেগে থাকে। উঠোনতলায় এসে চুপটি করে শ্লথ দাঁড়িয়ে পড়ে মিতা। কোনো মায়া নেই, কোনো ক্ষমা নেই এদের প্রতি। দেরি করে বাড়ি ফিরছে, ঠিকই করেছে। এবং এরা কেউই জানতে চাইবে না কেন দেরি হল। এ সংসারে তার প্রতি সকলের এক অদ্ভুত দয়া আছে। বিন্দু মেজ দেওরের সংসার নিয়ে বেশ থাকে। সে যতক্ষণ সংসারে থাকে না ততক্ষণ এরা যেন স্বাভাবিক থাকে। তাকে এড়িয়ে, নির্ঝঞ্ঝাট থাকতে চায়, এটা ধরতে পারে। সে রাত করে ফিরলে কোনো জিজ্ঞাস্য নেই তাদের।

বিন্দুর ঘরে, বিন্দুর দরজার অল্প ফাঁক দিয়ে, বিন্দুর হ্যারিকেনের আলোর সরু রেখা উঠোনতলায় এসে পড়ে। ঘরের ভেতর বিন্দুর চলাফেরায়, বিন্দুর জেগে থাকা ধরতে পারে।

কুকুরটা তাকে দেখতে পেয়ে ঘেউ ঘেউ করে।

কুকুরের শব্দ পেয়ে বিন্দু দরজা খুলে উঠোনে বেরিয়ে আসে।

অন্ধকারের উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকা মিতার আলোয় মুখ ভরে যায়। নিজেকে গোছাতে হয় তাতে।

বিন্দু—'এই যে দিদি আইসে।' তারপর বিন্দু ঘরের ভেতর ঢুকে যায় তার।

মিতার ঘর অন্ধকার। নিজের ঘরে ঢুকে, অন্ধকারেই, বিছানায় ব্যাগ রাখে। এবং কাপড় জামা ছাড়তে শুরু করে। স্নানে ধোয়া শাড়িটা রোদে শুকিয়ে গেলে কোথায় রাখা হয় মিতা জানে। সে পরা শাড়িটা বিছানায় রেখে আটপৌরে শাড়িটা দ্রুত পরে নেয়। আঁচলে গা ঢাকা দিয়ে উঠোনে বেরিয়ে আসে। পেঁপেতলার পাশে ছোট্ট চালাঘরে আলো। রান্নাঘর। তার ভেতর বিন্দু খুটখাট করছে।

দত্তদের পুকুরে মিতা হাত মুখ ধুতে যায়। পায়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাওয়া হাওয়াই চপ্পল। একটু বেপরোয়া চললে ফিতে খুলে যায়। অভ্যাসে অন্ধকারেই নেমে যায় ঘাটে। আজ ঘুটঘুটে অন্ধকার নেই। অমাবস্যা নেই। চার দিক আলো হয়ে আছে। দূরে বাড়িতে বাড়িতে ইলেকট্রিকের আলো জ্বলে। জ্যোৎস্নায় জল পায়ের ঠেলায় ঝম ঝম করে বেজে ওঠে। অঞ্জলি ও গণ্ডুষে ভারী হয়ে ধরা দেয়। জোনাকি জ্বলে। জোনাকি উড়ে বেড়ায়। পেঁপে গাছ। নারকেল গাছ। সজনে। জোনাকি জ্বলে নেভে। হাত ছোঁয়া থেকে নাগালের বাইরে মুহূর্তে উঠে যায়। ঝিঁঝির ডাক।

রান্নাঘরে ঢুকে পিঁড়ি টেনে বসে বিন্দুর মুখোমুখি। বিন্দু দুজনের ভাত বেড়ে খেতে শুরু করে দিয়েছে নিজে। এবং মিতার দিকে তাকাচ্ছে না।

মিতাও খেতে শুরু করে দেয়।

কুকুরটা দরজার সামনে বসে বসে লেজ নাড়ে।

শ্বশুরমশাই সন্ধেরাতে একটু ঘুমোয়, তারপর মাঝরাতে জেগে থাকে। কাশে। বিড়ি খায়। পাড়া প্রতিবেশী সব ঘুমের ভেতর। রাত শব্দ করে।

বিন্দুর ছিপছিপে শরীর। বেশ কর্মঠ।

বিন্দুর খাওয়া শেষ। আঙুল চাটতে চাটতে থালার দিকে তাকিয়েই বলল —'ওষুধ এনেছ?' সম্বোধন উহ্য রাখে বিন্দু এমন।

মিতা গুরুত্বহীনভাবেই সহজ স্বরে বলে,—'এই যা. একদম ভুলে গেছি!'

'তোমার ছেলের জ্বর. তুমি কি করে ভুলে যাও দিদি?'

এবার মোক্ষম সম্বোধন করে বিন্দু। তুণের মত।

সেই স্বরের ক্রিয়াশীলতায় থালাবাটি গোছায় এবং জল খায়, মিতার দিকে না তাকিয়েই। এবং পেছন ফিরে কাত হয়ে থাকা কলসিটাকে ঠিক করে বসাতে বসাতে বলে, 'সারাদিন ছেলেটার জ্বর। দিপুকে নিয়ে সারাদিন হারি পারি। এখনো জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। তোমার ঘরে দিয়ে যাচ্ছি।' বলে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যায় বিন্দু। বিন্দু নিদয়তায় বেরিয়ে গেল। পায়ে চলার শব্দই অন্যরকম শোনাল।

বিন্দু দিপুকে কোলে নিয়ে তার ঘরের দিকে যাচ্ছে। এবং দিপুকে তার ঘরে রেখে এসে, দ্রুত, কি দ্রুত নিজের ঘরের দরজা দড়াম করে বন্ধ করে দিল।

মিতা এমনিতেই ক্লান্ত। এমনিতেই নীরব থাকে। এই ঘটনায় আরো

নীরব হয়ে যায়।

দিপুর জ্বর। আঁচলে ভিজে হাত মুছতে মুছতে ঘরের দিকে শান্ত ও নীরব পায়ে এগিয়ে আসে। ঘরের ভেতর ঢুকে বিছানায় দিপুকে হাতড়ায়। গায়ে হাত পড়তে চমকে ওঠে মিতা। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে দিপুর। ঘরে অন্ধকার। এই অবস্থায় দিপুকে রেখে চলে গেছে বিন্দু। আলোও জ্বেলে দেয়নি। সহসা অসহায়তায় ছেয়ে যায় জননী অন্তর। 'বিন্দু, বিন্দু!' অসহায় গলায় অস্ফুটে ভার্ত ডাকে। 'বিন্দু বিন্দু।' আলো নেই। দিপুর সারা গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। একটা আলো নাই। 'বিন্দু বিন্দু।' দিপুর গায়ে হাত রাখে। হাত পুড়ে যায়। দিপু অনেক বড় হয়ে গেছে বুঝতে পারে। ছ বছরের। বেশ বড়! বেশ ভারী। কিন্তু আলো নেই যে!

কিছুক্ষণ সে বিছানার সামনে দাঁড়িয়ে থাক, দিপুকে না ছুঁয়ে, আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। বিছানার মাথার দিকে সরে যায় ধীরে ধীরে। তারপর হাতে পায় পেরেক টাঙানো ছোট চিমনিটা। কিন্তু দেশলাই কোথা? ঘরে কোথাও একটা দেশলাই আছে জানে। কিন্তু ঘরের অন্ধকারে দেখা যায় না। কোথায়? খোলা দরজা দিয়ে দেখা যায় বাইরে জোনাকি জ্বলে ওড়ে নেভে, আর জ্যোৎস্না। দিপু তারই সন্তান গায়ে তুমুল জ্বর নিয়ে শুয়ে আছে বিছানায়। অন্ধকারের বিছানায়। তারই নাড়ী ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছিল এ সন্তান। সেই দিনের স্মৃতি তাকে হঠাৎ জননীবাচকতায় ভার করে। আকুল করে অপত্য-স্নেহ মমতায়। অন্ধকারের ঘরে নিঃসহায় আকুল হয়ে পড়ছে। কলকাতা আসার পর এই একবারই যেন সে জননী হওয়ার আকুলতায় আকীর্ণ হয়ে ওঠে। অস্থির আকুলতা নিয়ে ঘরের ভেতর রাখা দেশলাইটাকে তাকে খুঁজতে হয়। খুঁজতে খুঁজতে মুহূর্তের মৃত্যু-যন্ত্রণা তাকে সইতে হয়। এপ্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে যায়। এখান থেকে ওখানে যায়। শরীরের ভঙ্গিমা নানা ভাবে ভাঙে। কখনো নুয়ে পড়ছে শরীর। কখনো মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে শরীর। ডান দিকে বাঁ দিকে সামনে ওপরে চারদিকে শরীরের কেন্দ্রিকতা সূচিস্নিগ্ধ হয়।

দিপু তার সন্তান! জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে আছে তারই বিছানায়। মুহূর্ত শুধু নিজের জন্যে না। আত্মজের জন্যে। নিজের ক্ষয় আর অন্ধকার নয়। আত্মজের সমৃদ্ধি ও আলোয় চক্ষুষ্মান হওয়া।

খুঁজে চলে। এ পাশ, ও পাশ, এখানে ওখানে। বাইরে জোনাকি ওড়ে। কুকুরটা বাইরে লেজ নাড়ে। ঘরের ছায়া ভেঙে পড়ে উঠোনতলায়। বাইরে জ্যোৎস্না রাত। জ্যোৎস্নায় বুঝি কাঁদে মিতা। কান্নায় শরীর এমন অনেকদিন শিহরিত হয় নি। সারা মুখমণ্ডল জুড়ে ব্যেপে আসে কান্নার আবেগ। কাঁদতে চাইছিল। সে কাঁদতে চাইছিল। কাউকে কান্না শোনাবার জন্যে নয়। নিজের জন্যে নিজে কাঁদতে চাইছিল। দেশলাইটা পেয়ে যায় মিতা।

ফস করে কাঠি জ্বালিয়ে অগ্নিপ্রভায় ভরিয়ে তোলে সারা ঘর। যেন

ঝড়ের রাত। আলোটাকে দু-হাতের আড়ালে রাখে। চিমনিটা জ্বালিয়ে নিলে আলোটা শান্ত হয়। ঘরটাই যেন শান্ত হয়ে উঠল। বিছানার একপাশে চিমনিটা রেখে নুয়ে পড়ে দিপুর দিকে। দিপুর কপালে হাত দেয়। গরমে হাত পুড়ে যায়। দিপুর নিশ্বাস-প্রশ্বাসের অস্বাভাবিক শব্দ হচ্ছে। বিড় বিড় করছে। কী যেন বলছে। হাত বাড়াচ্ছে। কাকে যেন খুঁজছে। 'কাকি, কাকি' বলে ডাকছে। বিন্দুকে খুঁজছে। বিছানা থেকে হাতপাখাটা টেনে নেয়। মাথায় ধীরে ধীরে বাতাস করে। কিন্তু দিপু জ্বরের ঘোরে কী সব বলছে। ভুল বকছে। কী সব নাম বলছে দিপু? কোথাকার এসব কথা? ফেলে রাখা দেশ রাষ্ট্রের স্মৃতির ভেতর আছে দিপু।

দিপুর গায়ে একটা চাদর দিয়ে দেয়। কেউ জেগে নেই। কেউ দেখছে না, দিপু জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। দিপুর গায়ে হাত দেয়। মাথায় হাত বোলায়। ঘোর জ্বরের মধ্যে দিপু পুড়ে যাচ্ছে। ভুল বকছে। অস্বাভাবিক রকম চোখ তাড়ছে। 'বিন্দু, বিন্দু।' বিন্দু তার ডাক শুনতে পাচ্ছে না। সন্তানের এমন অবস্থায় নিশ্চিন্তে থাকা যায় না। দুর্ভাবনা বিন বিন করে বেড়ে উঠছে। ক্রমশ জননী হয়ে উঠছে মিতা। জননীর সমস্তরকম অনুভূতি তার ভেতর এসে তাকে আলোড়িত করে। ব্যাকুল হয়ে পড়ে। 'বিন্দু, বিন্দু।' কোনো সাড়া নেই। কোনো প্রত্যুত্তর নেই। কান্না পায় মিতার। বিছানায় বসে দিপুকে তার কোলে তুলে নেয়। সমস্ত কোল তার কানায় কানায় ভরে যায়। এই পূর্ণতার শরীর দুর্ভাবনায় আর্ত-ব্যাকুল হয়ে ওঠে। 'শ্যামল শ্যামল।'

দরজা খোলা ছিল। উঠোনে পদশব্দ শোনা যায়। ঘরের ভেতর শ্যামল ঢুকল ঘুম-চোখে।

দিপুকে কোলে রেখে, তার দিকে আনত ঝুঁকে তাকিয়ে থাকে মিতা।

শ্যামল বুঝতে পারে। দিপুর কপালে হাত দেয়। 'কবে থেকে জ্বর হয়েছে, বড়বৌদি?'

মিতার চোখ মুখ বেঁকেচুরে চোখ বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ে গালে, ঠোঁটের ওপর। টুকরো আলোয় ঝিকিয়ে ওঠে।

'ও কিছু নয়। মাথায় জল ঢালো—ঠিক হয়ে যাবে। হঠাৎ জ্বরটা বেড়ে গেছে।'

শ্যামল বেরিয়ে যায়। মিতা শ্যামলের বেরিয়ে যাবার দিকে একবার তাকাল। জল আনতে গেছে। তার মনেই হয়নি, মাথায় জল ঢালার কথা।

শ্যামল দুটো বালতি নিয়ে আসে। একটাতে জল ভরা অন্যটাতে খালি। মিতাকে ইশারায় বিছানার বাইরে দিপুর মাথাটাকে নিয়ে যেতে বলে। মিতা নিশ্চিন্ত নীরব শান্তভাবে কোলটাকে ঘুরিয়ে দেয় বিছানার কিনারে। শ্যামল ঘটিতে জল ভরে ভরে দিপুর মাথায় ঢালতে থাকে। মিতা ক্রমশ বিপদমুক্ত, দুর্ভাবনামুক্ত, শান্ত হয়। পূর্ব অবস্থায় ফিরে যেতে পারে।

পাটোয়ার বাগানে স্থানীয় বাসিন্দা আছে। তারা উদু্ভাষী মুসলমান। বাঁধাই কারখানায় ভরা ছোট ছোট ঘরগুলি। গলির ভেতর আরো একটু গভীরে গৃহস্থের বাস। কারখানা থেকে গৃহস্থের বাস এক-পা দু-পা ভেতরে। একটা ছোট ঘরে দশ বারোজনের বসবাস। দিনে দিনে জনসংখ্যা বাড়ে, গৃহ বাড়ে নি। তারা কেউ কেউ এখন এইসব দু-চারটি কারখানার মালিক। ঘরভাড়ায় কারো কারো সংসার চলে। কেউ কেউ রাস্তায়, ফুটপাথে ফল বিক্রি করে। কেউ রিকসা চালায়। কেউ প্রেসে মেশিন চালায়। খাম-তৈরির ব্যবসা করে। থাকা-খাওয়া পোশাক-আশাকে অসুস্থতার চিহ্ন। দারিদ্র্যের চিহ্ন সর্বাঙ্গে। গলির ভেতরে বসবাসের জীবন গলিতে তার চিহ্ন রাখে সর্বক্ষণ। একটা ছোট ঘরে দশ-বারোজন থাকায় অসহিষ্ণুতায় ভরা থাকে তারা। নানা চিৎকার চেঁচামেচি, বাক্ বিসম্বাদ—সম্পূর্ণত পরিবারকেন্দ্রিক।

স্নান নেই, পেটে ক্ষুধা, ঘামে ময়লায় দুর্গন্ধ পোশাক। কলের জলে ঠেলাঠেলি। কেউ বোরখা পরে, কেউ বোরখা পরে না। কেউ নামাজ পড়ে, কেউ নামাজ পড়ে না। অন্ধকূপের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর ঠেসাঠেসি বাস। পরিবার ক্রমশ বেড়ে বেড়ে অচলায়তন বাড়ায়। দারিদ্র্য বাড়ে। এইসব গলির মধ্যে আরেক জীবন বাস করে। ময়লা কাঁথা বালিশ চাদর।

গলির ভেতর দুর্গন্ধময়, নোংরাভর্তি পায়খানা বাথরুম। এই গৃহস্থরা এইসব পায়খানা বাথরুম ব্যবহার করে। তাদের রান্নাঘর বসবাসের ঘরের কোণে। কয়লার উনুন আর কেরোসিন কুকারের ধোঁয়ায় ঘর, গলির দেয়াল চারপাশ কালিঝুলি হয়, শ্বাসকষ্ট হয়। এর ভেতর থাকতে থাকতে অভ্যাস জন্মে যায়।

এ রকম একটা ঘরে জাভেদের বসবাস। মিতা একদিন কাজে আসতে পারে নি ছেলের জ্বরের জন্যে। চোদ্দর তিন গলির ভেতর ঢুকেই জাভেদের কারখানায় চোখ ফেলে। আগের দিনের মত জাভেদ আজও নেই। কেন নেই? জানে না। কোথায় গেছে? কেন গেছে? জানে না। এটা কেন হচ্ছে? তিনদিন দেখে নি জাভেদকে। ঘাড় ফেরাতেই লক্ষ্মী সাহার কারখানা। এমনিতেই মতি বেরিয়ে আসছিল, চোখে চোখ পড়ে যায় মিতার সঙ্গে। মিতা এগিয়ে যায় লক্ষ্মী সাহার কারখানার দরজার দিকে।

মতি বলল,—'কালকে এলে না দিদি?'

'কাল ত কাজেই আসিনি। তুই আমার ছোটভাই, এলে তোর সঙ্গে দেখা করব না! সেদিন ত আমার শরীর খারাপ ছিল, বাড়ি ফিরে আরো শরীর খারাপ হয়। শরীর খারাপ হলে আমি কেমন হয়ে যাই।'

'তুমি একবারও বলনি, তোমার শরীর খারাপ ছিল।'

'আমার শরীর খারাপ হলে আমিই জানতে পারিনি, বলব কি!'

'কাল তোমার জন্যে জাম কিনে রেখেছিলাম দিদি।' মতির চোখ কাঁচুমাচু

হয়ে ওঠে মুহূর্তে। কোনো এক অপরাধে ভুগছে সে। হাত দুটি ও পা দুটি তার থরথর করে কাঁপছে। মতিটা কমবয়সি নরম ছেলে।

ওর অবস্থাটা বুঝতে পারে মিতা। চাতুর্যে মুহূর্তে ভরে উঠেছে পরিণত যুবতী মিতা। 'ফের যদি এটা ওটা আমার জন্যে কিনিস, তা হলে তুই আমার ভাই নোস। একদম তোর সঙ্গে দেখাদেখি বন্ধ।' থেমে গিয়ে স্নেহার্দ্র হাসে মিতা। 'লক্ষ্মীদা আসে নি এখনো?'

'না, আমি ত ঝাঁট দিয়ে ধূপ দিয়েছি। দুপুরে আসবে।'

'কেন রে, তুই আমাকে না দেখে থাকতে পারিস না?'

'ভেট!' লজ্জা পায় মতি। আব তার এই রাগে ভঙ্গিমা ও স্বরেই লজ্জা ভাঙে।

'বাড়ি যাচ্ছিস নাকি এই সপ্তাহে?' মিতা পেছু ফিরে ঘাড় বেঁকিয়ে ধরে।

'যাব। দুপুরে আসবে ত!' মতির আর্তস্বর।

'দেখি - অবস্থা বুঝে আসব।'

'না আসতে হবে।'

'তোর কে রে? তোর আপন দিদি নাকি?'

'না, তুমি আমার আপন দিদি। যাও।'

'রাগ করলে, চাঁটি খাবি, গাট্টা খাবি। ওস্তাদ হতে পারিস না!'

'তুমি কী জানো? ওস্তাদ না এলে, ওস্তাদের কাজ কে ধরে? মালিক কাগজ লাগায়, আমি স্টপ টেনে দিই।'

'ও কী কাজের ছেলে রে!'

'ও, তুমি কী কাজ জানো শুনি। শুধু ত সেলাই কর। আর অন্য কাজ?'

'আমি কেন কাজ করব রে, দিদিকে তুই খেটে খাওয়াতে পারবি না?'

'পারব।'

'ও অনেক দেখা গেছে।'

'আমি ত টাকাই পাঠাই না ঘরে। কারিগর হয়ে গেলে আমার টাকা বাড়বে।'

'এই রে নটা বেজে গেছে, গেলাম। হ্যা রে জাভেদ মিয়াকে কদিন দেখতে পাই নি কেন বল ত!'

'ও তুমি জান না? জাভেদ মিয়া ত হাসপাতালে, কঠিন অসুখ।'

মিতা টলে পড়ে যাচ্ছিল, দেয়াল ধরে সামলায়। বাক্‌রুদ্ধ হয়েই মতির চোখে চোখ রেখে হাসে। পেছন ফিরে হাঁটতে শুরু করে। হাঁটে যেন দেহে আত্মা নেই। আত্মায় দেহ নেই।

আজ চার দিন হল জাভেদ মিয়াকে দেখে নি। বিরহ সয়, মাথুর সয়না। কী অসুখ, কী হয়েছে জাভেদ মিয়ার জানে না সে। কেন এ কথা এখানে আকাশে বাতাসে রটে যায় না? জাভেদ মিয়া হাসপাতালে, এ নিয়ে কারো

দুর্ভাবনার উষ্ণ কথাবার্তা নেই। একটা লোক এখানে প্রতিদিন সকলের চোখে পড়ত, সকলের চোখ থেকে সরে আছে, তাতে কারোর কোনো অভাব বোধ নেই। বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে না? গলিগুলোকে কি কারো আরো অন্ধকার লাগেনা? চোদ্দর তিনের গলি অপূর্ণতায় কারো চোখে কি ধরা পড়ে না? কিংবা গলির চরিত্র ব্যথিত হয়ে আছে, এই সহৃদয়তা কি কারো নেই? একটা লোক সারাদিন ঐ ঘরটায় একই ভঙ্গিতে এবং অজস্র চেনা মুদ্রা ছাপিয়ে তুলত ঘরটাতে, সেই দৃশ্য শূন্য হয়ে উঠলে কারো ত অভাববোধ হতেই পারে। একটু অভিমান, একটু মন খারাপ নিয়ে মজিদের কারখানায় ঢুকে যায় মিতা। শাড়ি বদলায়। মনে শান্তি নেই। মই বেয়ে অস্বাভাবিক রকম অসৌজন্যে মাচায় উঠে যায়। নিজেকে পেতে রাখার নিজস্বতার ভেতর ঢুকে যায়।

সবিতা কাজ করছিল এক মনে। সবিতা কাজ থামিয়ে তার দিকে মনোযোগ দেয়। মিতা সবিতাকে সৌজন্য দেখায় না। মনের গতির টানে সে কাজের মধ্যে ঢুকে যাবার জন্যে উদ্যোগী হয়। 'মিছেল' টানা ফর্মাগুলো হাতের কাছে গুছিয়ে রাখে। তক্তিটাকে ঠিকঠাক বসায়। টুক করে সেলাইয়ে ঢুকে যায়। ফর্মার মাঝখানে ছুঁচ ঢোকানো ও টুক করে টেনে নেয়া অতিদ্রুত হতে হয়। ডান হাতের টানে সুতো টেনে নেয়। বাঁ হাতে ফর্মা টেনে বসানো ও ছুঁচ ঢোকানো চলে। সুতোয় টান। নতুন করে সুতো পরাতে হয় ছুঁচে। ছুঁচ সুতো চোখ একই বিন্দুতে নিয়ে আসতে হবে। সুতো না লাগার সংকট যেন নিরবচ্ছিন্ন এক সংকটে চলে আসে, অথচ মুহূর্তের মধ্যেই সুতো পরানো হয়ে যায়।

নীচে হেড কারিগর জলিলভাই 'জেল ধরায়'। বয়টা কভারে ব্রাশ দিয়ে গরম আঠা লাগায়। একে 'পিলানো' বলে। লেমিনেশন কভার বিছিয়ে তার ওপর বোর্ড সাঁটে হেড কারিগর। এক নিম কারিগর পুট মোড়াই করে। এক সাগরেদ আর একজন কারিগর মেশিনে বই কাটিং করে। অন্য একজন সাগরেদ পুস্তানি লাগিয়ে চলে। মালিক মজিদ প্যাঁচমেশিনে বই চড়ায়। কাঠের হাতুড়ি দিয়ে বইয়ের স্পাইন গোল করে। এই বইটায় পুস্তানি লাগানো হয়। জেল ধরানো বই কভার পুস্তানি এঁটে বইয়ের আকার নেয়। এই বই গুছিয়ে রাখে এক জায়গায়। তার ওপর মাঝে মাঝে বয়টা উঠে দাঁড়িয়ে চাপ দেয়। যাতে পুস্তানির আঠা কভারের বোর্ডে সেঁটে যেতে পারে সহজে। তারপর এই বই হট মেশিনে চড়ানো হবে। একটার ওপর একটা বই উঁচু করে সাজিয়ে সাজিয়ে হট মেশিনটা ভর্তি দিতে হয়। তারপর হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বইয়ের ওপর চাপ দিয়ে রাখতে হয়।

কখনো কাজের মধ্যে গভীর ভাবে ঢুকে যেতে হয়, কখনো কাজে জিরেন আসে। শিথিল হয়ে আসে কাজের গতি। এটা ওটা কথাবার্তা চলে। কেউ বাইরে যায়, তার জন্যে সম্পূর্ণ দলবদ্ধতা থেমে যায়। কেউ তার কাজটা করে

দিলে আবার কাজ পায়। তবে দলটাই কাজ হয়ে ওঠে। দলের ভেতর ব্যক্তি দল হয়ে যায়। তার বসে থাকা চলে না। আর একজন তাকে কাজের দিকে ঠেলে দেয়। সে আবার একজনকে ঠেলে দেয়। যে কাজে বেশি দক্ষ, তার প্রতি অন্যের আনুগত্য আত্মসমর্থন থাকে। এ-রকম করে সময় চলে জলের মত। কখন টিফিনের সময় হয়ে যায়। কখন কাজের নির্ধারিত সময় কেটে যায়। সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডের দিনের আলোর নানা পরিবর্তনের ক্রম নানা ছায়ায় আলোয় রেখে যায়। ঠেলায় ফর্মা আসে। ঠেলায়, সুটো বই যায় পাবলিশার্সের ঘরে।

মিতা এই কাজ ছেড়ে ঘরে বসে থাকতে পারবে না। আর সপ্তাহে ষাট টাকা পায় সে। এই টাকার থেকে পঞ্চাশ টাকা বিন্দুকে দিয়ে দেয় সে। সপ্তাহে আরো পনের বিশ টাকা ওভারটাইম করে। সে টাকা জমায়, জমিয়ে শাড়ি ব্লাউজ শায়া এটা ওটা কেনে। ছেলের জামা প্যান্ট কিনে দেয়। বিন্দু সংসার চালায়। সংসারে তার এই টাকাটার ওপর এক নির্ভরতা গড়ে উঠেছে। রবিবার সকালে নিজে মাথে তেল নেয়, রেশনে যাবার নাম করে। আর মিতা এই টাকাটা দেবার জন্যে বসে থাকে। টাকাটা দিয়ে দিলে তাকে ভারমুক্ত মনে হয়। সংসারের এটা ওটা ধোয়া মোছা করে রবিবারটা কাটিয়ে দেয়। দুপুরে কখনো কখনো ঘুমোয়। বিন্দু পাড়ার সরকারদের বাড়ি সন্ধ্যেবেলা টিভিতে সিনেমা দেখতে যায়। সন্ধ্যেবেলা রুটি বানাবার দায়িত্ব মিতার ওপর থাকে।

আর তার পক্ষে কাজ ছেড়ে ঘরে বসে থাকা সম্ভব নাই। থাকতে পারবে না। রবিবার তার কাটেই না। ছেলেটাও তার কাছে ঘেঁষে না। শুয়ে বসে সংসারের কাজ করে, যতটা পারে সময় কাটিয়ে দেয়। ঘরে সারাক্ষণই তাকে বেমানান লাগে। ভেতরে ভেতরে এক ছটফটানি ভাব আসে। কাজের চৌহদ্দির মধ্যে চলে এলেই সে শান্তি পায়।

আজ আর সবিতার সঙ্গে তার বিশেষ কথা হয় না। মাঝে মাঝে এ-রকম হয়েই থাকে। পাশাপাশি বসে কাজ করে, কেউ কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলে না। অথচ সময় চলে যায়। এরকম বিচ্ছিন্নতার ভেতর তারা থাকেই। বাইরের কেউ এসে কথা বললে, তা হলে তাদের এই বিচ্ছিন্নতা ধরা যায় না। মিতার মনে আসে নি সবিতার সঙ্গে কথা বলতে হবে। ইচ্ছে জাগে নি। সবিতারও জাগে নি। দুজনেই পাশাপাশি থেকে কথা না বলার মধ্যে মরে থাকে।

টিফিনের সময় হয়ে যায়। সবিতা আগে উঠে পড়ে। এবং সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে যায়। এই দৃশ্যের এক মিহি আঘাতে মিতার মন হুহু করে ওঠে। শরীর কেঁপে ওঠে কান্নায়। চোখে জল এসে যায়। হুহু করে উঠেছে বুক। কারো কোনো ছোটখাটো অবহেলায় সে ভেঙে পড়তে পারে। কেন? কেন?

সবিতাকে বলেছে, তার বিয়ের গল্প। সংসারের গল্প বলেছে। বলেছে সেই মৃত্যুদিনের ঘটনা। তার আগের ঘটনা, তারও আগের ঘটনা। সবিতাকে

বলে নি জাভেদ মিয়া তার স্বামীর মত দেখতে। বলতে পারেনি।

সবিতা হাত মুখ ধুয়ে এসে বসল। টিফিন খাবে। সবিতা এসে বসতেই অমনি নেমে পড়ে মিতা। খেতে তার ভাল লাগছে না। নেমে এসে সেই চোদ্দর তিন গলির ভেতর যায়। জাভেদের কারখানার দরজার সামনে দাঁড়ায়। কারখানার কর্মচারিরা খাচ্ছিল। সকলে সকলের মুখ চেনা। মাচার ওপরে একজন বউ খাচ্ছিল। তার দিক থেকে মুখ নামিয়ে বয়স্ক কারিগরটার দিকে তাকায়। 'জাভেদ মিয়া হাসপাতালে?'

'হাসপাতাল আজ পাঁচদিন।' কর্মচারীটি আবার খেতে শুরু করে দেয়।

'কী হয়েছে?'

'রক্তবাম করেছিল।'

'কোন হাসপাতালে আছে?'

'মেডিকেল কলেজে।'

'সেটা কোথায়?'

'ঐ ত ওদিকে।' হাত উঁচিয়ে বোঝাতে চায়।

'ভাল আছে?'

'দিন দিন ত খারাপের দিকে যাচ্ছে।'

'এলাম, অ্যাঁ!' আর দাঁড়ায় না মিতা। দাঁড়াতে পারে না। কেমন শ্লথ শিকড়হীন হয়ে পড়ছে।

গলির ভেতরে আর একটু সরু অন্তর্গলি। তার সামনে জাভেদের রোগা বউটা শিশুসন্তান কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে জলের কলে তার তের চোদ্দ বছর বয়সের মেয়েটা কাপড় ধোয়। আগে সাবান লাগানো ছিল। এখন ধুয়ে নিচ্ছে শুধু। মেয়েটা বেশ লম্বা। ধবধবে ফরসা গায়ের রঙ। ওরা সহজ হতে চাচ্ছে ওদের চারপাশের সঙ্গে। ওরা কেন হাহাকার করে কেঁদে ওঠে না? পারবে না।

আজ আর লক্ষ্মী সাহার ঘরে যাবে না। মতির সঙ্গেও দেখা করবে না। মতির তাকে নিয়ে কোনো ব্যক্তিগত আবেগ থাকতে পারে না। থাকতে নেই। কি যে হল তার এই সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডের প্রতিটি গলি ঘুরিয়ে সে হাঁটতে চাইছে। মিতা হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হতে চাচ্ছে। একটা গলি থেকে আর-একটা গলি। রাস্তা পেরিয়ে আর-একটা গলি। এইভাবে হাঁটতে থাকে।

ছ বছর ছিল তার বিবাহিত জীবন। আট বছর আগে তার বিয়ে হয়। তার ছেলের বয়স এখন ছ বছর। বিয়ের এক বছর পরে, তার স্বামীর সন্তান ধারণ করে সে। তার তখন আঠার বছর বয়স—বিয়ে হয়। বাবা নেই, দাদার সংসার। মাও হাঁপানির রোগী। শ্বশুরমশাই তখন ওদেশে। প্রথম দেখানো-তেই আশীর্বাদী। এবং পনের দিনের মধ্যে বিয়ে হয়ে যায়। দিপু যখন পেটে, শ্বশুরমশাই আর শাশুড়ি এ-দেশে মেজ ঠাকুরপোর কাছে চলে আসে।

মেজ ঠাকুরপো অনেক আগেই এ-দেশে এসেছিল। একাত্তর সনে। শ্বশুর-মশাই এখানে এসে মেজ ঠাকুরপোর বিয়ে দেয়। এখানে আসার দেড় বছর পর শাশুড়ি মারা যায়। তাদের বিঘে তিনেক জমি ছিল। আর ঘর ভিটে, ভাগের সামান্য পুকুরটুকু। তার স্বামীর ছোট একখানা মুদির দোকান ছিল। ভীষণ ভাল অনুগত তার একটা পোষা কুকুর ছিল। সারাদিন দোকানের সামনে মাটিতে মুখ ঠেকিয়ে শুয়ে থাকত।

মৃত্যুর চার মাস আগে দিপুর বাবা খাওয়া-দাওয়া ঠিক মত করতে পারত না। প্রতিদিনই কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে। খাওয়ার রুচি নেই। দোকানও খুলতে পারে না। দিনের দিন রোগা হয়ে যেতে লাগল। খাওয়া নেই। খিটখিটে ভাব। ছুতোনাতাতে খিট খিট করে উঠত। অথচ মানুষটা এরকম মোটেই ছিল না। রাগ অপমান লুকিয়ে রাখতে পারত। তার এই খিটখিটে ব্যবহারের কথা ভাবলে মিতার এখনো শরীর কেমন হিম হয়ে যায়। যে-চোখে এত ভালবাসা, সে মানুষ এমন হয়ে উঠল কেন? দিন পনেরর ভেতর একটু দুধ ছাড়া কিছুই খেতে পারত না। শুয়ে থাকত। ওঠা, হাঁটা-চলা একটু করলেই বিরক্তি আসত। সারাক্ষণই বিরক্তি প্রকাশ করত। খুড়তুতো দেওর অনন্ত বেকার ছিল। সে দোকানে বসল। গ্রামের ডাক্তার দেখে। ইঞ্জেকশন দেয়, ওষুধ দেয় - সারার কোনো লক্ষণ নেই। দিন দিন রোগা হয়ে একেবারে বিছানার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে দিপুর বাবা। দিপুর স্পষ্ট মনে আছে তার বাবাকে অনন্ত ছাড়া আত্মীয় পরিজন তার আর কেউ নেই। মা মারা গেছে। দাদা তার চার মাস আগে ভারতে চলে এসেছে - কোথায় এসে উঠেছে তারও কোনো খবর পায় নি। কত আত্মীয় পরিজন ছিল গ্রামে, দিনের পর দিন এদেশে চলে আসার হিড়িক। তারা কেউ ফিরেও আসে না। তারাও চলে আসত। কিন্তু দোকান-বাবসা ছেড়ে আসতে পারে নি। অনন্তকে নিয়ে ঢাকার হাসপাতালে নিয়ে আসে। নানা পরীক্ষা, চিকিৎসা চলে। দামি দামি ইঞ্জেকশন কিনে দিতে হয়। জানা যায়, তার স্বামীর ক্যানসার হয়েছে। কিন্তু এই কথায় প্রথমে মুষড়ে পড়েছিল মিতা। তারপর শক্ত হয়ে যায়! এক মরীয়া ভাব আসে তার। প্রতিদিনই হাসপাতালে আসত সে দিপুকে সঙ্গে নিয়ে। দিপুকে কারো কাছে রেখে আসবে, কেউ ছিল না তার। দোকান বিক্রি করে দেয়। তিন বিঘে জমি তিন হাজার টাকায় বন্ধক রাখে। দোকান ছ হাজার টাকায় বিক্রি হয়। পুরো টাকাটা তিন মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। তার স্বামীকে পোড়াবার জন্যেও যথেষ্ট পয়সা ছিল না হাতে। হাসপাতাল তিন মাস রাখল। আর রাখতে চাইল না। হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার সাত দিন পরে, বিকেলে, দিনের ধূসর আলোয় তার স্বামী কেমন করে ওঠে। গ্লুকোজের জল খাওয়ায়, গালে নেয় না। বেরিয়ে আসে। চোখ ঠেলে আসে। তার কাছে কেউ ছিল না। না পাড়া, না প্রতিবেশী। দিপু ছিল উঠোনতলায়। নদীতে

সেবার জোর জোয়ার। প্রান্তর তখন বর্ষার জলে থই থই করছে। কাছে দূরে প্রান্তরের মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। সেই সময় তার স্বামীর মাথাটাকে কোলে তুলে নিয়েছিল মিতা।

মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছিল। কাঁদে নি। মিহি আলোর চারপাশ খোলা দরজায় এঁটে এসেছিল। খোলা প্রান্তর, খোলা দিগন্ত। কেউ তার দরজার কাছে আসে নি। বিকেলের ধূসরতা ক্রমশ ছায়া হয়ে আসছিল। বর্ষাকালের নানা পোকা ও ফড়িং, প্রজাপতি ও সোনালি মাছি এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। ছড়িয়ে থাকে ফাঁকায়, বাতাসে। পুঁই আর কুমড়ো মাচার গন্ধ অঁ্যাদালে কঁ্যাদালে। ভিজে মাটি। নরম শীতলতা। শান্ত হয়ে ছিল দিন-শেষের গ্রাম। কুকুরটা ছিল দরজার বাইরে। দিনে দিনে তার অনুভূতিও মরে এসেছিল। ঘেউ ঘেউ চিৎকার করে তেড়েও যায় না। ধূসর মরা আলোয় মিতার কোলে মাথা রেখে মরছিল লোকটা। নীরব ধূসর প্রান্তরকে চোখে-মনে নিয়ে মৃত্যুমুখের দিকে নীরব শান্ত হয়ে তাকিয়েছিল মিতা। তার চোখে পলক পড়ছিল না। সে কোলে মাথা নিয়ে স্থির মূর্তির মত ছিল। অপার চোখে দেখছিল লোকটাকে। দেখছিল মৃত্যুকে। ক্রমশ মৃত্যু। ক্রমশ মৃত্যু। ঘরের ভেতর কোনো শব্দ নেই। বাইরে দিগন্তে মানুষের কণ্ঠ ভেসে বেড়ায়। ভেসে বেড়ায় অসংখ্য সাধ আহ্লাদ। প্রথমে চোখ স্থির হয়ে যায়। তারপর ঘাড় হাত দুটি শক্ত হয়ে যায়। ঠোঁট দুটি স্থির হয়ে থাকে। মৃদু স্পন্দন থেমে যায়। মুহূর্তে বিকট ভয়ংকর চিৎকার করে ঐ যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে বিছানায়, দুদিন ঐ অবস্থায় অজ্ঞান ছিল মিতা।

হিন্দু-মুসলমান, পাড়া প্রতিবেশিরা তার ঘর উঠোন ভরে গিয়েছিল। রাতে কখন পোড়ানো হয়, সে খবর সে জানে নি। তারও পরের দিন অজ্ঞান হয়েছিল। কে যেন তার কানে পালক ঘোরায়, মুখে জলের ঝাপটা দেয়, জানে না মিতা। জ্ঞান ফিরে পায়নি, উঠে বসার। অনন্তের দিদিমা ও এক বিধবা মাসিমাকে ডেকে এনেছিল অনন্ত। দিপু ছিল তাদের কাছে। অনন্ত তার অজ্ঞান অবস্থায় কানের গহনা খুলে, তার স্বামীকে পুড়িয়ে এসেছে।

ভোর রাতে, পরের রাতের ভোরে, ঘুম থেকে উঠে ঐ যে কেঁদে উঠেছিল, তারপর সকাল দুপুর সন্ধে তার পরের দিন সারারাত ধরে কেঁদেছিল চিৎকার করে। ইনিয়ে বিনিয়ে। লোক জমে উঠেছিল তার সামনে। তাতে কান্না আরো গতি পেয়েছিল। কেউ তাকে খাওয়াতে পারে নি আরো দুদিন।

তারপর দু-চারদিন ছাড়া ছাড়াই, পুকুরঘাটে, শ্মশানের দিকে মুখ করে এক দু-ঘণ্টা কাঁদতো।

তারপর স্বামীর শ্রাদ্ধ শান্তি করা। জমির উপর আরো টাকা নিতে হয়। ঘরের ফুটো চাল ছাইতে হয়। এই করতে করতে জমি একদিন লিখে দিতে হয় রহিম মিয়াকে। জমি রেজিস্ট্রি করে দেয়ার ব্যাপারে রহিম মিয়া ও তার

ছেলেরা ঘর চড়ে শাসিয়েও ছিল। দিপু সেদিন ছিল তার কোলে। দিপুর দিব্যি যখন গাললো তার পরের দিনই জমি রেজিস্ট্রি করে দেয় মিতা।

একদিন সহায়-সম্বলহীন নিরাশ্রয় হয়ে অনন্তের সঙ্গে ভারতে চলে আসে। প্রথম ক'দিন শেয়ালদা স্টেশনে থাকে। তারপর অনন্তের দিদি থাকত দমদম ক্যান্টনমেন্টের ঝুপড়িতে। নিজের পেটকোমরে কিছু টাকা ছিল বলে ঘরে রাখে। দিনে দিনে টাকা খরচ করে নিঃস্ব হতে থাকে। তার শ্বশুর-দেওরের খবর অনন্ত দিতে পারে না। দু'মাস পরে অনন্তই তার জ্যাঠার খোঁজ নিয়ে আসে। বিন্দুর সংসারে গিয়ে পড়ে। শ্বশুরেরও নিজের কাজ করার ক্ষমতা নেই। বিন্দুর সংসারে বসে বসে খাওয়া বিন্দু দেখতে পারল না। সবিতা ওদেশ থেকে এসে এখানে বিধবা হয়েছে। বারাসাতের কাঠগোলায় সে তার ভাইয়ের সংসারে ছিল। তার সঙ্গে চেনা জানা হল। সবিতা তাকে নিয়ে এল মজিদের কারখানায়। প্রথমে মজিদ কুড়ি টাকা দিত সপ্তাহে। ষাট টাকা সপ্তাহ পায় এখন।

ভারতবর্ষে যখন আসছিল, তখন মিতার কত না স্বপ্ন কল্পনা ছিল। ভেবেছিল, কোন স্বপ্নের দেশে সে যাচ্ছে।

এখন এখানে, বাংলাদেশের প্রকৃতি তার মধ্যে ঘোরতর ভেসে ওঠে। ভেসে ওঠে স্বামীর স্মৃতি। ফড়িং প্রজাপতি নদী প্রান্তর গাছপালা। স্বামীর সঙ্গে বসবাসের নানা মুহূর্ত।

উঠোনে প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে, দিপুকে কোলে নিয়ে, দিপু মাটিতে নেমে পড়তে চাইত। দিপুর মাটি খাবার খুব নেশা ছিল। শুকনো সোঁদা মাটির ডেলা খেত। আর মিতা দূরে প্রান্তরে, শ্মশানের দিকে তাকিয়ে থাকতো। কুকুরটিও শ্মশানে চলে যেত একা একা। একা একা একটা নিমগাছের তলায় বসে শ্মশানের দিকে তাকিয়ে থাকতো।

গলিতে হাঁটতে হাঁটতে মিতা ভাবে, কুকুরটা হয়তো এখনো আছে। নমঃপাড়ার বাঁ-হাতি নদী। জ্যোৎস্না। সবুজ গাছপালা। তার স্বামী তার গায়ে কোনোদিন হাত তোলে নি। শান্ত থাকা তার স্বভাব। মিতাই তার স্বামীকে বকাঝকা করত। অন্যায় রাগারাগি করত। সেই শ্মশানে কুকুরটা হয়তো এখনো যায়। নিমগাছটার তলায় বসে তাকিয়ে থাকে শ্মশানের দিকে। ভিটে-ঘর বেচে আসে নি। খড়ের চাল বর্ষায় ফুটো হয়ে হয়ে হয়তো ঘরদোর ভেঙে গেছে তাদের। দেয়ালগুলি উঠোনে এসে পড়ে। অনেক শুকনো মাটি। দিপু থাকলে সেই মাটি খেতে কোল থেকে নেমে যেত। দিপু যখন পেটে, মিতাও মাটি খেত খুব। রাতেরবেলা বিছানার মাথার কাছে রাখত। তার স্বামী, কী খাচ্ছে জিজ্ঞাসা করলে বলত না মিতা। হাসত, বলতে লজ্জা করত। তার স্বামী টের পেয়ে যেত ঠিক। তার স্বামীর তাকে বোঝার ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। কোনো কথায় সত্যি রাগ করলে বুঝতে পারত। কোনো কথার ছদ্ম

রাগ করলেও বুঝতে পারত। এবং কোন ভঙ্গিতে থাকলে, তাকে বুকে তুলে নেবে এটা জানত মিতা। মিতা ছিল তার কাছে ছিপছিপে পাখির মত।

জাভেদ মিয়াকে দেখতে তার স্বামীর মত। অদ্ভুত মিল। গলার স্বর দৃষ্টি আর মন পায় নি। কিন্তু লোকটাকে না দেখে থাকতে পারে নি। এখন লোকটা হাসপাতালে। মেডিকেল কলেজে। রক্তবমি করেছে। কিছুই ভাল লাগে না তার। টিফিন খেতে অরুচি। চুপচাপ বসে থাকতে পারছে না, তাই সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে সে ঘুরে বেড়ায়।

আজ চুলে বেণী করেনি। এলো চুল। চুলের গোড়ায় গার্ডার দেয়া। দুপুর এখন তপ্ত। হাওয়া কোথাও নেই। মেরুণ রঙের ব্লাউজ গায়ে। আটপৌরে ন্যাতানো কাজের শাড়িটা পরণে। কপালে ছোট বাজারি টিপ। কালো। এবং ছোটটা তার বেশি পছন্দ। দোকানে তাকে খুঁজে খুঁজে কিনতে হয়। এখন পাড়ার দোকানেও পাওয়া যায়। পায়ে জুতো। স্যান্ডেল। শেয়ালদার ফুট থেকে কেনা। এই শাড়ি ব্লাউজ জুতো সবকিছুই শেয়ালদার ফুটপাথ থেকে কেনা। ট্রেন ধরার আগে এসব কিনে থাকে। ট্রেনের টাইম টেবল তার মুখস্থ। তার ট্রেনে টিকিট লাগে না। টিকিট কোনোদিন কাটে নি সে। মান্থলি টিকিটও না। ছেলেরা মান্থলি টিকিট কাটে। ছেলেদের নিয়ে টিটিই-রা ঝামেলা করে। মেয়েদের টিকিট চায়, না থাকলে সহজে ছেড়ে দেয়।

চুলে জল ধরে রাখলে এক সময় একটা ভ্যাপসা গন্ধ হয়। এমন হাঁটতে হাঁটতে রোদে চুল শুকিয়ে যায়। চুলে প্রতিদিন তেল দেবারও ইচ্ছে থাকে না। চুল ফাঁপা ফোলা তার বেশ ভাল লাগে। মাঝে মাঝে চুলে সাবান দিলে আরো ভাল লাগে। বহুদিন কিনে রাখা একটা বসন্ত মালতীর শিশি একেবারে সকলের চোখের আড়ালে লুকিয়ে রাখে সে। কাজে বেরবার সময় টুক করে বাঁ হাতে একটু রেড়ে নিয়ে মুখে মেখে নেয়। গন্ধটা চলতে চলতে নিজেই পেয়ে থাকে। এবং সে জানে এসব কিছু বাদ দিয়েও তার গায়ের এক গন্ধ আছে। দেহের গন্ধ। নিজের দেহের গন্ধ নিজে পায় সে। নিজের দেহের গন্ধে নিজে মজে থাকে। চলতে ফিরতে। উঠতে বসতে। কথায়। সম্পর্কে।

কালী সোম স্ট্রিটের গলিটার মুখে এলে স্ল্যাবটা নড়ে ওঠে। দুলে ওঠে মিতার দেহ। দিপু পেটে তখন প্রথম প্রথম এমনটা হয়েছিল। তার মনটা এখনো সেই বাংলাদেশের প্রকৃতি ও স্মৃতিতে আছে। সে হাঁটছে এখন কলকাতায়। স্বপ্ন যখন দেখে তখন ওপারের দেশের স্বপ্নজগৎটা উঠে আসে। দেশ প্রকৃতি রাষ্ট্র উঠে আসে। মনের ভেতর ঝকঝকে হয়ে ধরা দেয় দেশটা। পর্নপ্লাবিত বনস্থালী, বীথি, দিগন্ত ভেসে যাওয়া মাঠ, দিগন্ত নমিত আকাশ। নদী নালা খাল বিল। কলকাতায় এসে পড়বে, কে জানত! এমন একটা গলির মধ্যে গলি, গলির মধ্যে। যেখানে আলো মরে আসে। যেখানে দুর্গন্ধ ভরা থাকে। ভ্যাপসা গন্ধ। অচলায়তন। অচলায়তন। শেয়ালদা স্টেশন,

ফ্লাইওভারটা বেশ বড়সড়। সেখানে জনসমুদ্র যানবাহন নেমে আসে।

এ সবের ভেতর সে চলে আসে। চলে আসে সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে। মালিক কারিগরদের কাছে। আরো দু-চারজন চেনা মানুষের কাছে। মতির কাছে। জাভেদের কাছে। জাভেদ এখন হাসপাতালে। মতি তার অপেক্ষায় উৎকর্ণ হয়ে আছে। মতির কাছ থেকে দূরে, বহুদূরে চলে যেতে চায়—আবার মতি যেন তার একটা মরণ, তাকে উপেক্ষা করতে পারে না। মতির কাছে যাবে না, এই সংকল্পে আরো সে নিরুদ্দেশ ঘুরে বেড়ায়। নিজেকে শক্ত করে তোলে। মতির মরণ চাইতে নেই। নরম বয়সের ছেলেটি। কিন্তু সে যদি না মতির কাছে যায়, মতিই ত তার পথ আটকাবে! তার সমস্ত গতি চুরমার করে দিয়ে যাবে। সমস্ত রুদ্ধতা মুখ থুবড়ে পড়বে।

হঠাৎ কোথায় ডুগডুগি বেজে উঠল। রাস্তায়। যেখানে পাটোয়ার বাগানে হোটেল, চায়ের দোকান, পানবিড়ির দোকান, ঠিক লাইটপোস্টের সামনে একজন লোক ডুগডুগি বাজাতে শুরু করে দিয়েছে। তার হাতে একটা বাঁদর। বাঁদর খেলা দেখাবার জন্যে লোক জড়ো করছে। টিফিনের সময় যে-যার বাইরে বেরিয়েছিল, কাছে পিঠে ছিল যারা, তারা মুহূর্তে জড়ো হয়ে যায়। সেখানে দাঁড়িয়ে যায় মিতা।

লোকটা ডুগডুগি বাজায় আর লোক জড়ো করে। তার হাতে ধরা একটা লাঠি, আর গলায় চেন দিয়ে বাঁধা একটা ছোটখাটো বাঁদর। সে সারাক্ষণই বাঁদরামি করে চলে। লাফায় ঝাঁপায়। জনতার মধ্যে এক হুল্লোড়, হাসির জোয়ার বয়ে যায়। বাঁদরওয়ালার ছেঁড়া জামা আর ছেঁড়া লুঙ্গি। বাঁদরের হাতে লাঠি দিয়ে ডুগডুগি বাজিয়ে খেলা শুরু করে দেয়। বাঁদরটা লাফায় ডিগবাজি খায়। লোকজন হৈ হৈ করে হেসে ওঠে। বাঁদর নমস্কার করে সকলকে। বাঁদরটা মাথায় লাঠি রেখে সোজা হয়ে হেঁটে শ্বশুরবাড়ি যায়। সকলে হো হো করে হেসে উঠছে। বাঁদর মাথায় টুপি দিয়ে হাঁটে। সকলে হো হো করে হাসে। বড়বাবু কেমন পায়ে পা তুলে চেয়ারে বসে, দেখায়। সকলে হাসিতে ফেটে পড়ে।

মিতার হাসি শুকিয়ে গেছে। সে হাসে, কেমন ম্লান। পেছনে চুলে একটু টান পায় মিতা। পেছন ফিরে দেখে কারিগর জলিল মিয়া তার চুল টানছিল। পেছন ফিরে উৎফুল্ল হাসিতে ভেঙে পড়ে সে। জলিলের পেটে খামচে নেয় জোরে। জলিলের জোর লেগেছে। জলিল বাঁ হাত দিয়ে মিতার হাত টেনে ধরে জনসমক্ষে। 'চল চা খাই।'

সামনে চায়ের দোকানটার বেঞ্চে বসে জুড়ে দুজনে।

জলিল বলল,—'মেয়ের বিয়ে দিচ্ছি।'

'এই বুড়ো! তোমার মেয়ের বিয়ের বয়স হয়েচে?'

'হ্যাঁ, শাড়ি-টাড়ি পরে।'

'এই বুড়ো, তোমার বয়স কত হল ?'

'পঁয়তিরিশ।'

'এই বুড়ো, এত কম—এত বুড়ো দেখায় কেন ?'

'ঝড়-ঝাপটায় এমন হয়ে গেছি।'

'বুড়ো বুঝি গাছ !'

'গাছ না, পাথর !' ঘাড় বেঁকিয়ে মিতার দিকে তাকিয়ে হাসে। 'তোমার খবর কি ? তোমাকে এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন ?'

'কই না ত !' হাসে মিতা।

'হাসছ যে !'

'হাসি পেল. তাই হাসছি।—বুড়ো, নাকি তোমার বউয়ের আবার বাচ্চা হবে ?'

দাঁতে জিভ কাটে জলিল। গা দোলায়।

দোকানদার চায়ের ভাঁড় এগিয়ে দেয়। জলিল মিতার চায়ের ভাঁড় বাড়িয়ে দেয়।

'দুঃখী দুঃখী লাগছে মিতা তোমাকে !'

'দুঃখী কি কেউ ইচ্ছে করে হয় ?'

জলিল চায়ে চুমুক দেয়—'কেন তোমার কী এমন হল ?'

'আমার কিছু হয়নি।' এই উচ্চারণ হালকা মিহি হয়ে যায়।

'শরীর খারাপ ?'

'এই বুড়ো, পেছনে লেগ না।' আবার খামচে নেয় জলিলকে মিতা।

'না, শরীর ত খারাপ হতেই পারে।'

'এই বুড়ো।' কাঁধে জোরে খামচে নেয় মিতা। তারপর থেমে গিয়ে চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে থেমে যায় মিতা। 'দেখবে বুড়ো, একদিন আমি কবে মরে গেছি খবর পাবে।'

'মরতে চাইলেই কি মরা যায় !'

জলিল এত সত্যি কথা বলে কি করে। জলিলের দিকে তাকিয়ে থাকে মিতা। তার আর কোনো কথা নেই। সে জলিলের দিকে তাকিয়েই থাকে। জলিলকে দেখছিল।

'সাড়ে বারোটা বাজল। আর আধ ঘণ্টা পরে টিফিনটাইম কেটে যাবে। একটু শুতে হবে।' জলিল একটু বিশ্রামের জন্যে অস্থির হয়ে ওঠে ভেতরে ভেতরে। মিতার চোখের সামনে।

'যাও না, তোমাকে ধরে রাখছে কে ?' মিতা সহজ স্বরে বলল।

'এই তোমার খোঁজে সেই বাচ্চাটা এসেছিল।'

'কে মতি ?'

'ঐ যে বুলিঙের সাগরেদ।'

'ও হ্যাঁ।'

'তুমি নাকি আজ টিফিন খাও নি!'

'খিদে পেলে ত খাব।'

'তোমরা পাখির মত খাও ত!'

'পাখির মতই ত। এই দেখ আমার চোখ দুটো পাখির মত নয়? আমি পাখিই।'

'তাই ত দেখছি।'

'এই বুড়ো, এত দেখার কী আছে?'

'না। দেখলে ক্ষয়ে যাবে?'

'তাই ত ভাবছি।'

'তা হলে দেখব না।'

'আহা!' জিভ ভ্যাংচায় মিতা।

জলিলও জিভ ভ্যাংচায়।

মিতা কিল মারতে থাকে জলিলের পিঠে।

জলিল মার খেতে খেতে উঠে পড়ে। লুঙ্গির ট্যাঁক থেকে পয়সা বের করে পয়সা মেটায়। গায়ের গেঞ্জিটা ময়লা ও ঘামে কুচ্ছিত হয়ে আছে। আট দশ-দিন না কাটা দাড়ি, খোঁচা খোঁচা। অদ্ভুত তাকায় জলিল।

মিতাও হাসে।

মিতা বসে থাকে। জলিল চলে যায়।

আর মিতা ভার হয়ে ওঠে সহসা। মতির কাছে তার যাওয়া চাই। মতি তাকে খুঁজছে। মতির কী হল? না, মতির কিছু হতে নেই। বড় নরম সুন্দর ছেলে। ওকে অন্যকিছু হতে নেই। মতিকে অস্থির হতে নেই। ও জীবনের কী জানে! ওকে ভাল থাকতে হবে। ওর পাপ থাকতে নেই। ওকে ওর স্বভাব থেকে ভেঙে যেতে নেই। মতির কাছে যাবার জন্যে তার অস্থিরতা থাকতে পারে, মতির থাকতে নেই। মতি আবেগপ্রবণ কাঁচা ছেলে। কিন্তু ও যে প্রান্তরে কাঁচা জ্যোৎস্নার মত। ওর সামনে দাঁড়ালে মরণের আকুলতা অনুভব করে মিতা। মরণ—ঠাণ্ডা মরণ। শীতল মরণ চায় সে। ইট পাথর গলি ঘুঁজি আলো ছায়া অন্ধকার পায়ে জড়িয়ে ধরে। সেই প্রান্তর নেই। সেই প্রকৃতি নেই। সেই উঠোন নেই। শুকনো মাটির ডেলা। কুকুর। নিমগাছ। নদী।

'কী হয়েছে তোর?'

মতি তার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত এলোমেলো হয়ে যায়।

'তুই আমার খোঁজ করছিলি?'

'তুমি এলে না যে!'

'বাঃ বাঃ তুই কাজ করবি, আর আমি এসে বাগড়া দেব!'

'বলে ছিলে ত আসবে।'

'তোর কী হয়েছে রে। তোকে এমন অস্থির দেখাচ্ছে কেন ?'

'আমার কিছু হয় নি যাও।' মতি পেছন ফেরে, রাগে।

'এই শোন !'

আবার মতি এগিয়ে আসে।

'তুই বাড়ি যাবি ত এই সপ্তাহে ?'

'যাব না।' মতির রাগত স্বর।

'বাড়ি যাবি।'

'তোমার কী তাতে !'

'রেগে গেছিস ?'

'তুমি আমার রাগ জান না।'

'এই ত দেখছি।'

'ভালয় ভালয় এখান থেকে চলে যাও।'

'আমি যাব না, তুই কী করবি ?'

'তোমার কিছু করব না, আমার ক্ষতি আমি নিজে করব।'

থমকে যায় মিতা।

মতি পেছন ফেরে। রাগে গর গর করে। মেশিনের ওপর থেকে একটা পাতলা ছুরি তুলে নেয়।

লক্ষ্মীদা মিতা কেঁপে ওঠে। ঘর থেকে বেরিয়ে আসে ঝটপট। আর কারিগরটা কাজ করে চলেছে মগ্ন হয়ে।

মিতা গলির মধ্যে নেমে এসে যেন খান খান হয়ে যায়। মতি। মতি তুমি এ কি করলে ! তুমি সব ভুলে যাও। কিন্তু একজন কাঁচা বয়সের ছেলের কিছু হলে তার কী যায় আসে। কিছুই যায় আসে না। ঘরে রাতের বিছানায় জেগে থেকে প্রায়-অন্ধ শ্বশুরের খক খক্ কাশির শব্দ শুনতে হয় শুধু। শ্যামল কখন ফেরে, তার শব্দ পাওয়া যায় না কখনো। কুকুরটা মাঝে মাঝে ছপ্ ছপ্ চলাফেরা করে। বাড়ির ছায়া উঠোনতলায় নেমে আসে। জোনাকি ওড়ে। জ্বলে নেভে। রাত বেড়ে যায়। ঘুম আসে না। আচ্ছন্নতার ভেতর থেকে এক সময় কখন ঘুমিয়ে পড়ে। অন্য দেশ অন্য রাষ্ট্রের পথঘাট ঘরবাড়ি গাছপালা নদীনালা মাঠ প্রান্তরের ভেতর স্বপ্ন দেখে। এক সময় ঘুম ভেঙে যায়। ডান হাত পেছনে বাড়িয়ে চিমনির শিখা বাড়ায়। বালিশের তলা থেকে ঘড়িটা বের করে চোখের সামনে ধরে। দুটো চল্লিশ। এ-রকমটা হয় প্রায়। তারপর আর ঘুম আসে না। এ-রকম করেই তাকে না ঘুমিয়ে বিছানায় পড়ে থাকতে হয়, সকাল পাঁচটা পর্যন্ত। তখন বাইরে আলো ফোটে। বাইরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে পাখিদের কলকাকলি সে শুনতে পায়। বেশ শোনায়।

আজ শনিবার। একদিনের ছুটিতে কারখানায় থাকা শ্রমিকরা গ্রামের বাড়িতে

যাবে। যে সব মালিকদের গ্রামে বাড়ি, তারাও যাবে। পেমেণ্টের দিন। আজ টিফিনের সময়ও মতির সঙ্গে দেখা করে নি। মতি আজ বাড়ি যেতে পারে। মতি কষ্ট পেতে পেতে বাড়ি যাবার মন করুক। সেজন্যেই মিতা মতির কাছে যায় নি। বিকেল হয়ে গেল, মতিও তার খোঁজ করে নি। মতির বড় রাগ। জাভেদ মিয়া কেমন আছে কে জানে! কী হবে জেনে? তবু ত জানতে ইচ্ছে করে। জাভেদ মিয়া তার আরো শূন্যতা বাড়ায়। বিষাদের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে। জাভেদ মিয়া না থাকলেও তাকে দেখার স্মৃতি থাকে। তার এই কারখানায় থাকার অবয়বকল্প থাকা থাকে। গলিতে হাঁটাচলা থাকে। নানা তার অবয়বকল্প হাতের মুদ্রা, শরীরের ভঙ্গি থাকে মিলে মিশে। গলিতে কারখানায়। জাভেদের জন্যে তার মন টাটায় অস্বীকার করবে কেন? তার মেয়ে তার বউ আর শিশু এই গলিরই আরো এক অভ্যন্তরে থাকে। কারিগর সেলাইকর ভাঁজাইকর সাগরেদ বয়রা তার ঘরে কাজ করে।

বলেজ স্ট্রিটে, ফুটে, ফলের দোকানগুলোর সামনে শনি পুজো হয়। এক মেয়ের ভর হয়। উপুড় হয়ে ফুটের রাস্তায় শুয়ে থাকে। রাতের বেলা ঘুম থেকে উঠে মানত করেছে, সেখানে আজ পুজো দেবে। জাভেদের জন্যে, আর মতির জন্যে।

গতকাল সে বিপত্তারিণীর পুজো দিতে গিয়েছিল কালীঘাটে। কাজে আসে নি। গঙ্গায় স্নান করেছে। মন্দির থেকে তের গিঁটের বিপত্তারিণীর ডোর পরেছে। কেউ কেউ সাত দিন রাখে। কেউ কেউ এই ডোর তের দিন রাখে। কেউ রাখে এক বছর। বিন্দুও তার সঙ্গে গিয়েছিল। বিন্দুর মা মল্লিকপুর থেকে এসেছিল। তিনজন সকাল সকাল বেরিয়ে কালীঘাটে পৌঁছে গিয়েছিল। গঙ্গায় ডুব দিয়েছিল বিন্দুও। মুহূর্তে দেহ শীতল হয়ে গিয়েছিল মিতার। মা গঙ্গা। শীতল জলে প্রাণ জুড়ায়।

কিন্তু তাপ আবার ফিরে আসে। আবার দেহের তাপে, দেহের গন্ধে সে মরে থাকে। শেয়ালদায় নেমে নিজেকে আবার ফিরে পায়। ফ্লাইওভারের বিশালতায় নিজেকে ফিরে পায়। জাভেদের মুখ ভেসে ওঠে। স্বামীর মুখ ভেসে ওঠে। বাংলাদেশের প্রকৃতি তার মধ্যে ভেসে ওঠে। মতির মুখ ভেসে ওঠে। কারখানার মালিক কর্মচারিদের মুখ ভেসে ওঠে। ভেসে ওঠে সমস্ত সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ড। গলিঘুঁজি। রাস্তা। কারখানা। সমস্ত মানুষজন। সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে পড়লে তেমনই শ্লথ শিকড়বিহীন হয়ে পড়ে। নিজের দেহের গন্ধে নিজে মরে থাকে। এত মানুষজন। এত মানুষের গন্ধ। সম্পর্কের মায়া। আঘাত প্রত্যাঘাত দোলা। সমস্ত কিছুর মধ্যে তার বিষাদ।

চোদ্দর তিনের গলির মুখটায় ছোট কারখানাতে দরজার সামনে গালে হাত দিয়ে বসে থাকে খদিজা বেগম। বিধুর ব্যথাতুর। বিচ্ছিন্ন। ঐখান দিয়ে গলিটার অন্ধকার শুরু হয়। গলিটার আরো অন্ধকার থাকে গভীরে। যেখানে

জাভেদের স্ত্রী পরিবার থাকে। স্থানীয় বসবাসের মানুষগুলো থাকে। যারা কেউ মেছুয়ায় ফল বেচে। ফল বেচে কলেজ স্ট্রিট, রাজাবাজারে, হাতিবাগান, শেয়ালদায়। কেউ রিক্সা চালায় মধ্য কলকাতায়। কলকাতার প্রেসগুলিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। গোল্ড প্রিন্ট, পাঞ্চিং, জুতোর বাক্স তৈরির ব্যবসা করে।

মজিদ মিয়া বিকেল চারটের সময় জামাপ্যাণ্ট পরে। কেনাকাটার ব্যাগ সাজায়। কর্মচারিরা কাজ করে। পাঁচটা পর্যন্ত কাজ করবে। মাচার ওপর কাজ করে মিতা সবিতা। ছুটির এক ঘণ্টা আগে কাজ চলে নিঃশব্দে। শেষের দিকে যাবার এক নিঃশব্দ আকুলতা। শনিবারে সকলের নিঃশব্দ কাজ করার সময়, ছুটির এক ঘণ্টা আগে মালিক সাজগোজ করে এমন। ব্যাগ ভরে, কেনাকাটা দিয়ে। নানান কেনাকাটা। সংসারের নানান টুকিটাকি। খুঁটিনাটি নানা কিছু। দুটো ব্যাগ ভরে নেয়। ইস্ত্রি করা প্যাণ্ট জামা পরে। নিখুঁত হাতা গোটায়। গলায় পাউডার দেয়। চিরুনি আয়না নিয়ে নিজস্ব স্বভাবে আঁচড়ায়। চুলে তেল চক চক করে। চিরুনির টানে একগুচ্ছ তেলেভেজা চুল ছিটকে এসে কপালে পড়ে। চিরুনির টানে আবার তুলে দেয়। মাচার পাটাতনের ফাঁকে হুমড়ি খেয়ে, চোখ রেখে প্রতি শনিবার দেখে মিতা-সবিতা। এই দেখাটা দুজনে পরামর্শ ক'রে করে। তখন কাজ ফেলে রেখেই দেখে। মালিক মজিদ কেমন সাজগোজ করে, সেটা দেখার মত, সেই দেখার লোভ প্রতি শনিবারই থাকে। পরস্পরে ঈর্ষাহীন দেখে। মজিদ পাউডার মাখে। চুল আঁচড়ায়। আয়নায় মুখটা দেখে। দাঁতগুলি মেলে দেখে। গোঁফে বাঁ হাতের আঙুল বুলিয়ে দেখে। নিজের মুখ নিজের হাতের আয়নায় রাখে। নানা রকম ভাবে দেখে। তারপর আয়নাটা দেয়ালের পেরেকে রেখে, ফিরে আসার সময় মুখটা আর-একবার দেখে।

কারখানায় কাজ করে সকলে অভ্যস্ত দেখার নৈর্ব্যক্তিকতায়। তারপর মজিদ দেয়ালের গায়ে এক কোনায় চলে গিয়ে ক্যাশবাক্স চাবি ঘুরিয়ে খোলে। এবং খোলার সময় পেছন ফিরে একবার দেখে নেয়। অন্য সময় কর্মচারিরা যদিও মালিকের গতিবিধির দিকে তাকাত, এখন আর তাকাবে না। শরীরটা আড়াল করে, টাকা আড়াল করে টাকা গোনে। একই টাকা দু-তিনবার গোনে। তার পর সে টাকা থেকে একটা ভাগ নিজের হিপ পকেটে ঢোকায়। বাকি টাকাটা নিয়ে আবার গোনে। ভাগ করতে থাকে গুনে গুনে। এক সময় সতর্কহীন টাকা গোনার মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। মালিক ছুটি হবার আধ ঘণ্টা আগে কারখানা থেকে বেরিয়ে যাবে। কারণ, নির্দিষ্ট একটা ট্রেন ধরবে। ট্রেন থেকে নেমে বাস। তারপর আবার নৌকো। নিজের গ্রামে গিয়ে তবে পেঁছিতে পারবে। কারখানায় মালিকের দূর আত্মীয় বিধবা মায়ের এক সন্তান থাকবে। তার বাড়ি যাওয়া বন্ধ থাকে দেড় দু মাস। নির্দয়ভাবে তাকে বাড়িতে যেতে দেয় না।

সে এখন সাগরেদ। ছুটির দিনে কারখানাতেই থাকে সে।

এবার মজিদ টাকার ভাগটা এনে কর্মচারিদের কাছে কাছে যায়, আর টাকা দেয়। যে-যার টাকা নেয়, আর গুনে নেয়। নিঃশব্দতায় এই কাজটা চলে। সেই সময় মাঝপথে থেমে গিয়ে মিতা সবিতা পাটাতনের ফাঁকে চোখ পাতা বন্ধ করে উঠে বসে। জামা ব্লাউজ পরে নেয়। এলোচুলে খোপা বাঁধে। গায়ের শাড়ি ঠিকঠাক করে নেয়। তারপর নিঃশব্দতায় কাজে বসে যায়। মালিক এক সময় তাদের মাচার কিনারে ডাকবে। হাত বাড়িয়ে টাকা দেবে। সেই অপেক্ষায় থাকে। কাজের ভেতর থেকে সেই অপেক্ষাটা কঠিন। মনে হবে যেন তাদের টাকা না দিয়ে মালিক যদি চলে যায়! ভুলে যায় যদি! এই আশঙ্কা থাকে, কিন্তু ভোলে না। সপ্তাহে পঞ্চাশ টাকা বিন্দুকে দিয়ে দিতে পারলে মিতা অনেকখানি হালকা হয়। তার একটা ফোমের ছোট্ট টাকা রাখার থলি আছে। সেটা কখনো তার বুকের ভেতর গুঁজে রাখে, কখনো সাইড ব্যাগের ভেতর ফেলে রাখে। দু-চার টাকা ওতে রাখতেই হয়। কারণ, মাঝে মাঝেই ট্রেনের গণ্ডগোল লেগে থাকে। তার ছিঁড়ে যায়, গাড়ি উল্টে যায়, কিংবা যাত্রী বিক্ষোভে ট্রেন চলাচল স্তব্ধ করে দেয়া হয়। তখন তাকে বাসে করে যেতে হয়। তখন বাসে গাদাগাদি ভিড় হয়। অসহ্য হয়ে ওঠে যাত্রাপথ, পথশ্রম। ক্লান্ত, বিশুষ্ক হয়ে ওঠে।

মাচার কিনারে টাকাসহ হাত নড়ে মজিদের। কোনো শব্দ করে না। সবিতা মিতা এটা দেখেও এগিয়ে যায় না। কারণ, তারা এমন ভান করে যে, তারা কাজের ভেতর ডুবে আছে, পাটাতনের কিনারে তাদের চোখ নেই। মালিকের স্বরের প্রত্যাশা থাকে। মালিক কয়েকবার টাকাসহ হাতটা নাড়াচাড়া করার পর শব্দ করে 'এই যে!' তারপরেই বলে 'এই যে দিদিরা'।

তারপর হামা দেয় দুজনে পাশাপাশি মাচার কিনারের দিকে। দু ভাগে ভাগ করা টাকা দুটো মালিকের হাত ছুঁয়ে-টুয়ে নেয় দুজনে। তারপর মাচায় হাঁটু চেপে, হাত চেপে মুখ ঝুলিয়ে দেয় নীচের দিকে। নিঃশব্দ হাসিমুখ দেখায় মালিকের দিকে। এই মুহূর্তে মালিককে মালিকত্ব-ব্যক্তিত্ব থেকে সরাতে পারে না। সকলকে পেমেণ্ট দেবার এটা পরের মুহূর্ত। তা ছাড়া বাড়ি যাবার এক মগ্নতা থাকে। এই সময় মালিক কোনোদিন হেসে, ঠাট্টা করে কথায় লুকোচুরি করে না। নির্দয় হয়ে ওঠে। মালিক এর পরেই বেরিয়ে যাবে। তার আর থাকাটা মুহূর্তমাত্র।

মালিক বেরিয়ে যায়। তারপরেই মিতা সবিতার প্রসন্ন আনন বদলে যায়। নিজেরা যেন সমস্ত পরাজয়ের মধ্যে ডুবে যায়। এইভাবে তারা আবার কাজে বসে যায়। নীরবতায় খানিকক্ষণ কাজ করে। তারপরেই মিতা কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়। সবিতাও হাত থেকে কাজ সরিয়ে দেয়। দুজনে দুজনের দিকে তাকায়।

নীচে কারিগর সাগরেদরা নানা কথাবার্তা বলা শুরু করে দিয়েছে। নানা হাসিঠাট্টা। বাক্‌চাতুরি। নীচের কথার দিকে যেন নির্মোহ এমন তারা নিজেরা কথাবার্তা শুরু করে দেয়। এবং অনুচ্চ কণ্ঠে। যাতে তাদের কথার ভেতর এক গোপনীয়তা আছে এটা মনে হবে। নিচু স্বরের কথা, এবং ফিসফিসিয়ে শ্বাসাঘাতে অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। টুকরো টুকরো শব্দ করে হেসে ওঠে তারা। নীচে কারখানার কারিগর সাগরেদদের স্তব্ধ করে দিতে পারে। তেমনই তারা কথাবার্তা ও হাসির মায়া তৈরি করে। এবং তারা হাসে, যেন গড়ায়। কথায় নানা সুর ছন্দ আবেগ ভাবাবেগ যোগ হয়। মাঝে মাঝে কথার স্বর উচ্চ হয়ে তার পরই নিচু খাদে নেমে যায়।

কাটিং মেশিনের ভেতর তাদের কথা হাসিগুলি যেন রেকর্ড হতে থাকে। বইয়ের ভেতরে পাতায় পাতায় ঢুকে যায়। ছোট কারখানার ভেতর নানা বস্তুতে ছোঁয়। খেলা করে। বাতাসের মত পাক খায়।

'এই দিদি, হাসলে আমার কী হয় জানিস ত, আর হাসাস না।' সবিতা মিনমিন স্বরে কথা বলে।

'তা হলে ছোটবাইরে ঘুরে আয় যা !'

'তোর ছোট দেওরকে তোর খুব পছন্দ ?'

'পছন্দই ত, অত পড়াশোনা করছে। দেখতেও বেশ ভাল।'

'আমি দেখেছি, কি এমন, গোঁজমুখো। যেন কথা জানে না। এত বয়স হল, বিয়ে না করে আছে, আহা বেচারিদের কি কষ্ট।'

'ডুবে ডুবে সব মিয়া জল খায়।'

'এব তোর ছোট দেওরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিবি ?'

'কেন রে ?'

'দিয়ে দ্যাখ না।'

'ও মাথা চেবাবে, সে গুড়ে বালি।'

'মাথা চেবাবার কি আছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের আলাপ থাকতে নেই ?'

'তবে, আমার দেওরের সঙ্গে ?'

'কি এমন দেওর রে।'

'যা আছে আছে। খারাপ হলে খারাপ, ভাল হলে ভাল, তোর তাতে কী ?'

'এই সেদিন না, ট্রেনে · ···'

'. '

' '

'.........'

'লেডিজ কামরায় উঠেছিস, তারপর এই ?'

'দিন দিন শেয়ালদা লাইনের ট্রেনের অবস্থা যা হচ্ছে না !'

'বিতিকিচ্ছিরি। কনুই খেয়ে মলুম।'

'এই !'

'এক্কেরে কচি খুকি !'

'মনা !'

'এই মনা, মনা রে !'

'এই মনা।'

'মনা রে।'

'জল আসছে কাপড় তোল লো ’

‘ লো তুই কেনে মোর ·· ’

'জলিল মিয়ার মেয়ের বিয়া।'

'জলিল মিয়ার বউয়ের ছেলা অইব।'

'বুড়ো ভাম, চুল পাকায়ে ফেলল।'

'ঝড় ঝাপটায়।'

'বুড়ো শালিখ।'

তারপর আরো ফিস্ ফিস্। শ শ। গলাগলি হয়ে বসে। নরম গলায়, অথচ বুক-কাঁপানো হাসিতে ফেটে পড়ে। মিতা গান গেয়ে ওঠে—'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি !'

'শনিবার দিন বেলা দশটার সময় · ' সুর করে ওরা গান গায়।

'আমি যাব না, যাব না রসের মেলাতে' ··

তারপর দুজনে পা মেলে চুল আঁচড়াতে বসে। গান আর কথা থেমে যায়।

নীচে থেকে জলিল মিয়া হাঁকে—'খুব রস হয়েছে যে।'

মিতা—'এই বুড়ো, রসের কী দেখলে শুনি ?'

'নীচে ভাঁড় বাঁধব ভাবছিলাম।'

সবিতা—'ফুটিয়ে গুড় বানাতে ?'

'তখন থেকে হাসি আর থামে না !'

সবিতা—'আমাদের কথায় আড়ি পাতো কেন বুড়ো ?'

'আড়ি পাততে হয় না।'

'না শুনলেই পার।'

'তোমরা কত মজার মজার কথা বল, না শুনে পারি !'

ওপরে দুজনেই হেসে ওঠে।

এই হাসির ভেতরেই কারখানার লোকজন সব বেরিয়ে যায়। মালিক নেই ত, আলগা হয়ে পড়েছিল কাজকর্ম। এমনিতেই আজ শনিবার। কারো কারো বাড়ি যাবার তাড়া আছে। শুধু সাগরেদটা থাকে, আর সবাই মুহূর্তের মধ্যে বেরিয়ে যায়। কোনো সহৃদয়তা নেই যেন ওদের। মিতা সবিতার কথা বলার আনন্দ ফুরিয়ে যায়। চটপট চুলে গার্ডার বেঁধে নেমে আসে মই বেয়ে

নীচে। এবং নিরবচ্ছিন্ন নীরবতায়। যেন একটু আগে তারা হাসে নি। আনন্দপ্লাবিত কথাবার্তা বলে নি। ঘরে সাগরেদ ছাড়া কেউ নেই। কাটিং মেশিনের আড়ালে তাই তারা আর যায় না। মেঝেতে শীতলপাটির ওপর শাড়ি বদলায়। মনমত পরা হচ্ছে কিনা ফিরে ফিরে দেখে। কুঁচ ফেলে। শাড়ি পরতে সুন্দর সেজে ওঠে তারা। তখন তারা মালিকের আয়নায় ভাগাভাগি, কাড়াকাড়ি করে নিজেদের মুখ দেখে। ফুরফুরে প্রজাপতির মত দেখায় তাদের। মাড় দিয়ে ফাঁপানো ফোলানো ছাপা শাড়ি। আয়নায় নিজেদের দেখাটা একবার-দুবারে শেষ হয়ে যায় না। কাড়াকাড়ি করে এ একবার দেখে, ও একবার দেখে। এই আয়নায় নিজেদের দেখার একটা দৃশ্য তৈরি করে তারা। এই দৃশ্যের নিজস্ব গতিময়তা আছে। যা কিনা বিলম্বিত লয়ে দৃশ্যটা গড়ে ওঠে। আয়নায় নিজেদের মুখ দেখার আকুলতায় মুখটা ভেঙে পড়ে। নরম গ্রীবা হাঁসের মত বেঁকে যায়। সপত্নী সম্পর্কের মত তারা ঘরে চলাফেরা করে এক সহজ ঐক্যে।

বাইরের আলো তখন পাতলা হয়ে আছে। ছায়া হয়ে ওঠে। সময় যেন যামিনীর অন্তর্গত। সমস্ত কিছুর একটা যামিনী আছে। অন্ধকার আছে।

বাবোর চারের গলিতে এসে হতচকিত হয়ে পড়ে মিতা। গলির ভেতরের অভ্যন্তর থেকে কান্না উঠে আসছে। জাভেদের স্ত্রী পরিবারের কান্না। গলির দেয়ালে হাত রেখে টাল সামলায় মিতা। জাভেদের কারখানার ঝাঁপ বন্ধ। কান্নাটা যেন গলির বুকের ভেতর থেকে উঠে আসছে। তার গোপন হৃদয় থেকে। সমস্ত দেহের বিন্দুতে বিন্দুতে ছেয়ে যায় কান্নার সেই অনুভব। এমনি করে গলির দেয়ালে হাত দিয়ে দিয়ে থাকে সে। নিঃশব্দ হয়ে পড়ে। যা কিছু শনৈ শনৈ বাতাস ঝড়ের আগের মুহূর্তের মত নীরবতা, নিঃশব্দতা। পাতাল যেন গুমরে ওঠে। সংলগ্ন গলি ও কারখানায় কান পাতলে যেন এর অনুভূতি পরিব্যাপ্ততায় ধরা পড়বে। তেমনি বারোর চারের গলির মধ্যে পড়ে মিতা নিঃশব্দ হয়ে পড়ে। তার নিঃশব্দতার যেন শেষ হতে নেই। জাভেদ মিয়া মরে গেছে। কেন মরে গেল লোকটা? সে ত শুধু জাভেদকে প্রতিদিন এক দুবার দেখতে চেয়েছিল, পথের ধারে গাছ বা পাথরের মূর্তির মত দেখায়। আর কিছু চেয়েছিল না। তা হলে মৃত্যুর কী দরকার ছিল জাভেদের?

এমনিতে হালকা পায়ে চলায় গলির মাটি কাঁপে, দেয়াল কম্পন তোলে। আলগা মাটি, আর অশক্ত দেয়াল। তার ভেতর এই কান্না কাঁপিয়ে তোলে সমস্ত কিছুকে। শেয়ালদা স্টেশনের মাথার সিঁথেনের কাছে এই গলিটা, এই পাড়াটা। ফ্লাইওভার যেখান দিয়ে উঠে গিয়ে চিলের মত মেলে দিয়েছে নিজেকে। প্রাচী সিনেমা নীলরতন হাসপাতালের কাছে গিয়ে ফ্লাইওভারটা মিশেছে। এ দিকে মহাত্মা গান্ধি রোডে মিশেছে। এ দিকে জগৎ সিনেমা, প্রতাপ মঞ্চ,

কাউন্সিলারের বাড়ি. ট্রামডিপো। ওদিকে সেন্ট্ পলস্ কলেজ, মাড়োয়ারি হাসপাতাল, আমহার্স্ট স্ট্রিট। এসবের ভেতর এই পাড়া, কিন্তু কোনো সংলগ্নতা নেই অন্য পাড়ার সঙ্গে। ঘোর অস্থানিক। গলিটার ভেতরে অভুক্ত মৃত্যু জব জর কুকুরটা শুয়ে থাকে বিনা অভিমানে, অনধিকারে নিঃশব্দ হয়ে।

বিষাদ। তীব্র বিষাদ। এলোমেলো ডালপালা যেন ছড়ানো ছিটানো আকীর্ণ ঘিঞ্জি জীবনের জট। কুসুমের গন্ধ নেই। শুধু দেহ। দেহের গন্ধ। রক্তঘাম অশ্রু। ক্ষুব্ধতা নেই। উল্লাস নেই। ছোট শিখার মত জ্বলে। মাতলামি নেই। মদ নেই। দিন দিন নিরন্তর খাদ্য গ্রহণের শ্রম। কোনো শৌর্য নেই। ইতিহাস নেই। শুধু শ্রম। দিনযাপনের সীমাবদ্ধতা আরো সংকীর্ণ হয়ে আসে। আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন-কল্পনা নগণ্যতায় ভরে থাকে। স্বপ্ন ত জীবনের আয়ত্তাধীন। জীবনটা কখনো আসল স্বপ্নের কাছে পৌঁছয় না। দেহ আছে। কাম আছে। দেহগত কামনার স্বপ্ন নেই। একটা ঘর বা বাসস্থান, ঘর বাসস্থান না। অথচ সেটাই ঘর বাসস্থান। সেই ঘরের উঠোন উঠোন নয়। অথচ উঠোন। মাছ মাংস খাদ্য নয়, শখ করে খাওয়া। ডাল ভাত, সবজি খাদ্য। শুধু এইটুকু সংগ্রহের জন্যে শ্রমে থাকার, মৃত্যুর চেয়ে পাথর বওয়ার মত এক ব্রত। তেমনটাই এখানকার জীবন। এখানের ছড়ানো বিষাদ অন্য কথা। নৃতাত্ত্বিক গবেষণার বিষয়। নিরুচ্চার প্রতিবাদ ক্ষুব্ধতাহীনের মানে এক হতে পারে প্রেমে থাকার মগ্নতা। কিন্তু প্রেমের ভেতর ক্ষুব্ধতা গ্লানি প্রত্যাখ্যান অনৈক্য বিরোধ থাকে। তা হলে প্রেমে থাকাও নয়। বিষাদে থাকা। বিষাদের কোনো উচ্চারণ থাকে না। দেহে ও ভঙ্গিতে, চলাফেরা, ওঠা-বসা, মুদ্রায় স্বভাবে ফলিত হয়। সারা দেহই মেখে থাকে। সেজন্যেই তার আলাদা প্রকাশ থাকে না। শরীরটাই তার প্রকাশ হয়। প্রকাশ হয় তার হাঁটাচলা, ওঠাবসা, মুদ্রায়, নানা ভঙ্গিমায়। পাড়াটাই যেন এক চরিত্র হয়ে যায়। একক সত্তায় সন্নিবেশিত হয়ে থাকে কলকাতার হৃদয়ে প্রহরে প্রহরে আলোছায়া তার নানা রঙে এসে মেশে। এবং বস্তুর ভেতরেই আলো তার রঙকে বিমিশ্র করে। বস্তুর নিজস্বতার ভেতর আলো রঙ পায়। আর বস্তুর গড়নের প্রতিবিম্ব নিজস্ব ছায়া তৈরি করে। বস্তুর অবয়বের ভেতর থাকে আলোর প্রতিক্রিয়ালব্ধ ছায়া। আলোছায়াও এখানে বিষাদের সহায়ক হয়ে উঠতে পারে। গলির আর দেয়ালের গ্রহণের যোগ্যতা ও ছায়ার প্রতিক্রিয়া সেই ভাবেই ঘটে। ছোট ছোট কারখানাগুলি যে স্বভাবে চলে যায়। অবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাইই আসলে এক সংলগ্নতা। তারই ভেতর এক ঐক্য-স্বভাব খুঁজে পাওয়া যায়। কুকুরও শান্ত নিরীহ হয়ে ওঠে। তারও বিষাদ আছে। কুকুরটাও ত কলকাতার কোনো সম্ভ্রান্ত সচ্ছল পাড়ায় চলে যেতে পারত, যেখানে প্রতিদিন ডাস্টবিনে প্রচুর খাবার ফেলে দেয়া হয়। কারণ তারও এক অভ্যাস ও গণ্ডির অন্ধকার আছে।

এখানে যে পুরুষটি চোদ্দ টাকা দৈনিক মজুরি পায়, আর-যে-কোনো শ্রমে

পঁচিশ টাকা রোজ পেত। সে যায় না। সে আসলে তার বৃত্তের মধ্যে সমর্পিত। এখানে সে যেন স্ক্রুর মত এঁটে থাকে। এটা কি স্বেচ্ছা-বিষাদ? আসলে বিষাদের বৃত্ত ত থাকে। তা হলে কারা থাকে সে বৃত্তে? তাদেরই চিহ্নিতকরণ। এই বৃত্তের বাইরে কেউ নয়। এই বৃত্তের অস্থানিকতার বাইরে আর যে যে এই স্বভাবের বৃত্ত আছে আসলে সে-সব এক। এ বৃত্ত সে বৃত্তেরই সগোত্র। কলকাতার ভেতরে ভেতরে কত এমন বৃত্ত আছে। তার নিজস্ব আলোছায়া। তার নিজস্ব সীমাবদ্ধতার জীবন। ক্রোধহীন, নীরবতায় থাকে। স্বপ্নগুলো স্বপ্ন নয়।

মিতার বিষাদের হাত গলির দেয়াল স্পর্শ পায়। জাভেদের মৃত্যুর কান্না গলির বুক ভরে আছে। কালী সোম স্ট্রিটের গলির মুখের স্ল্যাবটা কারো পায়ের চাপে নড়ে যেতে তার বাধা নেই। মিতার অশ্রু নেই। অশ্রুর সম্পর্ক ছিল না জাভেদের সঙ্গে। শুধু দেখা। দেখার মায়ার ভেতর সীমাবদ্ধতা ছিল। এই দেখার আনন্দটা তার হারিয়ে যায়। স্বামীর স্মৃতির মত স্মৃতি হয়ে যায়। এই স্মৃতি ও সত্য তার জীবনের বাধা। সমাজ-সংস্কারের বাধা। ধর্মের বাধা। স্মৃতির ভূমি ভূখণ্ডের রাষ্ট্রের বাধা। তাই তার কোনো উপায় থাকে না বলে বিষাদ দীর্ঘায়িত তীব্র হয়। এই বন্ধতার সে একজন। কুসুমের গন্ধ নেই। কি ভেবে জাভেদের কারখানার সামনে যায় মিতা। এতে তার আনুষ্ঠানিকতার ধর্ম প্রকাশ পায়। দরজা বন্ধ। কারখানার ভেতর জাভেদের নানা অবয়বকল্প স্মৃতি হয়ে গেছে। তেমনি বাংলাদেশ তার কাছে এমন বন্ধ হয়ে গেছে। যার প্রকৃতিতে স্বামীর স্মৃতি আছে। অন্য দেশ, অন্য রাষ্ট্র।

জাভেদের স্ত্রী পরিবারের কান্না। সংগীতের মত শোনায়। দুলে দুলে ওঠে মিতার স্মৃতি। স্তম্ভের মত সব স্মৃতি। প্রাকার গম্বুজ খিলানের মত তাকে ঘিরে রাখে। প্রকৃতি, প্রান্তর, নদী, শ্মশান। সে ঘর হয়তো ভেঙে গেছে। সে উঠোন হয়তো নেই। সেই প্রকৃতি হয়তো অপরিবর্তিত। নদীতে জোয়ার-ভাঁটার সময় তেমনই নিয়মিত, তেমনি ঋতুর নিয়ম, আবর্তনের অয়ন। নদীর জলের শীতলতা, বাতাসের শীতলতা। কোথাও কুসুমের গন্ধ। গাছে গাছে দোলা। বাতাসে বাতাসে মুখরতা। সমস্ত সংগীতই প্রকৃতি।

'মতি কোথায়? নেই?'

লক্ষ্মী সাহার ঘরে আজ ওভারটাইম। লক্ষ্মী সাহা কাগজ লাগাচ্ছিল, কারিগরটা স্টপ টানছিল। লক্ষ্মী সাহার হাত থেমে যেতে, কারিগরটার হ্যাণ্ডেলের হাত থেমে যায়। দুজনেই মিতার দিকে তাকায়। 'ও ত দুদিন ছুটি নিয়েছে। প্যাণ্ট শার্ট পরে, ফুল বাবুটি হয়ে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'কেন, কাজ করে না কেন?'

'কি রোয়াব, ছুটি না দিলে কাজ ছেড়ে দেব। এই দ্যাখ, এত কাজ পড়ে আছে, ওভারটাইম দিয়ে টানতে হবে।'

'বাড়ি গেল না ?'

'বাড়িও তগেল না। শুধু মুধু ছুটি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ?'

'কি করে বলব ?'

'রাতে কারখানায় থাকে ?'

'তা থাকে। বেশি ব্যাগড়বাই করলে বাদ দিয়ে দেব।'

'ওর বন্ধুবান্ধব নেই ?'

'ওর বন্ধুবান্ধব !'

'বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে ?'

'না, না, তারা ত কাজ করছে খবর পেলাম। একাই ঘুরছে। কলকাতার কতটুকু জানে, ও ত চ্যাংড়া ছোঁড়া।'

লক্ষ্মী সাহার কারখানায় আর দাঁড়ায় না মিতা। মতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মনে মনে। ওর আর কিছু ভাল লাগছে না। মতিকে কাছে পাবার জন্যে ছটফট করে ওঠে সহসা মিতা। এই মুহূর্তেই মতিকে কাছে পেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু ও কোথায় ? ওকে খুঁজে পাবে কীভাবে ? এই শহর কলকাতায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ? দেহ কাঁদে। মন কাঁদে। মতির কী হল ? নীরবতায় সমস্ত কিছুই কাঁদে। অধীর আকুলতা তাকে বিচলিত করে। অন্য অন্য কারখানার দরজায় দরজায় মুখ বাড়ায়। নেই। গলির ভেতর ঢুকে যায়। আরো গলির ভেতর শ্লথ শিকড়বিহীন হাঁটে। মতি নেই। মতির একি সর্বনাশ করল ? মতি এ সর্বনাশের কেউ ছিল না। মতির বয়সের ধর্ম, যৌবন এই সর্বনাশের অন্তর্গত হয়ে পড়েছিল। তাকে স্বীকার করে, মতির মনকে অস্বীকার করেছিল। দেহ মন যে একই পরিপূরকতায়, এটাকে কেন অবহেলা করল মিতা ?

এমন দুঃসময়ে মতির কাছেই সে যেতে চাইত, সেই অবলম্বনটাকে সে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। জাভেদ মারা গেছে। স্বামীর স্মৃতি আকীর্ণ হয়ে আসছে। মতি এই সময় তার অবলম্বন। কোথায় পাবে মতিকে ? কারখানায়, কারখানায় ? কোথাও নেই।

কলেজ স্ট্রিটে শনি পুজো দেবে বলে, ভোরবেলা মানত করেছিল। যখন সবাই ঘুমিয়ে ছিল। সে জেগে জেগে মানত করেছিল শনি পুজোর। জাভেদের জন্যে মতির জন্যে পুজো দিতে চেয়েছিল। ওদের দুজনেরই মঙ্গল চেয়েছে। জাভেদ এখন নেই। কিন্তু মানতটা, মানতই। তার নড়চড় হতে নেই। গতকাল কালীঘাটের গঙ্গায় ডুবে ডুবে শীতল হয়েছিল। বিপত্তারিণীর লাল ডোর বাঁ হাতে তাগা কবে পরেছে। তের গিঁটের ডোর। এক বছর হাতে ধারণ করবে। তার পরের বছর আবার পরবে। তার মানে আজীবন ধারণ করবে।

কাল রবিবার বিন্দু ও বিন্দুর মাকে নিয়ে লেকটাউনে যাবার ইচ্ছে ছিল। বালক ব্রহ্মচারীর কাছে দীক্ষা নিতে। রবিবার লেকটাউনে পাওয়া যায় বালক ব্রহ্মচারীকে। এ কথা তাকে অনেকেই বলেছে। মনে শান্তি পাবে। তারও যাবার ইচ্ছে জেগেছিল।

মতি কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে? কোথায় খুঁজবে? কলেজ স্ট্রিটে তাকে পুজো দিতে যেতে হবে অথচ। সে ত মতির জন্যেই মানত। জাভেদের পরলোক নিষ্কণ্টক শান্তিপূর্ণতার আকাঙ্ক্ষায় মানত। নিজের জন্যেও মানত।

তেমনি শিরদাঁড়াবিহীন শ্লথ হাঁটে মিতা।

কার্তিক বোস স্ট্রিট পেরিয়ে আমহার্স্ট স্ট্রিটে পড়ে মিতা। গাড়ি চলাচলের জন্যে তাকে অল্পক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। তারপর রাস্তা পার হয়। মন্দিরটার পাশ দিয়ে যে গলিটা ঢুকে গেছে, সেটায় ঢুকে পড়ে সে। মহাত্মা গান্ধী রোড ধরে সে যেতে পারত, কিন্তু সে নিজস্ব গতির টানে হেঁটে যায়। সম্মুখের পথ তার কাছে সমান মনে হয়। হাঁটতে থাকে। বুক থেকে আঁচল স্খলিত হয়। আবার তাকে গায়ে চড়ায়। চলতে চলতে এক সময় সে থেমে যায়। দেখল, গলিটা অন্ধ। তার সামনে আর কোনো পথ নেই। কিছুক্ষণ থেমে, আবার সে পেছন হাঁটে। মন্থর হাঁটতে থাকে।

একটা নার্সিং হোমের পাশ দিয়ে বেরিয়ে আসে বড় রাস্তায়। মহাত্মা গান্ধি রোডে। পেছন ফিরে দেখে কাছেই আমহার্স্ট স্ট্রিট ক্রশিং। এতটা পথ হেঁটে বেশি দূর এগয় নি সে। ঘেমে নেয়ে যায়। কপালে ঘাম, ঠোঁটের ওপর ঘাম। তার বিশ্বাস তার জীবনে শনিই তার এই দশা করছে। রাহু নয়। রাহু হলে ত সে কবে মরে যেত। 'শনিতে নাড়ে চাড়ে। রাহুতে পরাণে মারে।'

পাশ দিয়ে ট্রাম ঘরর ঘরর যায়। বাস লরি ট্যাক্সি রিকশা মোটর-সাইকেল স্কুটার যায়। শেয়ালদার দিকে মানুষের স্রোত হেঁটে যাচ্ছে। দূরে থেকে দেখা যায় সাবানের বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং। মেয়ের ছবি। সাবানের ফেনা মেয়ে ও সাবান। সংকীর্ণ ফুটপাথ মানুষের ভিড়ে। মানুষের ব্যস্ততা ও সাড়ায় তরঙ্গায়িত কলেজ স্ট্রিট মোড়। আলোকিত সুদৃশ্য দোকান পসারি। চারটি রাস্তার সংগম-স্থল। ওপরে ট্রামের তার হিজিবিজি হয়ে আছে। নানারকম গাড়ি। নানা তার গড়ন, রঙ। এখানে এসে দাঁড়িয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মিতা। একটু হালকা বোধ হয়। এইসব এত কিছু মনের ঘোরতর বোধটাকে একটু হালকা করে। আর একবার দীর্ঘশ্বাস পড়ে। হালকা হয়। কিন্তু হাহাকার করে ওঠে মতির জন্যে, মনটা।

কলেজ স্ট্রিট মোড়ে শনি পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। ফুটপাথের ওপর। মার্কেটের ভেতর ঢুকে পড়ে মিতা। অপরাজিত ফুল কেনে। নীল-কণ্ঠ ফুল। এই ফুল, এই রঙের ফুল না হলে শনি সন্তুষ্ট হয় না। ময়দা বা আটার শিন্নি সে দিতে পারবে না। বাতাসা কেনে। বাইরে এসে ফুট-

পাথে পাঁচ ফল কেনে। পাঁচ রকম ফল দিতে হয়। এতেই তার কুড়ি টাকা খরচ হয়ে যায়। সপ্তাহের রোজগারের এক-তৃতীয়াংশ খরচ হয়ে যায়। প্রণামীর জন্যে দু-টাকা রাখে।

পুজোর কাছে আসে। ভর হয়ে শুয়ে পড়ে আছে স্যাঁতসেতে মেঝেয় ফুটপাথে মোটি। আকুলতা আসে মিতার মনে। পুজোর দেবতার কাছে তার আত্মনিবেদন। সামনে তাকাতে দেখল মতি অনতিদূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। ও কবে আবার সিগারেট খেতে শিখল? এখানে চলে এসেছে। প্রেস। সিনেমা হলের সামনে। টিকিট কাউণ্টারের সামনে লাইন দিয়েছে। আর সিগারেট টানছে। মিতা মতিকে দেখেছে, মতি মিতাকে দেখে নি। বোতামখোলা জামা। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ায় গলার লকেটটা তার দুলছে। নতুন জামা-প্যাণ্ট পরে আছে।

পুজোটা দিয়ে দে। মিতা।

লেগে আছে মতির ওপর। কিন্তু মতির কাছে যাবার অপেক্ষা তার সয় না। সামনের ফুটপাথের রাস্তাটা মানুষের অবিরত চলাচলে মনে হয় কত বাধা। বাধা পেয়ে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে মতির কাছে এক নিশ্বাসে গিয়ে দাঁড়ায়। হাত ধরে ঝটকা মারে, রাগে অভিমানে। মিতার দিকে ঝুঁকে পড়ে মতি। মতি ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নেয় প্রচণ্ড ক্রোধে। মতির এত ক্রোধ নীরব থাকে?

'এই মতি, তুই কোথায় ছিলি? তোকে খুঁজে খুঁজে হয়রান। তুই আমাকে কষ্ট দিবি এত?' মতির সামনে কেঁদে ফেলে মিতা। এবং আঁচল তুলে চোখ মোছে। মুহূর্তে ঠিক ঠাক হয়ে নেয়।

'তুমি এসেছ কেন আমার কাছে?' মতির রাগ যেন চণ্ডাল। থামে না।

'তুই আমার ওপর এত রাগ করেছিস কেন মতি।'

মতি চুপ করে থাকে।

'তুই বাড়ি যাবি না?'

মতি অপলক তাকিয়ে থাকে মিতার দিকে।

'তুই একা সিনেমা দেখতে এলি, আমার কি সিনেমা দেখতে ইচ্ছে করে না?'

মতি তাকিয়ে থাকে। নিরুত্তর।

'তোর সঙ্গে আমিও সিনেমা দেখব।'

আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হতে থাকে মতি। তার চোখে মুখে সেই স্বাভাবিকতার রঙ ফিরে আসে।

'কিরে হাঁ করে দেখছিস কি? তোর দিদি কি চিড়িয়াখানার বাঘ না ভালুক!'

'তুমি আমার কাছে এসেছিলে না কেন আজ দুপুরে? আজ ছুটিতে থেকে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।'

'এই বোকা, আমার কাজ থাকলে, তোর কাছে যাব কি করে?'

'মিথ্যে কথা।' মতির পুরুষের মত কণ্ঠস্বর। 'তুমি আজ এ গলি ও গলি ঘুরলে, আমি পেছু পেছু গিয়ে দেখেছি।'

'আমি ত তোকেই খুঁজছিলাম।'

'না, তুমি লক্ষ্মী সাহার ঘরে আসনি।'

'আমার কি মনে হল, তুই লক্ষ্মী সাহার কারখানায় নেই। বাঁধাইখানার অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিস—এই ভেবে তোকে খুঁজছিলাম।'

মতির সারল্য অসীম। বিশ্বাস করে নেয়।

'এবার রাগ পড়েছে?'

হেসে ফেলে মতি।

'এনে টিকিট কেটে নে।' মতির হাতে একটা পাঁচ টাকার নোট গুঁজে দেয় মিতা।

মতি সঙ্গে সঙ্গে সেটা ফেরত দিতে যায়।

'টাকাটা না নিলে কিন্তু তুই আমার মরা মুখ দেখবি।'

এখানে হেরে যায় মতি। টাকাটা নিয়ে আবার টিকিটের কাউণ্টারে লাইন দেয়।

রাস্তার আলোগুলি সব জ্বলে উঠেছে। কলেজ স্ট্রিট মুখরিত আলোয় আলোয়। দোকানগুলি আরো ঝলমলিয়ে উঠেছে আলোর স্রোতে। ফুটপাথে ক্যাসেটে হিন্দি সিনেমার গান বাজে ঝমাঝম। মানুষের চলাচল ব্যস্ততা আরো বাড়তে থাকে। বাড়তে থাকে, কেনাবেচা হাঁকাহাঁকির স্বর। পথ-চলতি সংলাপের আন্তরিকতা সংলগ্ন হয়। বহু স্বরগ্রামে বহু কথা ছড়িয়ে বেড়ায়। মানুষ যেতে যেতে বাধা পায়। হাঁটা কারো এলিয়ে পড়ে। ট্রাফিক পুলিসের হাত তোলার ভঙ্গিমা। বাসের কনডাকটারের চিৎকার। ঘণ্টির শব্দ। গাড়ি ঘোড়ার নানা গর্জন। তেল মবিলের গন্ধ।

এত কিছু আছে মিতার স্বামী নেই। জাভেদও স্মৃতি হয়ে গেল। সেই দেশ নেই। সেই দেশের প্রকৃতি নেই। পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে এক প্রলম্বিত বিষাদ। সে ঢুকে পড়বে একটা অন্ধকারে, মতির সঙ্গে সিনেমায়। তা ছাড়া তার উপায় নেই।

মতি টিকিট নিয়ে এগিয়ে আসে তার দিকে। ফুটপাথের পুরনোকালের লোহার বিমটায় বাঁ-হাত ঠেশিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল মিতা। মতি তার কাছে এসে দাঁড়াতে, মিতা সহাস্যে তার হাত ধরে বলে, 'কিছু খাবি না মনা?'

'চল চা সিঙাড়া খাই।'

'আজকে আমার সব খরচ।'

'না আমি এটা দেব।'

'ভেট। তোদের গ্রামে নিয়ে যাবি?'

'হ্যাঁ। কবে যাবে?'

'তোর মাকে গিয়ে বলব পয়সা উড়িয়ে দিস ?'

'বয়েই গেল। মা জানে। দাদার পয়সায় সংসার চলে।'

ওরা মার্কেটের ভেতর ঢুকে পড়ে। বসন্ত কেবিনে উঠে পড়ে। ওরা ঢুকতেই বয়টা একটা কেবিনের ওপর ফ্যানটা চালিয়ে দেয়। যেন নির্দেশ মেনেই তারা কেবিনটায় দুজন ঢুকে পড়ে। এবং ওরা মুখোমুখি বসে। মিতা বলল,—'বেশ ত তোকে দেখাচ্ছে রে, এই তোর নতুন জামা, নতুন প্যাণ্ট ?'

মতি মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানায়।

বয় এল। চা সিঙাড়া দিতে বলল ওরা।

মতি বলল—'তুমি সিনেমা দেখতে এসেছিলে ?'

'না, তোকে খুঁজতে। আশপাশের সব সিনেমা হল খুঁজে, তবে এখানে পেলাম তোকে।'

'পূরবীতে গিয়েছিলে ? অরুণাতে গিয়েছিলে ?'

'হ্যাঁ। হ্যাঁ।'

'প্রাচীতে যাব না তুমি জান। দেখা বই।'

'যাই নি ত।'

'জগৎ, বীণায় গিয়েছিলে ?'

'দুটোতেই গিয়েছি। বাবুর রাগ ভাঙাতে এত ছুটোছুটি।'

মতি হাসে।

'এই, জানিস ত, সেই লোকটা, জাভেদ মিয়া মারা গেছে ?'

'সেকি ?'

'তোকে বলছি কি! তুই থাকলে তোকে নিয়ে জাভেদ মিয়ার ঘরে গিয়ে একবারটি দেখে আসতাম।'

'মরা মানুষ আমি একেবারে দেখতে পারি নি। বমি লাগে। মাথা ঘুরে যায়।'

'এই কটা বাজে রে ?'

'তোমার হাতেই ত ঘড়ি।'

মিতা টেবিলের ওপর তার বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দেয় মতির দিকে। মতি মিতার হাতটা দু হাতে ধরে ঘড়ি দেখে। 'পৌনে ছটা বাজে।'

'তুই ঘড়ি দেখতে পারিস তা হলে ?'

'অনেক দিন শিখেছি।'

'একটা ঘড়ি কিনবি না ?'

'এই বোনাসে কিনব।'

মিতা ইচ্ছে মত মতিকে দেখে। দেখতে দেখতে সে নীরব হয়ে পড়ে। সব কথা বলার চাতুরি হারিয়ে ফেলে। কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই চাতুরির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। জানে, এই চাতুরি তার মরণ। এই মরণ সে নিজের চোখে দেখে।

'তুই চুল কাটিস কি বিচ্ছিরি ! মিঠুন ছাঁট ?'

মতি লজ্জা পায়। 'ধোৎ।'

'ধোৎ কি ভালই ত লাগছে।'

সিঙাড়া আনে। ওরা সিঙাড়া খায়। গরম সিঙাড়ায় কামড় দিয়ে মিতা চলকে উঠেছে টেবিলে-চেয়ারে। আঁচল সামলায়। মতিকে তার অন্ধকারে টেনে নেবার এ-এক চাতুরি. ছল।

'তুই আমার সত্যি ভাইয়ের মত।'

'আমি অন্য কারখানায় কাজে লেগে যাব দেখবে !'

'তা হলে ত তুই কারিগর হয়ে যাবি।'

'আমি কারিগরই ত।'

'বাঃ রে ছেলে, এই সবে গোঁফ বেরিয়েছে।'

'আমার সতের বছর বয়স, তুমি জানো ?'

'তোর এতটুকু বয়েস।' তিন আঙুল যুক্ত করে দেখায়।

'তোর লকেটটা দেখি' চেয়ারে-টেবিলে চলকে উঠে মতির লকেটটা টেনে নেয়। দেখে উচ্ছল হয়ে ওঠে মিতা। মিতা অন্ধকারের দিকে চলে যাচ্ছে।

'বাঃ ভারি চমৎকার !'

চা আসে। ওরা চা খায়।

চায়ে চুমুক দিতে গরম পায় আবার মিতা। চলকে ওঠে। 'তুই কোনদিন প্রেমটেম করিস নি ত ? এই ছেলে ! ধর তোর সঙ্গে আমার প্রেম। দিদি আর ভাইয়ে প্রেম।'

'যাও ফাজলামো করো না।' মতি রেগে যায়।

'ছোটখাটো কথায় এত রাগ করতে পারিস ! তোর এত রাগ ভাল নয়। বুদ্ধিসুদ্ধি আন। বয়স ত হল ঢের। এই তাড়াতাড়ি বিয়ে করিস নি যেন আবার।'

মতি লজ্জায় হাসে। 'তোমার কথাই শুনছি শুধু।'

'হ্যাঁ, কথা শুনছিস, আর হাঁ করে দেখছিস কী রে ? ভারি মজা না ?'

'তুমি কষ্ট দিয়ে কথা বললে আমার খুব কষ্ট হয়।'

'কষ্ট কি রে, কিছুতে কষ্ট পাবি না।'

'এই চল চল, সময় হয়ে গেল। বই আরম্ভ হয়ে যাবে।'

মিতা পয়সা মেটায়। তারপর ওরা বেরিয়ে আসে।

মিতা আগে আগে যায়, পরে পরে, পেছু পেছু যায় মতি।

সিনেমা হলের ভেতরে অন্ধকারে ঢুকে পড়ে মতিকে নিয়ে মিতা। মিতা জানে, ক্রমশ অন্ধকার, এবং অন্ধকার, এবং অন্ধকারের ভেতর ঢুকে পড়বে সে। বাইরে কলকাতা প্রাণচঞ্চল থাকবে।

বাইরে কলকাতা প্রাণচঞ্চলই থাকে। উচ্ছল আলোয় ভরে থাকে। যান-

বাহন জনকোলাহল প্রাণতা সবকিছুই থাকে। এই আলোর মধ্যে ওপরের আকাশটা হারিয়ে থাকে। তারার আকাশে তারা দেখা যায় না। অন্ধকারের আকাশে অন্ধকার দেখা যায় না। জ্যোৎস্নার আকাশে জ্যোৎস্না দেখা যায় না। জমে জমে ওঠা শান্ত মেঘকেও দেখা যায় না। অগোচরেই কলেজ স্ট্রিটের আকাশে মেঘ জমে ওঠে। এবং এক সময় বৃষ্টি শুরু হয়। টানা অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে থাকতে থাকতে কলেজ স্ট্রিটকে একটু একটু করে ডুবে যেতে হয়। গাড়িঘোড়া জলের ওপর দিয়ে যেতে যেতে দুপাশে ঢেউ তোলে। এক সময় এঞ্জিনে জল লেগে গাড়িঘোড়াও হাঁটতে পারে না। ফুটপাথ ডুবে যায় অনেক আগেই। ভাবী বর্ষায় অন্ধকারে কলেজ স্ট্রিট ডুবে গেছে এটা আর কলকাতার নতুন কথা নয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিস্ময়

কলকাতার সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ড, দপ্তরিখানা এলাকা গভীর রাতে মৃত এক শহর মনে হয়। বিলুপ্ত এক নগরীর ভগ্নস্তূপের অন্ধকার ও নীরবতা। কৃপণ লাইটপোস্টের আলো, ছোট ছোট কারখানার সার গলির নিহিতে পৌঁছয় না। সে-সব কারখানার ভেতর কবরের শয়ানের মত সংকীর্ণতায় দরিদ্র মালিক, কারিগর ওস্তাদ, নিম কারিগর, শিশু শ্রমিক 'বয়' ঘুমোয়। তাদের বুকে মাথায় পাঁজরে অন্ধকার পা ডুবিয়ে দেয়। তাদের হাতের পাশে, মাথার পাশে অন্ধকার থাকে। অন্ধকার থাকে ছোট কারখানাটা জুড়ে। একটা গলির ভেতর অনেক-গুলো কারখানা, সব কারখানাই অন্ধকারে থাকে। সম্পূর্ণ গলিটাই অন্ধকারময়। এরকম অনেকগুলো গলি। গলিগুলোর অন্ধকার জুড়ে অখণ্ড এক অন্ধকার। সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডটা অন্ধকারে তলিয়ে থাকে।

আর এই অন্ধকার নিজের ভেতর নিজেকে ঘনিষ্ঠ করার সহায়ক হয়। গভীর রাতে অন্ধকার আরো কালিপ্রতিম হয়, নিজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আরো তালগোল মেশামিশি করতে পারে। বেঁচে থাকাটাই এক বিস্ময়। এই বিস্ময়বোধ আরো বাড়াতে পারে অন্ধকার। রাতের নিঃশব্দে মিশে থাকে সে অন্ধকার। তার ভেতর শুয়ে থেকে সদ্য কৈশোর পেরনো এক কাঁচা যুবক তার বয়সের নিয়মে সে বিস্ময়াবিষ্ট হবে, এ আর কি এমন নতুন কথা? কিন্তু মতির বিস্ময় মতির কাছে বিস্ময়াতীত হতে হয়। মতি এখন নরম মাটির মত, বয়সধর্মের পোড়ানিতে পাকা হয়নি।

রাতের অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে বিস্ময়ঘোরে ছটফট করে মতি। ঘুম আসে না। মাথার মধ্যে ঝিলিমিলি খেলা করে। মনে হয় সে মরে যাবে। তার ডায়মন্ডহারবারের নেতড়ায় বাড়ি। বিধবা মায়ের সন্তান। দাদা আরো দুটি ভাই আর এক দিদি আছে তার। তাব দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। লক্ষ্মী সাহার রুলিং কারখানায় আট বছর হল কাজ করছে মতি। এখন সে বয় থেকে সাগরেদ হয়ে গেছে। কারিগর হয়ে যাবে। তারপর হবে ওস্তাদ। সেই শিশু বয়স থেকে কাজে এসেছে। তখন তার বয়স আট বছর ছিল।

শনিবারের রাত। বাঁধাই শ্রমিকবা যারা কারখানায় থাকে, প্রায় সকলে গ্রামে চলে গেছে। মতির পাতানো দিদি মিতাও ফিরে গিয়ে এখন তার বিছানায় অঘোরে ঘুমচ্ছে। দিদি প্রতিদিন যাতায়াত করে। দিদি বারাসাতে থাকে। দিদির নাকি ছ-বছরের একটা ছেলে আছে। আছে যখন আছে। স্বামী নেই। মরে গেছে, ক্যানসারে। বাংলাদেশ থেকে দিদি এদেশে চলে এসেছে ছেলেটাকে বুকে নিয়ে। মজিদের কারখানায় সেলাইয়ের কাজ করে দিদি। শুধু বইয়েব ফর্মা সেলাই করে মাচার ওপর বসে বসে। ঐ দিদিই অধুনা তার জীবনে ঘোরতর বিস্ময়াবেশ ও তার অস্থির প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। মতি ত জানে সে কতখানি বড় হয়ে গেছে! শরীরের ভেতর সেই আন্দাজটা পায়। তার মধ্যে এতদিন একটা পুরুষ ঘুমিয়ে ছিল, তাকে জাগিয়ে তোলা হয়েছে। তার বয়স কম, কিন্তু পুরুষটা পুরুষই। দিদি তার থেকে বছর দশেকের বড় হবে। তার মধ্যেও রমণীত্ব ভরে আছে। মতি স্পর্শ গন্ধে অনুভূতির ভেতর পেয়েছে। নিজেকে নিয়ে, দিদিকে নিয়ে তার ঘোর বিস্ময় এখন। ছটফট করে মতি। লক্ষ্মী সাহার রুলিং কারখানায় ঘুমহীন একা একা শুয়ে শুয়ে অস্থির বিস্মযাবেগে রাত কাটায় মতি।

সেদিন শেয়ালদার 'প্রাচী'তে আর আজ কলেজ স্ট্রিটের 'গ্রেসে' দিদির সঙ্গে সিনেমা দেখেছে মতি। সিনেমার অন্ধকারের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় দিন আজও মতির ডান হাতটা বুকে টেনে নিয়েছিল দিদি। দিদি নিজেই উদ্যোগ নিয়েছিল আর উৎসাহিত করেছিল মতিকে। নীরব বোঝাপড়ায়। কিন্তু দুদিনই মতির হাত, সমস্ত শরীর পুড়ে গেছে। মতির চৈতন্য পুড়ে গেছে। মতি, যেন কেঁদে উঠবে এই অন্ধকারের ভেতর। মতির মনে হয় সে মরে যাবে।

ঘুমতে পারে না মতি। ঘোরতর বিস্ময়। নারী পুরুষের সংলগ্ন সম্পর্কের বিস্ময়। শরীরের ভেতর একটা চাবুক আছাড়ি-পাছাড়ি করে মারে মতিকে। এ কেমন! এমনটা হল কেন তার? নিজের ভেতরের আর-এক মতিকে চিনত না মতি।

চিৎ হয়ে শুয়েছে মতি। হাত দুটো দুদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে তার। বুক দ্রিম্ দ্রিম করছে। আট বাই দশ ছোট কারখানার মধ্যে দুটি রুলিং মেশিনের মাঝখানে চিলতে জায়গায় শুয়ে আছে। দুদিকের

দুটি মেশিন যেন তাকে চেপে ধরতে চায়। হাত দুটি দুটো মেশিনের তলায় চলে যায়। দু-চারটি মশা তাকে কামড়ায়। মশারি টাঙায় নি সে। মশারি নেইও তার। লক্ষ্মী সাহা প্রতিদিন দমদম ক্যান্টনমেণ্টে তার নিজের বাড়ি ফিরে যায়। মতির কাছে চাবি থাকে, মতি রাতে শোয়। কখনো নিজে রান্না করে খায়। রাতে সাধারণত হোটেলে খেয়ে নেয়। দুপুরে বিজয় কারিগর মালিক ও তার এই তিনজনের রান্না মতিই করে থাকে।

কটা বাজে জানে না মতি। অনেকক্ষণ শুয়েছে, বলতে পারে। ঘরের আলোটা নিবিয়ে শুয়েছে। সারারাত জ্বললে ইউনিট পুড়বে। লক্ষ্মী সাহা মিটার দেখে জানতে পেরে যাবে। এক-দুবার জ্বালানো যেতে পারে। কিন্তু আলো তার ভাল লাগছে না। বেশ আছে অন্ধকারে। দিদি তার সমস্তকিছু তছনছ করে দিয়েছে। কী তার করণীয় সে জানে না। এজন্যেই সে আরো ছিঁড়েখুঁড়ে যাচ্ছে। সিনেমা হলের অন্ধকারে ডান হাতটা দিদি তার বুকে নিয়ে খেলেছে। মতিও আত্মউদ্যোগী হয়ে দিদিব বুকে হাত দিয়েছে, খেলেছে। ভীষণ ভীষণ তার অনুভূতি। অন্ধকারের ভেতরই দিদি এ-রবম ঘটনার মধ্যে তাকে নিয়ে গেছে দু-বার। তারপর দিদি দিনের আলোয় কেমনভাবে তাকে অস্বীকার করেছে। যেন ওসব ঘটনা, ঘটনা নয়। যেন দিদির অসুস্থতা। দিদি তেমনটাই বোঝাতে চেয়েছে। দিদি অসুস্থ হয়ে পড়লে, অন্ধকারে মতির হাত নিয়ে বুকে চেপে ধরতে চায়। এবং মতি নিজের চেষ্টায় হাত দিলে দিদি তখন খুশি হয়। তখন কত ঘেমে নেয়ে গেছে মতি, মতি সে ঘটনার কথা জানে। আর প্রতিটি মুহূর্তে সে-ঘটনার অনুসরণ মতির মধ্যে বয়ে চলেছে।

মতি জানে, এটা দিদি-ভাইয়ের আচরণ হতে পারে না। অথচ সেদিনের পর থেকে দিদি যেন আরো দিদি হয়ে উঠতে চায়। বকুনি লাগায়। উল্টো-পাল্টা পয়সা খরচ করতে বারণ করে! বুদ্ধিসুদ্ধি বাড়াতে বলে। তখন দিদি একেবারে আলাদা। যেন অন্ধকার সিনেমা হলের দিদি নয়। অথচ মতি জানে, দিনের আলোব দিদির মধ্যে, অন্ধকার সিনেমা হলের দিদির শরীর লুকিয়ে আছে। ভীষণ দ্বন্দ্ব। সে জানে না দিদির মনকে। কেমনতর দিদির মন? দিদির কী অসুস্থতা জানে না। দিদি সিনেমা হলে অসুস্থ হয়ে উঠলে তার হাত টেনে নেয় বুকে। মতিও খেলা করে। এটা কেন. দিদি অসুস্থ হয়ে উঠলে তাকে এমনটা করতে হবে কেন? তার কি মন নেই? সে যে রাতের বিছানায় ছটফট করে, এটা কি দিদি বোঝে না? তার উদ্ভিন্ন যৌবন নারী শরীরের স্বাদ পেয়ে বিস্ময়ে ভরে উঠেছে, সে শরীর দিদির নয়, নারীর। দিদির মধ্যে যে নারী লুকিয়ে আছে, সেই নারীর জন্যে মতি ব্যাকুল অশান্ত। তার যা বয়স, এই ব্যাকুলতার পক্ষে যথেষ্ট। এবং এই বয়স আরো উদ্দাম। ছিঁড়েখুঁড়ে যায়, ব্যথায় টনটন করে ওঠে। দিনের আলোয় দিদির সঙ্গে দেখা হয় যখন অন্ধকারের দিদি হারিয়ে গিয়ে, দিদি আরো গাঢ় দিদি হয়ে উঠতে চায়।

কিন্তু অন্ধকারের শরীর লুকিয়ে থাকে দিদির মধ্যে। অদৃশ্য এক চাবুক আছাড়ি-পাছাড়ি মারে মতিকে। তার একি করল দিদি? তার এমন সর্বনাশ করল কেন দিদি? দিদির স্বামী নেই। দিদি বিধবা। ছ-বছরের এক ছেলে আছে। দিদির আরো কেউ কেউ আছে যেন। দেওর শ্বশুর জা।

আজ 'গ্রেস' সিনেমা হলের অন্ধকারে ঢুকে যাবার পর আকাশ জুড়ে বর্ষণ হয়। প্রবল বৃষ্টিতে কলেজ স্ট্রিট এক হাঁটু জলের তলায় চলে যায়। সিনেমা হলের অন্ধকারে দিদি ও সে সংলগ্ন হয়ে ছিল। নারী-পুরুষের সংলগ্নতা। বাইরে বেরিয়ে আসতেই, সে নারী দিদি হয়ে ওঠে। যতই দিদি, দিদি হয়ে উঠতে চায়, ততই নিজেকে মিথ্যে মনে হয় মতির। মতি একেবারে শূন্য। মতির কোনো ইচ্ছে নেই, মতির কোনো মন নেই। মতির শরীরে আকাঙ্ক্ষা শুধুই অন্ধকারের প্রয়োজনে লাগে? ঘোর বিস্ময়।

সাঁইত্রিশ নম্বর ও য়ার্ডের অন্ধকারের প্রয়োজনে মতি লাগে। এই অন্ধকার যে আবেশ তৈরি করে, সেই আবেশে জীবনের এক বিস্ময়বোধ সন্নিবেশিত হয়। এ যেন কলকাতার মধ্যেই এক মৃত ধ্বংস-স্তূপীকৃত নগরীর মধ্যে থাকে। অন্ধকার গলিগুলি ধ্বংসস্তূপের ভেতর যেন সুড়ঙ্গপথ। নানা জায়গায় বাঁক, অচলায়তন সংকীর্ণতা। যেন মাঝে মাঝে ধস নেমেছে। ছোট ছোট কারখানাগুলি। তাতে বই ফর্মা কাটিং মেশিন সমস্ত জায়গা জুড়ে থাকে। শ্রমিকরা তার ফাঁকে ফাঁকে বসে কাজ করে।

শ্রমিকেরা ঘোর বিস্ময়ের হয়ে ওঠে। প্রত্যেকেই শিকড়বিহীন। এই সভ্যতার কেউ নয় তারা। মৃত কোনো সভ্যতার মানুষ, ধ্বংসস্তূপের ভেতর রয়ে গেছে। আজ শ্রমিকরা বৃদ্ধ, একদিন সে শিশু বয়স থেকেই এখানে চলে এসেছিল। তারা বিধবা মায়ের অনাথ সন্তান ছিল। কেউ ছিল স্বামী-পরিত্যক্তার সন্তান। অথবা স্বাধীনতার পর পূর্ববাংলা থেকে ছিন্নমূল, প্রত্যাখ্যাত, সেইসব মাতা-পিতার সন্তান তারা। দশ জন পুরুষ শ্রমিককে জিজ্ঞেস করলে ছ জন বলবে তারা বিধবার সন্তান, অথবা স্বামী-পরিত্যক্তার সন্তান। চার জন বলবে পূর্ববাংলার মাটি ছেড়ে এসেছে তারা। এই অন্ধকারের প্রয়োজনে এই জীবনচরিতের বিস্ময়-জনক সমাহার হতে হয়। নাকি এই ওয়ার্ডে এসে তারা চিহ্নিত হতে চায়। নাকি কুষ্ঠরোগিদের একসঙ্গে থাকার মত? নাকি চিড়িয়াখানায় বাঘেরা থাকে বাঘেদের ঘরে, পাখিরা থাকে পাখিদের ঘরে, শিম্পাঞ্জিরা থাকে শিম্পাঞ্জিদের ঘরে,—কলকাতার এই ওয়ার্ডের শ্রমিকরা স্বামী-পরিত্যক্তা অথবা বিধবার সন্তান, তারা শিশু, শিকড়বিহীন, শিশু অবস্থায় তাদের চলে আসতে হয়েছিল এখানে, এখন তারা কেউ বৃদ্ধ, কেউ প্রৌঢ়, যুবক। এখনো আসছে সেই শিশুরা, যারা অনাথ, শিকড়বিহীন। এখনো আসছে সেই মানুষ যারা দেশ প্রত্যাখ্যাত, শিকড়বিহীন মানুষ।

মহিলা শ্রমিকদেরও এই অন্ধকারের প্রয়োজনে বিস্ময়-বিধুর হতে হয়।

তারা প্রত্যেকেই বধূ ছিল। এখন তারা কেউ বধূ নয়। তারা পূর্ববাংলা, অধুনা বাংলাদেশ থেকে এসেছে। প্রতিদিন শয়ে শয়ে যারা আসে, তাদের মধ্যে এরা কেউ কেউ। এই কেউ কেউদের মধ্যে যারা বিধবা অথবা স্বামী-পরিত্যক্তা আশ্চর্যজনকভাবে তাদের সমাবেশ এখানে পাওয়া যাবে। তারা কেউ ও-দেশে বিধবা হয়েছে। অথবা এখানে এসে বিধবা হয়েছে। তারা কেউ ও-দেশে স্বামী-পরিত্যক্তা হয়েছে। অথবা এদেশে এসে স্বামী-পরিত্যক্তা হয়েছে।

কোম্পানি আমল থেকে বাঁধাই শিল্পের পত্তন। সাহেবরা দেশ-শাসনের প্রয়োজনে দপ্তরিখানার পত্তন করে। কারিগরি হাতেনাতে শেখার কাজে (যাতে লেখাপড়া না শিখলেও চলে), অথবা সাহেবদের নিজস্ব সাহেবিয়ানার খিদমতে হাতের কাছে পেল দরিদ্র মুসলমানদের। কারণ হিন্দুরা নাগালের বাইরে ছিল। হিন্দু বঙ্গসন্তানদের মধ্যেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদারির বণ্টন হয়। তাদের অর্থনৈতিক জীবন সচ্ছল হয় এবং শিক্ষার আলো গ্রহণ করতে পারে তারা। দরিদ্র হিন্দু যে ছিল না তা নয়, তারা জাত ব্যবসায় সন্তুষ্ট থাকত। সাহেবদের পক্ষে সহজ হয় দরিদ্র মুসলমানদের পেতে। সাহেবরা প্রশাশসিক প্রয়োজদে দরিদ্র মুসলমানদের নেয়। প্রেস বসায়, প্রেসের কাজ শেখায়। তাদের শিখিয়ে পড়িয়ে দপ্তরিখানা বসায়। রুলিং মেশিন বসায়। রুটি কেক বিস্কুট তৈরি করা শেখায়। বাবুর্চি আর্দালি কোচোয়ান বানায়। সভ্য হওয়ার প্রয়োজনে, নগর উন্নয়নের প্রয়োজনে লাগায়। ইলেকট্রিকের মিস্ত্রি বানায়। পোশাক পরিচ্ছদ বানাতে তাদের দর্জি ওস্তাগর হতে হয়। হগ্ সাহেবের মার্কেটে, দোকান নিয়ে তাদের বসতে হয়। সাহেবদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তারা লাগে, আর সাহেবদের প্রশাসনিক প্রয়োজনে লাগে।

আদি ও নব্যতরর মধ্যে প্রয়োজনের এক ক্রমান্বয় এখনো আছে। যে শহরকে সভ্য ও আলোকিত এবং আধুনিক করার প্রয়োজনে তারা লাগত, তারা এই শহরেরই এক অন্ধকার পাড়ায় বাস করত। সাঁইত্রিশ নম্বর, সে-রকম একটা পাড়া। সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ড ডালহৌসী, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, চৌরঙ্গীর মত আগে যেমন ছিল না, এখনো নয়। সাহেবরা পূর্ববাংলার প্রকৃতিতাড়িত ঝড়ঝঞ্ঝা-কবলিত ছিন্নমূল দরিদ্র মুসলমানদের দপ্তরির কাজে পেয়ে যায়। পূর্ববাংলার সেইসব মুসলমানরা আবার তাদের সাগরেদ খুঁজে নেয়, এ বাংলার বিধবা মা, স্বামী-পরিত্যক্তা, মায়ের অনাথ সন্তানদের। পূর্ববাংলা ও পশ্চিমবাংলা আসলে এক দেশ এক ভূখণ্ডের ছিল। সেদিনও ঝড়ঝঞ্ঝায় মাটি থেকে উৎপাটিত হত, তারা তখনো এখানে চলে আসত। এখন এই বাংলা ঐ বাংলা অন্য দেশ অন্য রাষ্ট্র হলেও, মানুষের উৎপাটন অব্যাহত, আদি অখণ্ড বাংলার প্রকৃতিগত প্রতিক্রিয়া সেই প্রবহমান জীবনের মধ্যে একইভাবে পড়ে। ছিন্নমূল হয়ে মানুষ প্রতিদিন চলে আসছে। সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডের আদি মানুষের সঙ্গে নব্যতরর শ্রেণীগত ঐক্য খুঁজে পাওয়া যায়। এই ক্রমান্বয় পরাধীনতার

ভেতরও ছিল, স্বাধীন রাষ্ট্রিক জীবনেও আছে। স্বাধীনতার পর, এই শহরে মৃত নগরীর মত ভগ্নস্তূপ আরো বেড়েছে। নগর উন্নয়নের প্রকার প্রসার দুইই ততোধিক বেড়েছে। মেট্রো রেল হয়েছে, ফ্লাইওভার হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি বিল্ডিঙের সংখ্যা বেড়েছে। সুসভ্য কেতায় আবাসন এলাকা গড়া হয়েছে। সরকারি, বেসরকারি দুইই। কিন্তু সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডের সেই অন্ধকার, সংকীর্ণ গলি ও খোপে খোপে মানুষের কর্মভূমি-বসবাস আরো অন্ধকার ঘিঞ্জি মলিন কদর্য হয়েছে। ধ্বংসস্তূপের ভেতর মৃত নগরী এক। অথচ, ফ্লাইওভার বুকে নিয়ে ঝলমলে আলো ও রঙ নিয়ে শেয়ালদা তিলোত্তমা কলকাতার প্রতিনিধি হয়ে ওঠে, তারই পায়ের কাছে সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ড। এই ওয়ার্ডের পাশেই দেখা যাবে নব নির্মীয়মাণ এক মালটিস্টোরিড বিল্ডিং। সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ড তেমনই অন্ধকার। আদি ও নব্যতরর মধ্যে অনালোক প্রতিক্রিয়াজনিত এক ক্রমান্বয় খুঁজে পাওয়া যাবে। অন্ধকারের প্রয়োজনের ক্রমান্বয়ও খুঁজে পাওয়া যাবে।

পূর্ববাংলার শিকড়ছিন্ন মানুষের প্রয়োজন ছিল সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডের, এখনোও প্রয়োজন হয়—দেশ রাষ্ট্র আলাদা আলাদা হলেও। আজও বিধবা স্বামী-পরিত্যক্তার শিশুরা সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডের অন্ধকারের প্রয়োজনে বিস্ময়-অতিরিক্ত সম্মিলিত হয়। স্বাধীনতার পর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ফর্মা ভাঁজাই সেলাইয়ের কাজে বিধবা ও স্বামী-পরিত্যক্তা মহিলারা। সেই শিশুদের সঙ্গে জননী সংযোজিত হয়েছে। সেই শিশুরা বড় হয়। যৌবনপ্রাপ্ত হয়। প্রৌঢ় হয়, বৃদ্ধ হয়, মরে যায় তারপর। শ্রমিক গঠনের বৈশিষ্ট্যগত ঐক্যের বিস্ময় এই অন্ধকারের প্রয়োজনে যেন। আবার এই অন্ধকার তাদের থাকা ও দেখার মধ্যে চরিত্রগত ব্যক্তিক বিস্ময় তৈরি করে।

যেমনটা মতির ক্ষেত্রে। মতি রুলিং কারখানার অন্ধকারে শুয়ে থাকে। এক বিধবার পুত্র হয়ে, শিশু থেকে যৌবনপ্রাপ্ত হয়েছে মতি। আর-এক বিধবা নারী-বেশে তাকে বিস্মিত করে। নারীও হাতের কাছে পেয়ে যায় মতিকে। নারীটিরও কম বিস্ময় নয়। জীবনের সমগ্র অর্থই যেখানে বিস্ময়নির্দিষ্ট, সেখানে নানা শাখাপ্রশাখায়, নানা চোরাস্রোতে বিস্ময়দিগ্ধ হবেই। তাদেব দারিদ্র্যের ক্রমান্বয় যদি বলা হয় নির্যাতিতাড়িত, পূর্বনির্দিষ্টতায়—তা হলে এ যুক্তিরও আশ্রয় নিতে পারে, মহাকাব্যিক ট্র্যাজেডির সেই জননীর শয্যা কলঙ্কিত করা পুত্র, তাদের সন্তানেরা অবাঞ্ছিত জীবনযাপন করবে—এই ক্রমান্বয়ের যুক্তির ভেতর মতিষ্কগত বিচার খুঁজে নেয়া যেতে পারে। ভবিষ্যতে এই ক্রমান্বয় অব্যাহত হওয়াটাকে বিস্ময় ব্যতিরেকে মেনে নেয়া হবে।

আসলে এমনটা নয়। বাংলাদেশে বিধবা হওয়া, মাটি থেকে উৎপাটিত হওয়া মিতা শিশু সন্তান বুকে নিয়ে ভারতে এসেছিল দু বছর আগে। এখন সে ছাব্বিশ বছর বয়সের যুবতী নারী। সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে সে বাঁধাইয়ের

কাজে আসে। পৃথিবীতে সে একা ও পুরুষহীন। নিজের দেহের গন্ধে সে মরে থাকে। সে অন্ধকারে এক পুরুষের শরীর পেয়ে যায়। মতির সঙ্গে তার দিনের আলোয় দিদি-ভাইয়ের সম্পর্কের ভেতর নয়। অন্ধকারের ভেতর। সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডের অন্ধকারতা, বিস্ময়াবেশ যেমন ছড়িয়ে থাকে, সেই জীবন, আর-এক অন্ধকারের সঙ্গে মিশে যেতে চায়। তাদের জীবনের বিস্ময়কে বাঁচিয়ে রাখতে চায়, প্রতীকে, রূপকে অলংকারে।

মতি চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে অন্ধকারে। ঘুমতে পারে না। এ তার কী হল? অনাস্বাদিত বিস্ময়ে ফুলঝুরির অগ্নিকণা ঝরে পড়ার মত নিরন্তর বিদ্যুচ্চমক তাকে অস্থির করে। শরীর মিথ্যে নয়, অনুভূতি মিথ্যে নয়, সম্পর্ক মিথ্যে কেন? তবে কি অন্তর্গত সম্পর্কের এই বহিরঙ্গ আবরণ? সারাক্ষণই মতির মনে হয়, এ কি করল মিতাদি? এমনটা হল কেন? দিদির কাছে তার যেতে খুব ইচ্ছে করে, অন্ধকারের সম্পর্কের বহতায়। কাছে গেলে মিতাদি সে-সব মিথ্যে করে দেয়। দিনের আলোয় অন্ধকারের সম্পর্কসন্ধি পেয়ে গেলে কি খুব শান্তি পাবে মতি? তা নয়। মতি কিছুই জানে না, কিছুই বোঝে না। মতি এর শান্তি জানে না, শেষ জানে না, সংহার জানে না। সে ঘটনার স্রোতে নিমজ্জিত, সে ঘটনার উৎস গতি পরিণতি জানে না।

নতুন জামা-প্যাণ্ট পরেছিল আজ মতি। দড়িতে ঝুলছে। নতুন পোশাকের গন্ধ পায়। আজ বাড়ি যাবার কথা ছিল। যাওয়া হল না। বাড়ির জন্যে মন কেমন করে না? করে। সেই আট বছর আগের স্মৃতির বহতার অভিমান কুরে কুরে খায় তাকে। বাবার প্রতি অভিমান। বাবাকে দেখাতেই পারল না তার মা। তার জ্ঞান হবার আগেই তার বাবা মরে গেল। তার দাদা মুক্তো তার থেকে আড়াই বছরের বড়। মা বলেছে। মতির তখন স্কুলে যাবার বয়স হয় নি। দাদা তখন স্কুলে পড়তে পড়তে কারখানায় চলে গেল কাজ শিখতে। বড় অভিমান। দাদার সঙ্গে তার ভাল করে ভাব হল না। খাওয়ার ভীষণ কষ্ট। উপোসে উপোসে কাটে। বড় অভিমান জমা আছে। ভাই-গুলোর কান্না। মা বাড়ি বাড়ি কাজ করে এটা-ওটা এনে চালাত। দু-বছর পরেই মতি গ্রামের এক ওস্তাদের হাত ধরে এখানে চলে আসে। এখানে মা ভাই-বোনদের ছেড়ে চার-ছ মাস থাকত। বড় অভিমান। এই অভিমান মিশে যেত, আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নচারণায়।

আজ বাড়ি যেতে চেয়েছিল মতি। রুলিং কারখানায় কাজ করে নি আজ নিয়ে দুদিন। প্রতিদিন দুপুরবেলা মিতাদি টিফিনের সময় তার সঙ্গে এসে দেখা করে। দুদিন আসে নি, অভিমান হয়েছিল মতির। 'প্রাচী' সিনেমার অন্ধকারের ঘটনার পর মিতাদি তার সঙ্গে দেখা করার নির্দিষ্ট সময়টাকে মানছিল না। আজ কাজ না করলেও ঐ সময় এই কারখানায় ছিল মতি—মিতাদি এল না। তখন খুব অভিমান হয় মতির। মিতাদির জন্যে প্রাণটা হু হু করে সব

সময় মতির—অথচ দিদি এত নিষ্ঠুর! সামনের গলিটাতেই মিতাদি কাজ করে। নিজে থেকে দেখা করতে, যেতে গিয়েও যায় নি। বড় আবেগ অভিমান তার। শুক্রবারে আসে নি, শনিবারেও আসে নি মিতাদি। দুদিনই ছুটি নিয়েছিল মতি। টিফিনের সময় লক্ষ্মী সাহার কারখানায় মিতাদির জন্যে অপেক্ষায় থেকেছে। মিতাদির জন্যে তার এত প্রাণ টানে, অথচ মিতাদি নিষ্ঠুর ব্যবহার করে চলেছে। সিনেমা হলে, অন্ধকারে মিতাদি নিষিদ্ধ প্রবেশ ভেঙে যে স্বাদ গ্রহণ করতে দিয়েছিন, সেই বিস্ময়ের প্রতিক্রিয়ায় মতি মরে যেতে পারত, এখনো মরে যেতে পারে, তার এই সংকট সময়ে একমাত্র মিতাদির উপস্থিতি চাইছিল সে; সে মিতাদির অন্ধকারের মধ্যে বন্দি। মিতাদি এল না, এমন ব্যবহার তাকে কণ্ট দিচ্ছিল। ছুটি নিয়েও বাড়ি যেতে পারেনি। এবং মিতাদির কারখানায় গিয়ে মিতাদির সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারে নি। তার বড় অভিমান, রাগ। সে প্রকাণ্ড একটা অন্ধকার চাচ্ছিল। এই সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডটার মত। যেখানে মিতাদি তাকে টেনে নিতে পারে। তেমন কোনো অন্ধকার। মিতাদির শরীরের স্বাদের জন্যে হাহাকার হয় তার।

নব যৌবনের রক্তে ভরে আছে মতি। সে কোনো সংসার জানে না, দাম্পত্য জানে না। জানে না মৃত্যু, জানে না স্মৃতির প্রেম, স্মৃতির ভেতর থেকে জানে না সাম্প্রতিকের আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণতার বোধ। সে শুধু সাম্প্রতিক জানে। মিতা তার কাছে নারী হয়ে ওঠে শুধু। এই চেনাটাই তার নব যৌবনের কাছে যথেষ্ট বিস্ময়সূচক। সে তার সমাধান জানে না বলে আরো বিস্ময়। সে নিজেকে বাঁধতে পারছে না বলে কম বিস্ময় নয়। তার যৌবন কোনো দিদির স্পর্শ পায় নি, সে নারীর। অথচ সে নারী দিনের আলোয় দিদি হয়ে আসে। সে অন্ধকারকে দিদি ভেঙে দেয়। আবার দিদিই সে অন্ধকার তৈরি করে। এই ঘোরতর বিস্ময়ে বিস্ময়ে নিরন্তর আহত হতে থাকে মতি। মতির কোনো সমাধান জানা নেই. শুধু আহত হতে জানে।

তাই এই অন্ধকারের ভেতর চিৎ হয়ে শুয়ে মতি টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে। শুয়ে শুয়ে হাঁটু দুটো দু-হাতে ধরে। মুচড়ে ভেঙে ফেলতে চায় নিজেকে। ভূপতিত আহত চিলের মত দু-হাতের ঝাপটানিতে সারা শরীরে সে নিজেকে মারে। অন্ধকারের রাতের ভেতর, অন্ধকারে সে মুখ ঘষে, চিবুক গেঁথে দেয় অন্ধকারে, কনুইয়ে উসকায় অন্ধকার, সারা শরীরে মেখে নেয় অন্ধকার, অন্ধকার কাঁচা রক্তের মত যেন তার শরীরে মিশে থাকে, রক্তে মিশে থাকে অন্ধকার, তার চেতনায় অন্ধকার শকুনের ডানার ছায়ায় দ্রুত নিঃশব্দতায় নেমে আসে। সে এই ঘটনা ও সম্পর্কের সমাধান জানে না। সে তাই নিয়ন্ত্রণহীন। তার সমর্পণ অখণ্ড এক অন্ধকারের ভেতর. যাতে অসংখ্য শিকড়বাকড়ের জটিলতা।

অন্ধকার ঘরের ভেতর একটা জোনাকি এসে জ্বলে নেভে। দেয়ালে এসে বসে। একটুকরো আলো মেখে থাকে দেয়ালটা। অন্য জায়গায় গিয়ে বসে

জোনাকিটা। আগের আলোকিত জায়গাটা অন্ধকার করে দেয়। তারপর এখান থেকে ওখানে ছোট ছোট স্বর্ণরেখায় ওড়ে। রেখায়িত আলোগুলোকে মুছে দিয়ে দিয়ে অন্ধকার করে দিতে থাকে। রুলিং মেশিনের ভেতর ঢুকে যায়। মেশিনের ভেতর একটা স্বর্ণরেখা মুছে মুছে অন্ধকার তৈরি করছে। যেখানে বসছে সেখানে একটা আলোর ডেলা হয়ে যাচ্ছে। আলোর ডেলাটি দপ দপ করে। তারপর অন্য জায়গায় উড়ে গিয়ে বসলে, আগের জায়গাটা অন্ধকার হয়ে যায়। জোনাকিটা মতির চৈতন্যের ভেতর এসে ওড়াওড়ি করে। স্বর্ণরেখা অন্ধকার করতে করতে উড়ে বেড়ায়।

এই গলিরই, চোদ্দর চারের গলির মুখটায়, জাভেদ মিয়ার কারখানা। জাভেদ মিয়া মারা গেছে, হাসপাতালে। রক্তবমি করে হাসপাতালে ভর্তি ছিল কদিন। আজ মরে যায়। একটু আগে পর্যন্ত জাভেদের বউটার কান্না গলিতে ডানা ঝাপটাচ্ছিল, করুণ ও বুকফাটা আর্তিতে। এখন থেমে গেছে। হয়তো জাভেদের বউ এখন ঘুমিয়েছে।

আজ সন্ধ্যায় কলেজ স্ট্রিট ডুবে গিয়েছিল। সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে দেখেছিল এক হাঁটু জলে ডুবে আছে কলেজ স্ট্রিট। মিতাদি শাড়ি ডুবিয়ে হাঁটছিল। মতি প্যান্ট জুতো ভিজিয়ে হাঁটছিল। মিতাদি তার ডান হাতটা বাঁ-হাতের মুঠোয় ধরে হাঁটছিল। মিতাদি নানা ভঙ্গিতে টলে যাচ্ছিল। তাকে সামাল দিচ্ছিল মতি। 'এই হাঁদা,—পড়ে যাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছিস না। ভাল করে ধরে রাখ—তোর দিদি না আমি!' কথাটা কানে ঘোরাফেরা করে মতির। আছাড়ি-পাছাড়ি তাকে মারে। আলোয় এসে মিতাদি, তার মাথায় 'দিদি' শব্দটা বিঁধিয়ে দিচ্ছিল। তার সমস্ত রাগকে দাঁতে পিষে মারছিল মতি। আর বলেছিল 'দিদিদের ওপর রাগ করতে নেই। দিদিদের খারাপ ভাবতে নেই—দিদিরা দিদিই। তুই ভাই বলেই তোর হাত ধরি, তোর সঙ্গে সিনেমা দেখলাম। তাই বলে কিনা তোর পাশে বসতে পারি। তোকে পাশে নিয়ে শুলেও আমার দোষ নেই। বল না, ভাইবোন পাশাপাশি শোয় না?—হাঁদা চুপচাপ থাকিস যে! কথা বলিস নে কেন?—মিঠুন ছাঁট চুল—একদিন ধরে ন্যাড়া করে দেব।' শুয়ে শুয়ে মিতাদির কথাগুলো মাথার ভেতর পোকার মত উড়ে বেড়ায়। মিতাদির ডাগর চোখ, সে দিদি নয়, মতির অনুভূতি এই অস্বীকার করছিল। স্পর্শের ভেতর রক্তের আগুন দাউ দাউ জ্বলছিল, এখনো জ্বলছে। অস্বীকার করে মতি। কেন অস্বীকার করে মতি জানে না।

দুরন্ত আকর্ষণে আলোককামী পোকার মত আগুনে ঝাঁপ দিতে চায় মতি। এই আকর্ষণের আছাড়ি-পাছাড়ি চাবুকে ছিঁড়ে খুঁড়ে যায়।

মিতা মতিকে তার শরীরের দিকে টেনে নেয় সিনেমা হলের অন্ধকারে। তার পরে বাইরে এসে দিদি হয়ে উঠতে চায়। ঘোর ধন্ধ বিস্ময়ে পড়ে মতি। মতি অন্ধকারে নারী শরীরই পায়, দিদিকে পায় না। তারপর মেলাতে পারে

না মতি। দিদির শাসনের সুরে মতিকে অস্বীকার করে। কিন্তু মতি আর নব-যৌবনের নারী-পুরুষের সম্পর্কের বিস্ময় বোধ করে, তার কাছে নতুন একটা দরজা খুলে যায়। মিতার পুরুষ ছিল একদিন, প্রেম মিলন মৈথুন ছিল, সে-সব লুপ্ত হয়ে গেছে মিতার। নিজের দেহের গন্ধে সে মরে থাকে। নিজের দেহের গন্ধ সে নিজে পায়। এই বিষাদের ভেতর, মতিকে অস্বীকার করে মতির ভেতরের পুরুষ স্পর্শকে একটু চুরি করতে চায় মিতা। তার পরিণত চাতুরি দিয়ে মতির চৈতন্য অনুভূতির নিজস্ব পুরুষকে যথাস্থিত রাখতে চায়। তাকে অতি ছোট করে দেয়। যেন সে একটা শিশু ভাই—আর সে বালিকা—তাদের খেলা, সারল্যের খেলা।

মিতার এটা মিথ্যে প্রচেষ্টা। সে অন্ধকারের জন্যেই এ সব মনে মনে বানায়। তার এই বানানোটা ছিঁড়ে দেয় মতি তার রাত্রির বিছানায় শুয়ে শুয়ে। দিদিকে পায় না, নারীকে পায়। যেন এই সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডের আলো-আঁধারি, বিগত স্মৃতির যৌবনের আলোর টুকরো এসে মেশে, নবযৌবনকে জাগিয়ে এক অন্ধকারের ভেতর। কিন্তু ঘোর নবযৌবন জাগ্রত হয় আলোকিত হয়ে, অন্ধকারের সঙ্গে মিশে। মিতার বর্তমানের অন্ধকার গভীরতর, স্মৃতির প্রবহ আলো যা তুলে নেয় তা আসলে মৃত দিনের, মতির যৌবন আলোকিত হয় নতুনতর প্রভায়, কিন্তু অন্ধকারে মিশে তার এই যৌবনের প্রভা ঘোর কালো হয়ে ওঠে।

সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডটাই এরকম, তার গলির অন্ধকার ও অবহেলার অনালোকে। যেখানে তরুণী বিধবা, স্বামী-পরিত্যক্তারা আশ্চর্যজনকভাবে, কুষ্ঠ আশ্রমে সবাই কুষ্ঠরোগীর মত এসে জড় হয়। আর যারা আসে শিশুরা, তারা প্রত্যেকেই এই জাতীয় রমণীদের সন্তান। সমাজ, অর্থনীতি, পরাধীনতা, সাম্রাজ্যবাদ, দেশভাগ, গণতন্ত্রের নিহিতেই এই অনালোকিত ওয়ার্ডটিতে মহিলা পুরুষ শ্রমিকরা সম উৎস থেকে জড় হয়েছে, ইতিহাসের পর্বে পর্বে। মালিন্য ও সংকীর্ণতায় বিলুপ্ত নগরীর ভগ্নস্তূপের এক অন্ধকার এখানে থাকে। সেই সামূহিক অন্ধকারের ভেতর, ব্যক্তির ভেতর অন্ধকারের নানা প্রতিক্রিয়া এসে পড়ে। এই সব শিকড়বিহীন ব্যক্তিদের অন্ধকার কখনো বিষাদ কখনো বিস্ময়, কখনো প্রেম, কখনো বিরহ, কখনো মৃত্যু হযে ধরা পড়ে। আসলে এসব অন্ধকারজাত। এখানে গলিতে গলিতে এমন ঘুপচি গুহার অন্ধকার, এখানে একে অপরে যে প্রেম অনুভব করে অন্ধকারকে অসত্য করে নয়। শোক হাস রতি বিস্ময় বিষাদ সমস্তুতে অন্ধকার গলে গলে পড়ে। এই অন্ধকার থেকেই ব্যক্তি তার বিষাদকে পেয়ে যায়, বিস্ময় পায়, প্রেম পায়, বিরহ পায়, মৃত্যু পায়।

মিতার সঙ্গে মতি নিরন্তর-কল্পিত সংলাপ তৈরি করে।

মিতা 'কি রে হাঁ করে কী দেখছিস ?'

'তোমাকে।'

'কেন রে ?'

মতি হাসল, বলতে পারল না।

'দিদিকে তোর এত ভাল লাগে?'

'খুউব ভাল লাগে।'

'আমাকে ছেড়ে কোনোদিন কোথাও যাবি না?'

'না।'

'ভেবে দ্যাখ্।'

'না।'

'তোর কি খুব কষ্ট?'

'হ্যাঁ কষ্ট।'

'তুই কি ঘুমতে পারছিস না!'

'রাতে ঘুমতে পারি না।'

'আমাকে তোর নিষ্ঠুর মনে হয়?'

'হ্যাঁ।'

'আবার ভালবাসিস?'

'হ্যাঁ।'

'আয় আমার কাছে, আমাকে ছোঁ।'

কল্প সংলাপটা এ-রকম একটা জায়গায় এসে থেমে যায়। মতি অন্ধকারের ভেতর হাঁটু মুড়ে উপুড় হয়ে শুলে অন্ধকারের সঙ্গে তার মিলন হয়। অন্ধকারকে দুমড়ে মুচড়ে নেয় বুকের ভেতর।

ভেতর ভেতরে ঘিঞ্জি ছোট ছোট কারখানাগুলো। বাইরে অচলায়তন রাস্তাগুলো। ঠেলা, সাইকেল রিকশো, রিকশো, টেম্পো ট্রাক জটিল থেকে জটিলতর হয় দিনের আলোয়। ময়লা ছেঁড়া পোশাকে চোখে কালি বসা শ্রমিকরা হাঁটাচলা করে। কারখানায় বসে নীরবে কাজ করে যায়। পাটোয়ার বাগান বাঁধাই-শিল্পের মূল ও আদিকেন্দ্র। তাকে ঘিরে সমস্ত ওয়ার্ডটি জুড়ে বাঁধাইখানা বিস্তৃত হয়েছে। বই আর খাতা বাঁধাই মূল। এই দুটির সহযোগ ছোট ছোট কারখানাগুলি থাকে। রুলিং কারখানা থাকে। খাতা বাঁধাইয়ের সহযোগী কারখানা রুলিং আর রঙঘর। হিশেব-নিকেশের নানা খাতা, তার নানারকম গড়ন, নানারকম বাঁধাই-কলা। কোনোটা ঢাউস মোটা কোনোটা পাতলা। কোনোটা রেক্সিন দিয়ে বাঁধানো, কোনোটা চামড়া দিয়ে বাঁধানো। কোনো কোনো খাতার পৃষ্ঠার পুটে রঙ লাগানো থাকে। এগুলি সব ব্যবসায়ী খাতা। আবার স্কুল-কলেজের খাতাও আছে। সেগুলো নানা সাইজে হয়। রুলড্ অথবা শাদা। পাতলা কভার অথবা বোর্ড বাঁধাই। এই দুই ধরনের

খাতার ব্যবসায়ীরা এই কারখানার মালিকদের অর্ডার দিয়ে করিয়ে নেন। তাঁর মূলত বড়বাজার চিনাবাজারের মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী। কারখানার মালিকরা সেই-সব বড় বড় ব্যবসায়ীদের কাছে বাঁধা থাকেন। তিনি কাজ দেন, কাজ তামিল করেন বাঁধাই মালিকরা, তাঁদের কর্মচারিদের সহযোগে। এই মালিকরাও মূলত শ্রমিক। একজন শ্রমিকের চেয়েও তাঁকে বেশি পরিশ্রম করতে হয়। মাড়োয়ারি ব্যবসাদাররা হোল সেল-এ সব খাতা বিক্রি করেন। বাঁধাইয়ের উপাদান যোগান ব্যবসায়ী, মজুরি পান বাঁধাই মালিক। এই বাঁধাই মালিকদের এক একজনের চার পাঁচজন 'বাবু' আছেন, তাঁরা সারা বছর কাজ দেন। বাঁধাই মালিককে প্রতিদিন মাড়োয়াড়ির গদিতে সন্ধেবেলা যেতে হয়। তার অন্যথা হতে নেই। ধর্ণা দিতে নিত্যনতুন কাজের অর্ডার পান। শুক্রবারে পেমেণ্ট পান। ব্যবসায়ীটির ইচ্ছে খুশি রেট থাকে। তিনিই রেট নির্ধারিত করেন। খুব কম রেট সত্ত্বেও কাজ করতে হয়। কারণ, কাজের প্রতিযোগিতা খুব। কর্মচারিদের বসিয়ে রেখে পয়সা না দিয়ে স্বল্পলাভে কাজও করে থাকেন। রেট বাড়ালে ব্যবসায়ীটিই বাড়ান। প্রতি সপ্তাহে শুক্রবার যে পেমেণ্ট পান, তাও প্রতি সপ্তাহে পাওনার হিশেবের চেয়ে কম। বছরের শেষে চৈত্র মাসে হিশেব করে বাকি টাকাটা পান বাঁধাই মালিকেরা। ব্যবসায়ীটির কাছে হাজার হাজার টাকা পড়ে থাকে বাঁধাই মালিকের। ইচ্ছে থাকলেও ব্যবসায়ীটিকে প্রত্যাখ্যান করার উপায় থাকে না। অলিখিতভাবে বাঁধাই মালিক ব্যবসায়ীটির হাতের পুতুল হয়ে যান। স্বভাবতই মজুরির ওপর এই প্রত্যাঘাত নেমে আসে।

হিশেব-নিকেশ-জাতীয় খাতা বাঁধাইয়ের সঙ্গেই ব্যাঙ্ক ও অফিস আদালতের এক ধরনের খাতাশিল্প আছে। মালিকরা সরাসরি এসব কাজ পান না। এসব কাজ পান বড় বড় কনট্রাক্টররা; তাঁরা কাজটা কোটেশনের খেলায় ধরে নিয়ে, তার থেকে নিজের পার্সেণ্টেজ তুলে নিয়ে সাব কণ্ট্রাক্টরদের দিয়ে দেন। সাব কণ্ট্রাক্টরের তস্য সাব কণ্ট্রাক্টরও হয়। প্রত্যেকেই মাঝখানে নাফা নিয়ে নেন। বাঁধাইয়ের রেট হয় অতি নগণ্য। সেখানেও শ্রমিকরা মরেন।

স্কুল কলেজের খাতাশিল্পেও ঐ একই চেহারা।

বই বাঁধাইয়ে শ্রমিকদের উন্নতির অন্য কোনো চেহারা নেই। সব এক। পাবলিশররা বই ছাপান প্রেসে। ফর্মা আসে বাঁধাইখানায়। সংস্করণে যা ছাপা হয় সব ফর্মাই চলে আসে। পাবলিশারের অর্ডার মত বই বাঁধতে হয়। বিক্রির অনুপাতের হিশেবে পাবলিশার বই বাঁধার অর্ডার দেন। সেই মত কাজ করে দেন মালিকরা, শ্রমিক খাটিয়ে। বাকি বইয়ের ফর্মা সংরক্ষণের ব্যবস্থা বাঁধাই মালিককে করতে হয়। দশ বছর পরেও সে বইটির বাঁধাইয়ের অর্ডার হলে বাঁধিয়ে দিতে হবে।

কলেজ স্ট্রিট পাড়ার বইয়ের পাবলিশারদের মধ্যে প্রতিযোগিতা তলে তলে যথেষ্ট থাকে। কম পয়সায় বইটি ছাপিয়ে, বাঁধিয়ে প্রতিযোগিতা করতে হয়।

আর এটা বিজ্ঞাপনের যুগ। বিজ্ঞাপনের জন্যে একটা বড় বাজেট রাখতে হয়। বইটা বিক্রি করতে গেলে কম দাম রেখে, বিজ্ঞাপন দিয়ে বাজার ধরতে হয়। খবরের কাগজ, বাজারি সাময়িকপত্র বইটিকে পণ্য করে তুলতে অনেক টাকা খেয়ে নেয়। বইয়ের বেশি দাম রেখে বিজ্ঞাপন ব্যতিরেকে বই বিক্রি করা দুঃসাধ্য। এই দুটিকে প্রাধান্য দিতে গেলে প্রেস ও বাঁধাই শ্রমিকদের মারতে হবে, এটাই একমাত্র উপায় থাকে। তা ছাড়াও লেখকদের রয়ালটি দিতে হয়। অল্প কয়েকটি পাবলিশার ছাড়া লেখকদের রয়ালটির ব্যাপারে তেমন যত্নবান হতে পারেন না। স্কুল-কলেজের বইয়েরও বিজ্ঞাপনের খরচ আছে, ক্যানভাসের খরচ আছে।

এই একই ভাবে নানা সিজিন নিয়ে নানা বাঁধাই জাতীয়, বাঁধাই সম্পর্ক যুক্ত কাজ ঢুকে পড়ে সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে। নববর্ষের কাজ, দেওয়ালির কাজ, জানুয়ারি নববর্ষের কাজ, বইমেলার কাজ, স্কুল কলেজের সিজিনে কাজ—অথবা ডায়রির সিজিনে ডায়রির কাজ, ক্যালেণ্ডারের সিজিনে ক্যালেণ্ডারের কাজ, নানা ধরনের পাঞ্চিং, লেমিনেশন, ভার্নিস, লেবেল, জুতোর বাক্স, কার্টুন, ওষুধের প্যাকিং, খাম তৈরি, নানা ধরনের ফাইল তৈরির কাজ, নাম্বারিঙের কাজ, প্যাড বানানো, রি-বাইণ্ডিঙের কাজ হয়।

বাঁধাই মালিক-শ্রমিক শ্রেণী-সংঘর্ষ হতে পারে না। অধিকাংশ মালিক শ্রমিকের সমস্ত স্বভাব নিয়ে থাকেন। সংঘর্ষ হতে পারে বিজ্ঞাপনের সঙ্গে শ্রমিক মালিকদের। মালিকের সঙ্গে শ্রমিকদের সংঘাত নেই, মালিকেদের সঙ্গে পাবলিশার-ব্যবসায়ীদের সংঘাত নেই। বিজ্ঞাপনের সঙ্গে সংঘাত, তার কোনো ব্যক্তি-চরিত্র নেই, বিস্ময় এটাই। প্রতিযোগিতার সঙ্গে সংঘাত, তার কোনো ব্যক্তি-চরিত্র নেই। মানুষ শুধু দু-বেলা খেতে পাবে, এই খাদ্য সঞ্চয়ের তাড়নায়, কাজের নিশ্চয়তা তৈরি করতে সংগ্রাম করে বাড়তি কাজ করার নিশ্চয়তা তৈরি করতে চায়। দিন শুরুর থেকে রাত্রি পর্যন্ত কাজে কাজে কেটে যায় নীরবে। বিলুপ্ত এক নগরীর ধ্বংসস্তূপের মত অস্থানিক শহর কলকাতায়, সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে, অচলায়তন ঘিঞ্জি দুর্গন্ধ ভরা মলিনতায়, ভাঙাচোরা ছেঁড়াখোঁড়া বিদীর্ণতায়, আলো-আঁধারির রহস্যময়, বিস্ময় ছড়িয়ে বিছিয়ে বাহুরঙ্গে নিহিতে মিশে থাকে। রাত এভাবেই শেষ হয়, দিনান্ত মেশে এভাবেই রাত্রিতে। রাত-শেষের থেকেই দিন শুরু হয়ে যায়। দিনের ভেতরই যামিনীতে যাবার স্বভাব লুকিয়ে থাকে, রাতে থাকে দিনের আয়োজন।

এই দিন ও রাতের ভিতর মালিন্য বিদীর্ণতা রহস্যময়তা বিস্ময়ের প্রতি-ক্রিয়ায় বয়ঃসন্ধিপ্রাপ্ত মতি অস্থিরতায় কাটায়। শনিবারে মালিকরা বাড়ি চলে যাওয়ায় চারজন সবে কিশোর-পেরনো নব যুবক রবিবার সন্ধ্যায় একসঙ্গে হয়ে যায়। মতি এসেছে নীলু সবু কাদেরদের কারখানায়। এই কারখানার মালিক ইশা। ইশা গেছে তার বাড়িতে। কারখানার এই কম বয়সী তিন নবযুবক

রয়ে গেছে। এই বয়সের শ্রমিকরা হুট করে গ্রামের বাড়িতে যেতে পারে না। যেতে পয়সা লাগবে। তা ছাড়া তারা এখনো মিস্ত্রি হয়ে ওঠে নি, মালিকের মন জুগিয়ে চলতে হয়। মালিকের ইচ্ছে থাকে না, এরা হুট হুট বাড়ি যায়। বাড়ি গেলে মায়ের স্নেহ এখানে ফিরে আসতে বিলম্ব করে দেয়। মালিক বাড়ি গেলে কারখানায় থাকারও লোক চায়।

রবিবার ছুটির দিন। তবু কিছু কিছু কারখানায় কাজ হয়। আরো নির্জন অন্ধকার হয়ে পড়ে সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ড মানুষের ভিড় কমে যায়। সন্ধ্যায় আরো অন্ধকার।

সবু শীতলপাটির মেঝেতে চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে বিড়ি খায়। নীলু দেয়ালে পিঠ দিয়ে কাটিং মেশিনের কাছে বসে বসে মালিকের রেডিওটার কান মলে দূরের সেন্টার ধরে। অতি ক্ষীণ স্বরে রেডিওতে হিন্দি গান বাজে। শুনতে শুনতে গা দোলায়। 'এই, 'নাগিনার' গান হচ্ছে বে শালা কাদের !'

কাদের মাচার মইয়ের কাছে বসে বসে সামনে আয়না ধরে চুল আঁচড়াচ্ছিল। আয়না চিরুনি ফেলে উবু হয়ে এগিয়ে আসে নীলুর দিকে। রেডিওতে কান বাড়িয়ে দেয়। কাদেরের খুব সুন্দর চেহারা। ফর্সা গায়ের রঙ। মাথায় এক ঝাঁকা বাবরি চুল। নরম কচি কচি দুটি চোখ। ওদের সকলের থেকে কাদেরকে বেশি ছোট দেখায়।

কাদের কান সরিয়ে বলল 'ধ্যেৎ, এটা নাগিনার গান নয়।'

'যা, তুই জানিস না।'

'ভাল করে শুনে দ্যাখ না।'

নীলু রেডিওতে কান পাতে আরো ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে।

সবু চিৎ হওয়া থেকে উঠে বসে। সেও রেডিওতে কান পাতে।

তিনজনে রেডিও সেটে কান পেতে নীরবে গান শুনছে। মতির কিছুই ভাল লাগছে না। কোথাও যেন এক শূন্যতা। অবিরত ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করে বাজছে। সে বসেছিল দরজার কাছে, কাদেরের পাশে, আয়নার কাছে। কাদের আয়না রেখে চলে যেতে মতি আয়নাটা হাতে তুলে নেয়। নত হয়ে নিজের মুখ নিজে দেখে মত্ত।

তিনজনে রেডিওতে কান পেতে থাকে আর গান শেষ হয়ে যায়, কী ছবির গান, কেউ ধরতে পারে না।

সবু ইচ্ছে করে রেডিওর নবটা ঘুরিয়ে দেয়। সেণ্টার নাড়িয়ে দেয়। 'ধুস শালা এ অন্য গান।' কাদেরকে ঠেলা মেরে রেডিওর কাছ থেকে সরিয়ে দেয়।

সবুটা বদমাস। ওদের তিনজনের চেয়ে সবুর চেহারা ভাল। ওদের থেকে বড়ও দেখায়। এবং কাদেরকে মাঝে মাঝেই চড়-চাপড় মারে সবু। মাঝেসাঝে মতিরও পেছনে লাগে সবু। মতি গায়ে পাতে না।

'এই 'হাওয়া হাওয়া' হচ্ছে যে।' আনন্দ খুশিতে নীলুর চোখ ভরে ওঠে।

কাদের আবার হাঁটু মুড়ে রেডিওতে কান পেতে 'হাওয়া হাওয়া' গান শোনে। গা দোলায়।

সবু রেডিওতে কান পেতে 'হাওয়া হাওয়া' গানটা সত্যি হচ্ছে কিনা শুনে উঠে দাঁড়িয়ে নাচতে লাগে। কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে নাচে। কাদেরকে হাত ধরে টানে। কাদের নাচে যোগ দেয় না। কাদের উবু হয়ে বসে রেডিওতে কান পেতে গান শোনে। সবু নাচতে নাচতে মাঝে মাঝে কাদেরকে পা দিয়ে ঠেলা দিয়ে বিরক্ত করে। নীলু আর কাদের রেডিওতে কান পেতে আছে, আর সবু নেচে চলেছে।

আয়নার ভেতর থেকে গোটা মুখটা দেখছিল মতি। মতির গান শুনতে ভাল লাগছিল না, নাচতে ভাল লাগছিল না। আয়নায় মতি তার নিজের প্রতিবিম্ব ধরে রেখে নিজেকে দেখছিল। তার দৃষ্টিতে চোখ দুটি এসে মিশছিল। মুখের ছায়ার ভেতর নিজস্ব এক আস্বাদন তৈরি হচ্ছিল তার। তার চোখ দুটিও খুব সুন্দর। আয়নায় তার মুখের প্রতিবিম্বন সামনে নিয়ে সে থাকছিল। নিজেকে নিয়ে বড় ব্যস্ত গাঢ় মতি। নিজেকে দেখার ভেতর মগ্ন থাকে। আয়নায় নেমে এসেছে মতির মুখ। মতির কচি মুখ। হরিৎ চোখ। যে মুখটি দু-হাতে ধরে কমনীয়তা সাবল্য স্নিগ্ধতার আস্বাদ পাওয়া যেতে পারে!

নিজেকে ভালবাসতে ইচ্ছে করে মতির। মতি নিজেকে ভালবাসছে। আয়নায় নিজের মুখের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে সে। তারই মধ্যে এই মুখটা থাকে? এমন চোখ? এমন নাক? গোঁফের অস্পষ্ট রেখা দেখে। সে বড় হয়ে গেছে? এই ৩ সেদিনও সে ছোট ছিল। কত ছোটবেলায় মাকে ছেড়ে এসেছে। এখন বাড়ি গেলে মাকে আর তেমনভাবে পায় না মতি। সে বড় হয়ে গেছে বলে মায়ের কোলে চড়তে পারে না। মায়ের কোলের কাছে শোবার লোভ থাকলেও শুতে পারে না। লজ্জা এসে জড়ায়। সেই ছোট-বেলার মতি আর এখনকার মতি আলাদা দুই মতি। এর মাঝখানে মতির অনেকিছু হারিয়ে গেছে। কারখানার ভেতর কেটে গেল এই কটা বছর।

এতগুলি বছর তার নিয়ত অভিমানে অভিমানে কেটেছে। খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট চোখের ওপর ভেসে উঠলে খুব কষ্ট পেত। মা তাকে খেতে দিতে পারত না। ভাই দুটি কাঁদত। তার দাদা-দিদিও কাঁদত। মা মারতো। মতিকে কতবার মেরেছে। ওখান থেকে কারখানায় চলে এসে অভিমানে ছিঁড়ে-খুঁড়ে থাকত মতি। পাথরের মত ঘন হয়ে উঠত। সংসারের দুঃখ-মোচনের চেষ্টা ভাবনা সংসারছিন্ন হয়ে তাকে এখানে ধরে রেখেছে এতকাল। এতকাল তিল তিল অভিমানে থেকেছে। এখনো অভিমানে থাকছে। সে এখন পঞ্চাশ টাকা হপ্তা পায়। খেতে তিরিশ টাকা চলে যায়। বাকি কুড়ি টাকা জমিয়ে রেখে বাড়িতে যখন দু-তিন মাস অন্তর গেছে দুশো-তিনশো টাকা নিয়ে গেছে। এই তিন

মাস বাড়ি যায় নি মতি। বাড়তি সব টাকা সে খরচ করে ফেলেছে। নিজের জন্যে জামা প্যান্ট করেছে। সিনেমার নেশায় তাকে পেয়েছে। সপ্তাহে দুটো-তিনটে সিনেমা দেখছে এখন মতি।

মতি জানে, মিতাদি তার এই অবস্থা করেছে। মিতাদিকে দেখতে না পেলে বাঁচবে না, কথা বলতে না পারলে বাঁচবে না, মিতাদি তাকে ভাল না বাসলে বাঁচবে না। এই অবস্থায় পড়ে মতি সিনেমা দেখে পয়সা ওড়ায়। মিতাদি তাকে দেখা দেয়, আবার ইচ্ছে করে দেখা দেয় না বলে মতির কষ্ট হয়, সিনেমায় যায়, পয়সা ওড়ায়। মিতাদি তার সঙ্গে কথা বলে, আবার কথা বলতে চায় না, মতি মিতার সঙ্গে অনেক কথা বলতে চায়, অনেক কথা বলাটা তার আয়ত্তে আসে না বলে মতির ভীষণ কষ্ট হয়, সিনেমায় যায়, পয়সা ওড়ায়, বাড়ি মা ভাই বোন সব মিথ্যে হয়ে যায়। মিতাদি তাকে ভালবাসে, আবার ভাল-বাসতে চায় না, মতি মিতার অনেক ভালবাসা পেতে চায়, অনেক ভালবাসা সে পায় না বলে মতির ভীষণ রকম কষ্ট হয়, সিনেমায় যায়, পয়সা ওড়ায়, বাড়ি মা ভাই বোন সব মিথ্যে হয়ে যায়, নিজেই সব হয়ে ওঠে।

নতুন গানটা কী হচ্ছে শুনে নিয়ে সবু নাচছে আর কাদেরকে পা দিয়ে ঠেলা মেরে বিরক্ত করছে।

নীলু বলল 'আবে 'কিয়ামত সে কিয়ামত তক'-এর গান হচ্ছে। আয়।'

মতির গানটা শোনার লোভ হয়, কিন্তু আয়নায় নিজের ছায়া দেখে উঠে যেতে পারে না। নিজের ছায়াটা মতিকে ধরে রাখে। তেমন ভাবেই থাকে মতি। নিজের মুখ আয়নায় রেখে দেখছে। আর কিছুতে এত আনন্দ পাবে না মতি। মিতাদি যদি তার কাছে এখন আসত, তা হলে অন্য কথা। আর মিতাদির সম্পর্কের প্রতিক্রিয়াতেই এমন নিবিড় নিজের প্রতিবিম্ব নিজে দেখে। এবং দেখতে দেখতে নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলে যেন। মিতার সঙ্গে নিজের সংলাপ তৈরি করে। মিতারও সম্ভাব্য সংলাপ বানিয়ে দেয়। সে মিতাদিকে জানে, এই কথায় মিতাদি কী কথা বলতে পারে। কী কথায় বকুনি দেবে, কী কথায় উৎসাহ দেবে, জানে। কিন্তু মিতাদির সবটা জানে না। ভীষণ রহস্য লাগে তার।

রেডিওতে গানের প্রোগ্রাম শেষ হয়ে গেছে। সবু তেমনই নেচে চলেছিল। সে ওদের হাত ধরে তোলে, নাচতে বলে সঙ্গে। ওরাও নাচতে শুরু করে দেয়। সবু নাচতে নাচতে মতির কাছে এসে হাত ধরে টানে। নাচার দলে টানে। মতি যায় না, তেমনই আয়নার সামনে বসে থাকে। সবুরা নেচে চলে। গান শেষ হয়ে গেছে। ওরা নাচছে, আর ওদের মনের ভেতর অনেক গান ওরা তৈরি করে নিয়ে নাচে। সিনেমার নানা রঙিন দৃশ্য কল্পনায় এসে ভিড় করে। পা নেচে ওঠে, শরীর দুলে ওঠে। ক্রমশ তারা দুরন্ত হয়ে উঠছে। মুখে নানা শব্দ করছে। সবু গান গাইছে। তাদের পরণে লুঙ্গি, গায়ে ময়লা শার্ট।

নাচটা সব্ হঠাৎই থামিয়ে দেয়। তিনজনেই হাঁপিয়ে গেছে। শ্বাস পড়ছে দ্রুত। ঘেমে গেছে। মুখ জুড়ে ঘামের বিন্দু।

সবু বসে পড়ে বলল, 'শালা ইশা ব্যাটা এক্কেরে বাণ্ডোত !'

'কেন রে, গাল পাড়িস কেন মালিককে ?'

'গাল দেব না ? ও ব্যাটা একটা ঢ্যামনা। প্রথম ইশার ঘরে লাগি। দিন রাত খাটাত। এক বছর পেটভাতে, কুনো মাইনে দিল নি। আমিও ছেড়ে দিয়ে কালো মিয়ার ঘরে লাগনু। ভুলব নি, মায়ের অসুখের খপর এল, যেতে দিল নি। এখনো ছ-টাকা রোজ দিচ্ছে, কত দিন ধরে বলছি বাড়াও—দিচ্ছে নি। আমিও তালে আছি অন্য কুনো ঘরে লেগে যাব।'

নীলু বলল 'তুইও মোর জন্যে দেখিস রে।'

কাদের নিরীহ ও মুখচোরা, নিজের কথা বলতে পারে না।

সবু বিড়ি ধরায়।

নীলু সবুর বাঁ-হাঁটুতে চিবুক চেপে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল।

'তোর মায়ের ওটা কী রোগ ?'

'ভাঙা শরীর। বাপটা রাজমিস্ত্রির কাজ করত, চারতলার ভাড়া থিকে পড়ে ধড়ফড়িয়ে মরে গেল, আমি তখন মায়ের পেটে।'

'তোদের সংসারে খুব দুঃখ-কষ্ট হত ?' কাদেরও সবুর কাছে সরে যায়।

'সে আর বলতে। এখনো কষ্ট ! দাদা বিয়ে করে ভেন্ন। মাকে খেতে দেয় না। আমার উপুরে একটা বোন আছে। ঘরে গেলে, ভাবি আর দাদাকে দেখে আমার রাগ চড়ে। দাদাকে এই মেরে বসি। ভাবি মা-বুনের সঙ্গে ঝগড়া করে দাদাকে নিয়ে ভেন্ন হয়েছে। মায়ের সঙ্গে ভাবির কথাবার্তা বন্ধ। এমন মনে হয়'—

নীলু সবুর বুকে যেন মুখ গুঁজে দিতে চায়। 'আমার মা খুব ভাল জানিস !' নীলু আর কিছু বলতে পারে না।

কাদের সবুর হাঁটুতে হাত দিয়ে নাড়িয়ে অনুনয় করছে, একটা মনের কথা বলার জন্যে। নীলুর কথা শেষ হতে কাদেরের দিকে তাকাল সবু। কাদের বলল 'মা বাবুর বাড়িতে কাজ করে বলে, আমার খুব রাগ হয় !' তারপর কাদের নীরব হয়ে যায়।

নীলু আর কাদের নীরব হয়ে ঝুঁকে আছে সবুর দিকে। সবু তাকাল মতির দিকে। কাদেরকে ডান হাত দিয়ে ঠেলে দিল। 'যা ত আয়নাটা মতির কাছ থেকে নে আয়। তখন থেকে মুখ দেখছে শালা !'

কাদের এসে দাঁড়ায় মতির সামনে। হাত বাড়ায়। 'দে।' 'ভাগ।' ধমকায় কাদেরকে মতি।

মতি দেবে না বুঝে মতির পেছনের দিকে গিয়ে আয়নায় নিজের মুখটা দেখতে থাকে কাদের।

নীলু সোজা উঠে গিয়ে মতির থেকে আয়নাটা কেড়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আয়নায় নিজের মুখ দেখে।

মতির রাগ চড়তে থাকে। উঠে দাঁড়িয়ে আয়নাটা ছিনিয়ে নেয়। তেমনই বসে বসে মুখ দেখে আয়নায়।

সবু সটান এসে ঝাঁপিয়ে কেড়ে নেয় মতির হাত থেকে আয়নাটা। 'বাঞ্চোত, একা মুখ দেখবে?' তারিয়ে তারিয়ে আয়নায় নিজের মুখ দেখে। ডান পা দিয়ে ঠেলা মারে মতিকে।

মতির রাগ সপ্তমে চড়ে যায়। ঝাঁপিয়ে আয়নাটা কেড়ে নেয়। সবু কাড়াকাড়ি লাগিয়ে দেয়। মতি হাত পেছন নিয়ে আয়নাটাকে আড়াল করে রাখে। সবু ছিনিয়ে নিতে পারে না আয়নাটা।

সবু মতির বুকের ওপর ডান পা তুলে দাঁড়িয়েছে। আয়না না দিলে জোর লাথি মারবে। মতির ভীষণ রাগ হয়। আয়নাটাকে আছড়ে মারে মেঝেতে। আয়নাটা টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

চোখ জ্বলে ওঠে সবুর। লাফিয়ে মতির ঘাড়ের ওপর পড়ে। মতিও ফুঁসে উঠেছে। দুজনে একে অপরের গলা জড়িয়ে, মাটিতে পেড়ে ফেলতে চাচ্ছে। জোর লড়াই হচ্ছে। মতির গায়ে শক্তি খুব। কাদের মতির পেছনের দিকে এসে মতির চুল ধরে টানছে, খিমচে ধরছে পিঠের চামড়ায়। আয়না ভেঙে ফেলায় নিরীহ কাদেরও ক্ষেপে উঠেছে। মতিকে ধপাস করে মেঝেতে ফেলে দিয়ে বুকে চেপে বসে সবু। কাদের মতির মাথায় হরদম ঘুঁষি চালাচ্ছে। সবু পেটে বুকে ঘুঁষি চালাচ্ছে। নীলু তার পা দিয়ে মতির পায়ে থেঁতলে চলেছে। মতি দেখল, তিনজনেই তাকে বেদম মেরে চলেছে। তার সমস্ত শক্তি নিয়ে তিনজনের সঙ্গে লড়াই অসম্ভব। তিনজনের হাতে এখন মতি প্রতিরোধহীন মার খেয়ে যায়। এলোপাথাড়ি কিল ঘুঁষি লাথি চলছে। মতির মনে হয়, সে এ-রকম একটা জোরদার মার খেতে চেয়েছিল। তাকে কেউ মেরে মেরে, মেরে ফেললে বেশ হয়।

মতির গায়ে জ্বর। রাতে জ্বর আসে। রাতে সবু নীলু কাদের নিজেদের পয়সায় দুধ রুটি কিনে এনে খাওয়ায়। জ্বরের ট্যাবলেট কিনে খাওয়ায়। মতি মার খেতে খেতে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। তিন জন যেমন এলোপাথাড়ি মতিকে মারতে শুরু করে, তেমনি মারটা সহসা থেমে যায়। তারপর ওরা মতির কাছে মাফ চায়, হাতজোড় করে কাকুতি-মিনতি করে। রাতে ওরা ওদের ঘরে নিয়ে শুয়েছিল। সকাল হতে, কাজের ঘর থেকে হাসেমের ঘরের মাচায় তুলে দেয় ওরা তিনজন। লক্ষ্মী সাহার ঘরে মাচা নেই,

রুলিং ঘর, কাজের সময় ওখানে থাকা যায় না। হাসেমের ঘরে কাজ নেই বলে এখানে রেখেছে সবুরা। লক্ষ্মী সাহা আর কারিগর বিজয় মাচার নীচে দাঁড়িয়ে দেখে গেছে মতিকে, তারপর কাজে বসেছে। মালিক গজ গজ করছিল। মতির ভালই লাগছে। মতির কিছু একটা হয়েছে, এবার বোঝাতে পারছে মতি। সবুদের ওপর কোনো রাগ নেই মতির। গায়ে জ্বর, সারা শরীর জুড়ে ব্যথা। উঠতে পারছে না, বেশ লাগছে।

মতি শুয়ে শুয়ে ঠিক গন্ধটা পেল। আরো নিঃসাড় হয়ে উঠল সে। এবং চোখ বুজিয়ে ফেলল। মিতাদির গায়ে মাখা এক ধরনের সুগন্ধি। সে আশা করে বসে ছিল, মিতাদি শুনলেই তার কাছে ছুটে আসবে।

মইয়ের ওপর শব্দ। সুগন্ধিটা এক রাশ হয়ে উঠে এল মাচায়।

কপালে শীতল নরম হাত। 'কী রে এসব কি শুনি! ও মনা, মনা রে! —গায়ে জ্বর ভরা?'

মিতা মতির মাথার চুলে বাঁ-হাত বুলোয়। তার মুখ নেমে আসে মতির মুখের দিকে। বুকে ডান হাত বুলোয়।

মতি স্নেহস্পর্শে ভরে ওঠে।

'তুই সোনাটা এমন কাণ্ড বাঁধালে আমার কি ভাল লাগে?' মিতা, মতিকে চোখ বুঁজে পড়ে থাকতে দেখে, মৃত্যু আসন্ন এমন একটা সহসা আঘাতে ভেঙে পড়ে। তার স্বামীর মৃত্যু-দৃশ্য সে দেখেছে, বাংলাদেশে, অন্য রাষ্ট্রের প্রকৃতি নিসর্গের সামনে ঘরের খোলা দরজার সামনে বসে। গত পরশু মরে যায়, এই গলিরই একটা কারখানার মালিক জাভেদ মিয়া। তার স্বামীর সঙ্গে জাভেদের হুবহু মিল। সে মরে গেল রক্তবমি করে। আর মতি এমন পড়ে আছে তার চোখের সামনে। মতি নরম ছেলেটা, তার বুক জুড়ে থাকে। মিতা পাগলিনী-প্রায়। তার বিস্রস্ত আঁচল।

চোখ বুজে মিতাদিকে না দেখে থাকতে পারল না মতি। চোখ দুটি কড়ির মত মেলে ধরে। এবং ঠোঁটে এসে লাগে হালকা একটা হাসি।

'এই ত জেগেছিস! হাসছিস যে!' মতিকে চোখ মেলতে দেখে, হাসতে দেখে, মতির বুকে মুখ ঘষে মিতা। 'মনা রে, তুই এমন করিস কেন? তুই কষ্ট পেলে আমার কি কষ্ট হয় না?'

'তুমি আসবে আমি জানতাম!'

'জানলি কী করে?'

'মন বলছিল।'

'খুব লেগেছে?'

'না। তবে গায়ে ব্যথা, জ্বর।'

'তোর যদি কিছু হতো?'

মতি ম্লান হাসে। রহস্যময় হাসি।

মিতা মতির ডান হাতটা দু-হাতে তুলে নিয়ে ঠোঁটে ঘষে। মতির হাতের ভেতর থেকে মিতা তার ঠোঁট-দুটি তুলে ধরতে, চোখের আড়াল সরে যায়। মিতা দেখে মতিকে। 'এ যে দেখছি, মুখটা তোর কি শুকনো।' হাত ছেড়ে মতির কপালে বাঁ-হাত বুলোয়। নুয়ে পড়ে মতিকে দেখছে। মুখ ডুবিয়ে মতিকে চুমু খায় মিতা। 'মনা, মনা রে!'

মিতার নুয়ে পড়া মুখটা ডান হাতে রেখে মতি অবাক চোখে মিতাকে দেখছে। অনেকক্ষণ এভাবে দেখার তার সাধ। মিতার মুখ মতির হাতের ওপর নুয়ে এসেছে। ভার হয়ে মতিকে ভরে দিতে চায়। নিশ্চলতায় মিতার প্রতিমা গড়ন ভেঙে আছে রক্তশরীরে। মতির দেখার বিস্ময় প্রলম্বিত। মতির ডান করতলে মিতার চিবুক ডুবে গেছে, নেমে নুয়ে এসেছে সারা মুখ। চিবুক রাখা মতির ডান হাতটা মিতা তার ডান হাত দিয়ে চেপে ধরে। যেন মতির ডান হাতে ধরা মুখটার পরিপূরক সহযোগ একটা গড়ন ভঙ্গি মতিকে দিচ্ছে।

মতির হাত থেকে মুখটা সরিয়ে, মতির হাতটা ডান মুঠোয় ভরে মোচড়ায় মিতা। যেন মতির হাতটা হাতে পিষে গুঁড়িয়ে ফেলবে। তারপর হাতটা ছাড়িয়ে মতির দিকে পিঠ রেখে উল্টোমুখো বসে। হাঁটু দুটোর ফাঁকে মুখটা নামিয়ে দেয়।

মতি দেখছিল মিতাকে। মতি কিছু কথা বলে না। মতির অভিমান শুরু হয়। মিতাদি এমন কষ্টের ভঙ্গিতে থাকে কেন?

মিতা হাঁটু দুটোর ফাঁকে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

মতি ডাকল—'দিদি!'

মিতা আরো কান্নায় ভরে যায়, মতির এই সম্বোধনের প্রতিক্রিয়ায়। মুখ তুলে পাশ ফিরে বলে 'তোর আমি দিদি নই, তুই আমার কেউ নোস।'

'দিদি!' মতি অসহায়ের মত হাত বাড়ায়।

মিতা ঘুরে এসে মতির হাতটা হাতে চেপে ধরে। বুকের ভেতর নিয়ে নেয়। 'তুই কি আমাকে মারতে চাস মনা?'

'তুমি কাঁদছ কেন?' রাগে হাতটা ছাড়িয়ে নেয় মতি। চিৎ হয়ে শুয়েছিল, পাশ ফিরে মিতার দিকে পিঠ ফেরায়।

'কী হল, রাগ করছিস মনা?'

মতি কোনো উত্তর করে না।

'মতি মতি!'

আবার কান্না ব্যেপে আসে মিতার। ভিজে অস্পষ্ট চোখে মতিকে দেখছে। মতি কাঁচা ছেলে। এ কি করছে সে? চেষ্টা করে কান্না থামাতে চায় মিতা। কান্না থামে না। আঁচলে যত চোখ মোছে, ততই চোখ ভরে আসে জলে। সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে কাজ শুরু হয়ে গেছে। কাজের নানা শব্দ ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। সেদিকে কান দিয়ে স্বাভাবিক শান্ত হতে চায় মিতা। এই নিভৃতি,

দুঃখ-চারণা দুঃখযাপনের অবকাশের সে কেউ নয় মনে করে মিতা। মতি শুয়ে আছে মতির মত. মতির কাছে। এখানে সে বসে কী করবে? দুঃখ অনুভব করলে দুঃখ আরো বাড়বে। মিতাকে পেড়ে ফেলবে দুঃখের পাথর। নিজেকে বোঝাতে লাগে মিতা। নিজেকে প্রবোধ দিতে নিজের সঙ্গে নিজে কথা তৈরি করে। যেন মাতৃত্বের ভঙ্গি ও স্বরে মতিকে ভোলাতে চায়। ছড়ায় গল্পে যেমন শিশুকে মা ভোলায়। মতিকে তেমন ভোলাতে চায় মিতা। অনেকটা শিশু হলে হয়তো কোলে তুলে নিত। হাঁটু দুলিয়ে দুলিয়ে ছড়া কাটত। গান গাইত। কিন্তু মতি শিশু নয়, সারল্য আছে। মতির সারল্যের ভেতর খেলতে পারে মিতা। মিথ্যেকে, সত্যি বোঝাতে পারে, মতি সত্যি ভেবে নিতে পারে। মিতা আসলে মিথ্যা মিথ্যা। একটা মিথ্যায় ভরা রমণী। মৃত স্বামী মিথ্যে, সংসার মিথ্যে, ফেলে আসা দেশ মিথ্যে।

'এই মতি পাশ ফের, না হলে তোর দিদির মরা মুখ দেখবি।' এই কথাটা বলে ফেলার জোরে মিতার ঠোঁটে হালকা হাসি মিতাকে স্বাভাবিকতা দেয়।

মতি পাশ ফিরে দেখে বলে 'তুমি যাও, তুমি আমার কেউ নও।'

'কেউ নই ত। তুই কি আমার জন্যে ভাবিস? মরলাম কি বাঁচলাম!'

মতি এই কথার কোনো উত্তর দিতে পারে না। চিৎ হয়ে মিতাকে দেখে।

'মারামারি করলি কেন? আমার ভাই মারামারি করতে পারে না।'

অবাক বিস্ময়ে মিতাকে দেখে মতি।

'আমি প্রতিদিন ট্রেন থেকে নেমে মজিদ মিয়ার কারখানায় কাজ করব, তার পর ছুটি হলে চলে যাব ট্রেন ধরে। কারো সঙ্গে দেখা করার আমার দরকার নেই।'

'না, আসতে হবে ত।' মিতার হাতটায় খামচে নেয় মতি। 'উহু দিদিকে ভাই এমন জোরে খামচায় নাকি? কী দস্যু রে!'

'ফের ও কথা যদি বল, আরো জোরে খামচাব।'

মতি উঠে বসতে যায়। মিতা তাকে বাধা দেয় হাত বাড়িয়ে 'জ্বর নিয়ে শুয়ে থাক সোনা, উঠিস না।'

মিতার নিষেধ অবহেলা করে উঠে বসল না মতি। মতির স্বভাবই এ রকম। হাতটা বাড়িয়ে দেয় মিতার দিকে।

'হাতটা ধর।'

'এই ত ধরলাম, কি জ্বর রে!'

মতি ম্লান হাসে। 'তুমি আরো থাকো।'

'আর আমাকে কাজে যেতে হবে না? বাঃ বেশ ত!' মিতা অসামান্য এক মায়ার ভেতর মতিকে দেখে। এবং মিতার মুখটার ডান পাশে বাইরে দরজা বেয়ে আসা আলোয় আলোকিত। ডান দিকের চুলে আলোর রেখা এসে মিশেছে। হাত দুটি মরাল গ্রীবার মত প্রসন্ন। চোখ দুটি আয়ত করে ওঠে

মতিকে দেখায়। মতিকে ছেড়ে যেতে তার মন চাচ্ছে না। অথচ সে চলে যেতে চায়, মতিকে এটা বোঝাতে হচ্ছে। অনেকক্ষণ এমন মতিকে নিয়ে থাকতে চেয়েছে। এবং বুকের ভেতর জড়িয়ে নেবার মন হয়। মনে হয় সমস্ত সত্তা জুড়ে মতির সঙ্গে মিশে যায়। কিন্তু মতি মতি, মতি, মতিও মানুষ। মতিরও মন আছে, মতিরও বোধ আছে। মতির বয়স কম। মতি কত কিছু জানে না। মতিকে বার বার অস্বীকাব করে, আবার মতিকে ছাড়া তার এক মুহূর্ত চলবে না মনে হয়। মিতা জানে পরিপূর্ণ পুরুষ হয়েই মতি তাকে ছুঁতে পারে। মিতা নিজের দেহের গন্ধ নিজে পায়। নিজের দেহের গন্ধে নিজে মবে থাকে।

সমস্ত সত্তা জুড়ে বিস্ময় নেমে এসেছে মতির। তার যৌবনের দরজা খুলে গেছে। সে চমকিত, আলোড়িত। সে মিতাকে দিদি বলে মানে। এবং নাবী বলে ততোধিক জানে। স্পর্শের ভেতর। মিতার ইচ্ছার ভেতর দিদিও নারী হয়ে উঠতে পাবে এই স্বাদ তাকে সারাক্ষণ জাগিয়ে রাখে। সে যুক্তিবুদ্ধি মানে না। সে কিছুই বিচার করতে জানে না। অনুভবের সত্যিটুকু সে জানে এবং মানে। সে আরো অনেকের হাতে মার খেতে পারে, মবে যেতে পাবে, কিন্তু এই সত্যিটুকু হারিয়ে ফেলতে পারে না। মিতাদি তার একি করল? বেশ ত ছিল। কাজ করত সারাদিন। মাঝে মাঝে সিনেমা যেত। দু তিন মাস অন্তর বাড়ি যেত। দারিদ্র্য থেকে বেরতে না পারার অভিমান ও বেরিয়ে যাবার প্রাণপণ সমান উদ্যোগে সে সাধারণ হয়ে থাকত। অসামান্য হয়ে ওঠার স্বপ্নসফল আত্মবিনাশ এটা যেন সে চেয়েছে। কিছু জানে না সে। কারো কাছে সে কোনো কিছু যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারবে না। সে হারিয়ে যেতে চায়।

'আহ্! হাতটা ছাড় মনা, এবার যেতে দে।'

মতি কোনো উত্তর দিল না। মিতার হাতটা ধরে রাখে। মতি মেলাতে পারে না, মিতা এসেই কেমন চঞ্চলা হয়ে উঠল, কত যেন ভালবাসে, সেই টানে ছুটে এসেছে। আর এখন চলে যেতে চায়, নির্দয়ভাবে। মিতার এই কথার স্বরের ভেতর মতিকে অস্বীকারের ভঙ্গী। যেন মতিকে নুয়ে পড়ে চুমু খাওয়ার সে কেউ নয়। যেন মতির হাতটা নিয়ে বুকে চেপে ধরার কেউ নয়। মতি আহত হয় এই বিপরীত ব্যবহারে। এই ব্যবহারের ভেতর মতি আরো টুকরো টুকরো হয়ে যায়। আবার মিতার কথার যাদুর মধ্যে পাল্টা কথা তৈরি করতে পারে না। সত্যি অভিমানে সে ভেঙে থাকে, সত্যি ব্যথা সে জানিয়ে বসে।

'জোর করিস নে মতি! তোর কাছে বসে থাকতে কি আমার ভাল লাগে না? এবার জোর করলে এবার বাড়িতে বসে থাকব। আমার দেওররা ঠিক খাওয়াবে।'

'থাক না, আমার কি!'

'আর তোকে পাব না যে!'

'পাবে না!'

'দিদির ভাইয়ের জন্যে মন কেমন করবে না ?'

'করলে, করবে !'

'ভাবি কথা ! করলে কববে !' জিভ ভ্যাংচায় মিতা।

'তোর যদি জ্বর না হত, আজ ডান্ডা মেরে তোর মাথা ভাঙতাম। মারামারি করে বেড়াস !'

'বেশ কবি !' বাগে ফুঁসতে থাকে মতি।

'আমাকে বিষ খেতে হবে।'

'খাও না, আমাব কি।'

'আর ত আমাকে তুই দেখতে পাবি না !'

'পাব না, পাব না।'

'তুই এত ঝগড়া করতে কোথা থেকে শিখলি রে। দিদিদের সঙ্গে মুখে মুখে এমন কথা বলতে হয় ?'

মতি আব উত্তর করে না।

'আমাব দু চোখ যেদিকে যায়, চলে যাব।' মিতা সত্যি ফুঁপিয়ে ওঠে। কেন কাঁদে মিতা ? মতির কি মরণ দেখে ? মতির মরণে তার কি যায়-আসে। এমন দীর্ণ অন্ধকারতায় কাদার তালের মত মতি হস্তগত হওয়ায় কি তার এই আনন্দাশ্রু ? দুটোবই প্রতিক্রিয়া মিতার মন ও শরীর অনুভব করে। মিতা দোলাচল। দ্বৈতসত্তার ভেতর এক নারী অবিরত চলাচল করে। ঝড়ের রাতে বিদ্যুৎচমকের মত দুর্যোগে আঘাত ও আলোর প্রভায় ভাঙে ও চমকিত হয়। চমকানি অল্পক্ষণ, কিন্তু সমস্ত সত্তাকে নাড়িয়ে দিতে পারায় যথেষ্ট।

'কাঁদছ কেন ?' ভয়ঙ্কর গলায় মতি গর্জে ওঠে।

মতির এই স্বরে চমকে ওঠে মিতা। 'অত ভারী গলায় বকুনি দিস যে ! আমার কান্না পেলে কাঁদব না ?' আঁচলে চোখ মোছে মিতা। হাসি মুখে মতির দিকে তাকায়। 'কী দেখছিস অমন করে ? আমাকে দেখছিস ? আমি কেমন ?'

'তুমি খুব ভাল।'

'এই জন্যে তোর সঙ্গে আমার পটে। তোব জন্যে আমার খুব চিন্তা হয় রে। তোর সঙ্গে কোথাও বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করে। তোর রাগ দেখে আমার খুব ভয় হয়। এত রাগ কেন তোর ?'

মতি এই কথা শুনে মিটি মিটি হাসে।

'হাসছিস যে !'

'হাসি পেল তাই হাসছি। তোমাকে দেখছি।'

'অত দেখতে হবে না। দেখি তোর কত জ্বর ?' কপালে হাত দিয়ে দেখে মিতা। 'জ্বর বেশ আছে।'

মতি নিঃসাড়ে পড়ে থাকে। তার আরো জ্বরের ঘোরের ভেতর মিতাদিকে দেখতে চায়।

মিতা আলগা খোঁপা ভেঙে খোঁপা বাঁধে বসে বসে।

মতি অবাক হয়ে দেখে মিতাকে।

মাচার দেয়ালে ছোট একটা আয়না আছে, তার সামনে মিতা নুয়ে পড়ল। হাত দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে আর একবার দেখল। তারপর সরে এসে ফ্রেমের ব্যাগটা বাঁধে তুলে নিল। 'চলি রে। একদম ওঠার চেষ্টা করবি না।'

মিতা মইয়ের খোয়ার ওপর পা দুটো নামিয়ে দেয়। মাথাটা কেমন ঘুরে ওঠে। স্মৃতিদিনের কথা মনে আসে। দিপু পেটে থাকার অনুভূতি তাকে এখন ছলনা করে। হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিদিন মুহূর্তে এসে তাকে নাড়িয়ে দিয়ে যায়।

মাচার নীচে একটু অস্বাভাবিক নড়াচড়া ও দরজায় পদশব্দ শুনল ওরা। মিতা ও সবিতা সচকিত ও উৎকর্ণ হল। মিতার কাজের সঙ্গী সবিতা। ওরা মাচার ওপর ফর্মা সেলাইয়ের কাজ করছিল। নীচে কাজ করছিল পুরুষ শ্রমিকরা। ওরা বই বাঁধাই করে দলবদ্ধ সহযোগে। ওরা দুজনে একই ভাবে, একই ভঙ্গিতে, একই সময়ে মাচার প্রান্তে এসে মুখ বাড়াল। দেখেই ফিরে এল নিজের কাজের জায়গায়। কৌতুক মজা খেলে গেল চোখে-মুখে। মালিক মজিদ তার বউকে সঙ্গে নিয়ে কারখানায় ঢুকল। শনিবার বাড়ি গিয়েছিল মজিদ। রবিবার কাটিয়ে সোমবার আসে। আজ বউকে সঙ্গে এনেছে।

মিতা ও সবিতার হাতের কাজ বন্ধ। মিতা জানে, তাদের দুজনের কৌতুক জন্মানোর একটাই উৎস, মজিদের বউয়ের শাড়িপরা ও আড়ঘোমটা দেখে। মিতার মুহূর্তের কাছে ধরা পড়াটাই তার জীবন। তার জীবনটা সকালবেলা পরিপাটি করে বিছানা ঝেড়ে রাতে শোয়ার আরামের প্রস্তুতি পরিকল্পনায় থাকে না। তার সেই মুহূর্তে যদি বিষাদদশা হয়, সে তার মধ্যে ভেঙে মুচড়ে থেকে যেতে পারে। থেকে যেতে পারে মুহূর্তের দুঃখের ভেতর। মুহূর্তে উঠে আসা স্মৃতিদিনের চারণার ভেতর, বিদীর্ণতায়। এই মুহূর্তে যা গড়ে উঠছে তাদের চোখের দেখায়, তাকে ফেলে রেখে, তার জীবনের শূন্যতা, বিচ্ছেদ, অপ্রাপ্তির অসহনীয়তা গোপন রাখে। তারা যেন উচ্ছল জীবন পেয়েছে, এই মুহূর্তের সঞ্চারমান কৌতুক সে কথা বলে। মতি জ্বর নিয়ে একা মাচায় শুয়ে আছে অন্য এক কারখানায়, এটা মনে রেখেও, মিতা উচ্ছল হাসিতে ভরে ওঠে। এটা স্বার্থপরতা, মিতা একে এড়াতে পারে না। এটাও তার একরকম জীবন।

এক হাতে মুখ টিপে ধরে মিতা, অন্য হাতে সবিতাকে ঠেলা দিয়ে সবিতার কৌতুককে সহযোগিতা করে। এমনটা সবিতাও করে। নিঃশব্দ হাসিতে লুটিয়ে পড়ার মত অবস্থা হয় মিতার। অনেকক্ষণ হাসি-কৌতুকে থাকতে

চাওয়ার ইচ্ছা ও সহযোগিতা গড়ে ওঠে তাদের। তাদের এই ভঙ্গিতে কৌতুকটাই প্রধান, কৌতুকের উৎস গৌণ থেকে যায়। এবং তারা এখন দুজনে মুখোমুখি নিঃশব্দে হাসতে হাসতে, লুটিয়ে পড়তে পড়তে, কত কিছু মিথ্যে করে দেয়, মালিকের সঙ্গে সবিতার সম্পর্ক মিথ্যে করে দেয়, মিথ্যে হয় মিতার সঙ্গে মতির সম্পর্ক। বিচ্ছেদ বিরহের ভেতর প্রেমিকা রমণীর প্রেমিকের ভাবনা নকশি কাঁথায় মিশে যাওয়ার নেই। তারা কখনো কখনো মুহূর্তের নিষ্ঠুরতায় চলে যেতে পারে।

দুজনে লুটিয়ে পড়লে শরীর খলবল করে ওঠে তাদের। এবং একে-অপরে তারা খামচাখামচি করে। খামচা-খামচির তীব্রতায় প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে তারা। আঁচল টানাটানি করে। শরীরের শক্তি লাগিয়ে এ-ওকে চেপে ধরে, ও-একে। এমন করতে করতে মারামারির কষ্ট পেল যখন, তখন তারা একে-অপরকে ছেড়ে দিল। তারপর তারা দুজন মাচার ফুটোয় উপুড় হয়ে নীচের কাণ্ডকারখানায় চোখ রাখে।

আসলে মিতারা মজিদের বউকে নিয়ে কৌতুক পেতে চেয়েছে, মজিদের বউ তত কৌতুকের না। মজিদ ও তার বউ নীচে আছে। মজিদের চোখে কোথাও তার বউয়ের অসঙ্গতির লেশমাত্র ধরা পড়ছে না। মজিদের কাছে স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ। ফুটোতে এমন দেখার বাস্তবতায় কৌতুক তাদের ছেড়ে চলে যায়।

তারপর তারা তাদের অসংলগ্ন কাপড়-চোপড় স্থিতশোভন করতে লাগে। একা একা হয়ে যায়। দুজনের একটি করে পা একসঙ্গে বেঁধে সহযোগে দৌড়ে ঝোলানো বিস্কুট খাওয়ার প্রতিযোগিতায় তারা যেন মিলিত ছিল। এখন তারা বিচ্ছিন্ন হয়। তখন মিতার মনে সবিতার প্রতি রাগ বিদ্বেষ প্রতিহিংসা এসে মেশে, যেমন স্বাভাবিকতায়। একজন অসুস্থ হয়ে পড়লে সে অন্য কথা ছিল। অন্যজন তাকে সেবা করত—সেটা আলাদা একটা মুহূর্ত। মিতা বা সবিতার রক্তের ভেতর যে স্নেহ-সেবা হৃদ্যতা সেগুলো তাকে এসব করাবে। বিপরীত-ভাবে এই মুহূর্তের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে তারা। মিতা বিশ্বাস করে, জাভেদ মিয়া চোদ্দর তিনের গলির কারখানায় কয়েকদিন আগেও বেঁচে ছিল, তিন দিন হল মরে গেছে। কারো কোনো কিছু এসে যায় নি তাতে। একটা সময় কেউ ভাবে হয়তো। মিতারও কখনো মনে পড়ে। লোকটা তার স্বামীর মত দেখতে হুবহু। প্রতিদিন মুখ বাড়িয়ে দেখতে যেত মিতা। কিন্তু আজ আর নেই লোকটা। মিতার হাসিকৌতুক কেড়ে নিল না জাভেদ মিয়ার অবর্ত-মানতা। মিতা জানে, কোনো সময়ে জাভেদ মিয়ার মুখটার জন্যে, তার স্বামীর মতই বিগত স্মৃতিদিনের অবর্তমানতার বেদনায় টলমল করে উঠবে। সেটাও একটা মুহূর্ত—সেটা সেই সময়ের জীবন। কেননা তার রক্ত প্রেম জেনেছে, সুখস্মৃতি তার সঞ্চয়ে আছে—সেই মুহূর্তে শোকে ভেঙে পড়বে বলে এখনকার কৌতুক অথবা সবিতার সঙ্গে রেষারেষির ভেতর ঢুকে থাকা আটকায় না।

মিতা একটু আগেই মতির কাছে কেঁদেছিল। কেঁদেছিল, রক্তে তার কান্নার স্মৃতিসঞ্চয় ছিল বলে। সে চুমু খেয়েছিল তার মধ্যে প্রেমাতি আছে বলে। মুহূর্তের প্রেমবন্ধন তাকে এমন নুইয়েছে। একটু আগেই সে হাসল। এবং মতি যে জ্বর ও গায়ে ব্যথা নিয়ে শুয়ে আছে, তার নিজস্ব মুহূর্তের জীবন এসব মানে না। এতক্ষণ এত হাসির প্রতিক্রিয়ার মুহূর্তও আর এক রকম। টুকরো টুকরো নানারকম স্ববিরোধ মুহূর্ত এসে জোড়া লাগে তাদের জীবনে। কেননা মিতার বর্তমানতাই সমস্ত কিছু। অন্য দেশ রাষ্ট্রে তার স্বামী, দাম্পত্যস্মৃতি, প্রকৃতি, নদী-নালা, গ্রামভূমি, কীটপতঙ্গ, পোকামাকড়, রেখে এসেছে। নিজস্ব যাপন রেখে এসেছে। এ যাপন বর্তমানতা, সমগ্র নয়। এ জীবনে খণ্ড খণ্ড অন্ধকারতা তার সঙ্গে এসে মেশে। সে স্খলিত, শিকড়বিহীন। সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ড তার প্রকৃত আধার হতে পারে। মৃত কোনো ধ্বংসস্তূপ নগরীর অন্ধকারতার সঙ্গে সহসংযোগ পেয়ে যায়।

নীচে থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। 'এই যে দিদিরা, নীচে নতুন লোক কে এসেছে, দেখলেন না ?'

সবিতা জিজ্ঞাসা করল 'কে এসেছে দাদা ? কে এসেছে দাদা ? আপনি কখন এলেন ?'

'একটু আগে এলাম। সঙ্গে একজনকে এনেছি।' মজিদ মিয়া নীচে থেকে কথা বলে।

মিতা হামাগুড়ি দিয়ে মাচার প্রান্তে আসে। 'তাই ত, ওমা, বৌদিকে এনেছেন ? বৌদি এলেন, না জানালে আমরা কি করে জানব বলুন !' মিতা দেখল, মজিদের বউ নীচে, কাটিং মেশিনের পাশে দাঁড়িয়ে আড়ঘোমটায় হাসছে। মিতার পাশে সবিতাও হামাগুড়ি দিয়ে এসে নীচে মুখ বাড়িয়েছে। তাদের চোখে ধরা পড়ে নীচের সমস্ত মানুষজন। মজিদ জলিল মিয়া, দুই সাগরেদ, আর একজন কারিগর, আর বয় আছে। তারা মজিদের বউকে শুধু দেখছিল না, দেখছিল আর আর পুরুষদের। তারা হুটহাট দেখার এমন সুযোগ পায় না, দেখার পরিস্থিতি তৈরি হয়, নয়তো সম্ভাব্য পরিস্থিতি তৈরি করে নিয়ে দেখে। এটা আর এক মুহূর্তের ছোঁয়ায় তাদের আকাঙ্ক্ষা-লাঞ্ছন হয় তারা জানে। তবুও।

মিতা উদ্যোগ নেয় নীচে নামার। মই বেয়ে মিতা নামে, তার গায়ে গায়ে সবিতাও নামে।

মিতা মজিদের বউয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। মজিদের বউয়ের মুখে হালকা একটা হাসি গেঁথে আছে, সহধর্মী নারীত্বের প্রভাবে। এ মুহূর্তে সে নায়িকা, গ্রামের এই দাম্পত্য, অপত্যস্নেহের জননীত্বের অভ্যাস ও প্রাচীনতায় অনেকখানি গৌরবান্বিত অভিব্যক্তিতে ভরে থাকে সে। এবং সহ-সখী-সহিষ্ণুতা তার ব্যক্ত হাসিতে ধরা থাকে।

কৌতুকের খেলায় নেমে এসেছিল মিতা। মজিদের বউয়ের রূপ ও দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে সৌজন্য, উদারতা, মজিদের বউকে এক ব্যক্তিত্ব দেয়। মিতা দেখল বউটি খুব সুন্দর একটা দামি শাড়ি পরেছে। গুছিয়ে পরতে না পারুক, তার ভেতর শরীরটা ত খাঁটি! এবং সুখী এক অভিব্যক্তি ধরা আছে তার মধ্যে। মিতা বউটার হাত ধরে 'ওমা, বৌদিকে ত খুব সুন্দর দেখতে!' বলে দাঁড়ায়। 'সবিতা দ্যাখ, বৌদি কি সুন্দর দেখতে! ও দাদা, আপনার এমন রূপের বউ এতদিন লুকিয়ে রেখেছিলেন?' মজিদের বউয়ের হাত ছেড়ে দিয়ে পাশ ফিরে মজিদকে উদ্দেশ করে মিতা।

মজিদ নীরব হাসে। মিতাকেই দেখছে।

বউটা মিতার হাতটা টেনে নেয়। টানে সরে আসে মিতা বউটার কাছে। এবং ডান হাতে রাখা একখিলি পান গুঁজে দেয় মিতার হাতে।

'ওমা পান দিলে! জর্দা নেই ত?'

মাথা নাড়ে বউটা। না জানায়। কথা বলে না।

'খয়ের দেয়া?'

হ্যাঁ জানায় মাথা ঝাঁকিয়ে বউটি।

সবিতা পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। 'দাদার বউ বলে কথা, খারাপ হয়ে পারে!'

'এ নে, পানটা তুই খা। আমার খেতে এখন মন চাচ্ছে না', মিতা সবিতাকে পানের খিলি বাড়িয়ে দেয়।

সবিতা নির্দ্বিধায় পানটা মুখে পুরে দেয়। এই দেখে বউটা আন্তরিকতায় হেসে ওঠে। সবিতারও হাত ধরে টানে কাছের দিকে। 'বসো দিদি।'

'না, না বৌদি—আপনি এই এলেন, জিরোন। আমাদের কাজ পড়ে আছে।' মিতা পেছিয়ে আসতে চায়।

মজিদের বউয়ের গালভরা পান। লাল পিকে কলকল করছে মুখ। জর্দার ডিবে থেকে জর্দা নিয়ে মুখে ফেলল। সুগন্ধি জর্দার গন্ধে ম ম করে উঠল বাতাস।

মিতা আবার এগিয়ে এসে গায়ে হাত দিল বউটার। 'আপনার নাম কি বৌদি?'

'গুলনাহার বেগম।' ফিক করে হেসে ফেলে মজিদের বউ।

'এত নাম জেনে, আলাপ-পরিচয় করে কী হবে দিদিরা! বউ থাকবে ত মোটে দুদিন। প্রতিদিন কি আর পাবেন?'—মজিদ তাদের দিকে এগিয়ে এসে বলে।

মিতা বলে 'কেন, রেখে দিন না। প্রতিদিন বৌদিকে দেখতে পাবেন।'

সহসা মিতার মুখ চেপে ধরে গুলনাহার। লজ্জায় লাল হয়ে যায়। টকটকে সিঁদুরের মত মুখের রঙ হয়। মিতাকে কথা বলতে দিতে চায় না

গুলনাহার। বউটি সহজে লজ্জা পায়। মজিদের সঙ্গে তার সম্পর্ক কোনো গোপনীয়তার, এবং একাকী নিজের। এটা নিয়ে হাট করলে গুলনাহারের লজ্জায় প্রাণ যাবে। ঝটপট ঝটপট করে এক ধরনের প্রেমাতিতে। তার এমন ভঙ্গিতে মজিদের সঙ্গে গুলনাহারের সম্পর্কের অনুভব প্রকাশ হয়ে পড়ে আরো বেশি। গুলনাহার সেটাকে কবুতরের মত প্রকাশ করে ফেলছে।

'এলাম বৌদি।' মিতা।

'এলাম বৌদি।' সবিতা।

এক স লাপে এক স্বরে দুজনে কথা বলে উঠল।

মিতা মইয়ে উঠতে উঠতে বলল 'দাদা, বৌদি আপনাকে ডাকছে।'

মিতা দেখল গুলনাহার মুখে এক গলা ঘোমটা টেনে দেয়। সাগরেদ কারিগররা নীরবে কাজ করে চলেছে।

মিতা আর সবিতা মাচার ওপর পা ছড়িয়ে বসল। মিতা খোঁপা ভেঙে খোঁপা বাঁধল, নিজের দিকে ফিরে ফিরে তাকিয়ে। সবিতা যেন এতক্ষণ পরিশ্রম করছিল, বুক থেকে আঁচল খসিয়ে পুঁটুলি পাকিয়ে কোলে গুঁজে রাখে। তারপর গুন গুন করে গান গেয়ে ওঠে। গানটার স্বর ধীরে ধীরে বাড়তে চায়। সে যেন কাউকে শোনাবার জন্যে গান গেয়ে উঠছে। মিতা জানে, সবিতার এই গানের সুর এই ছোট কারখানায় সকলের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। সবিতার গান গাইতে ইচ্ছে করছে, তাই গান গাইছে। সবিতার বেশ সুরেলা কণ্ঠ।

সবিতার দিকে না তাকিয়ে মুখ গুঁজে সেলাইয়ে বসে যায় মিতা।

হঠাৎ নীচে টেপরেকর্ডার বেজে উঠল। মহম্মদ রফির পুরনো হিন্দি ছবির গান।

সবিতা তক্ষুনি গান থামিয়ে দিল। এবং সবিতা ব্যস্ত হাতে ফর্মা তুলে নেয়। সেলাই করতে লাগে একা মনে।

মিতা ফুটোয় হুমড়ি খেয়ে পড়ে। মজিদ তার বউয়ের কাছে টেপ বাজিয়ে দিয়েছে, টেপটা কোথায় রাখবে, সেই পছন্দের ব্যস্ততায় আছে। আর গুলনাহার মুখের ঘোমটা ফেলে গৃহিণী বধূর মত হাঁটু মুড়ে বসে আছে, মজিদের দিকে তাকিয়ে।

মিতা আবার কাজে বসে। সমস্ত কিছুই চলে নিজের মত, এটা জানে মিতা। দাম্পত্য নিজস্ব নিয়মে চলে। এখানে কলের জলও একটা নির্দিষ্ট সময়ে আসে। কাজে বসার সময়, কাজ ছাড়ার সময় নির্ধারিত থাকে। কাজের পরিমাণে রোজগণ্ডার হিশেবও নিয়ম মেনে হয়। হেড কারিগর জলিল মিয়া বুঁদ হয়ে কাজ করায় দলটাকে। বাইরের বাতাস চড়া রোদে পুড়তে থাকে। রাস্তার কুকুর একটু ছায়া নিয়ে শুয়ে থাকে গলির ভেতর। কোথাও যেন একটা কিছু খুঁজে পেয়েছে, তার মনে এসে মেশে। অস্পষ্টতা সরে সরে ফুটে ওঠে মিতির মুখ। ভেতরে ভেতরে সে ক্রুর হাসি হাসে। সবকিছু মিথ্যে করে

দিতে থাকে। স্মৃতি সংস্কার, নিজস্ব ব্যথা-বেদনা সব মিথ্যে।

কোথাও কি চায়ের দোকানের উনুনে চলকে পড়া দুধ পোড়ে? মিতা জানে না। কোথাও কি একদল শিশুরা চেঁচামেচি করে? মিতা জানে না, কলকাতায় বসন্তদিন আলাদারকম কতটা। সে জানে না আকাশটা তার মনে কতটা গোপন ও মরে থাকে। তার বর্তমানেরই ভেতর অনেক আড়াল গোপন। আবার তার বর্তমানের ভেতর কত অতীতদিন আড়াল গোপন থাকে, তাও জানে না। মাঝে মাঝেই বর্তমানের আড়াল গোপন তার নানা ইন্দ্রিয় ও কল্পনার মধ্যে ধরা পড়ে। তার গোপন আড়াল অতীতদিন তাকে এসে ছেয়ে দেয়। সে তখন ফিরে ফিরে যায় স্মৃতিদিনে, স্মৃতিজিজ্ঞাসার এক আকুতি তৈরি হয় তার। সমগ্র নিসর্গ ব্যেপে স্মৃতিদিন, সম্পর্ক এসে ভিড় করে। এবং স্মৃতি, ক্রমশ স্মৃতি আসে। ভারতবর্ষ নয়, বাংলাদেশ, অন্য দেশ অন্য রাষ্ট্রে সে প্রোথিত হয়। লাটাই ঘোরাবার মত পেছনের টানে টানে সে জড়িয়ে যেতে থাকে। উড়ে উড়ে যায় বিশাল আকাশের তলায়, নির্জনতায়, গ্রামভূমিতে। উড়ে উড়ে যায় স্বামী-সোহাগ-অতীতে। অতীতদিন জোনাকির মত স্বর্ণবিন্দু সহস্রতায় তাকে ঘিরে ধরে। কোথাও কি চায়ের দোকানের উনুনে চলকে পড়া দুধ পোড়ে? মিতা জানে না।

যখন মিতার মধ্যে স্মৃতি ও বর্তমানতার তফাৎ দীর্ঘ হতে থাকে সামনের চা দোকানটার উনুনে চলকে পড়া দুধ পুড়ে যাবার গন্ধ পায় মিতা। শিশুরা দলবদ্ধ চেঁচামেচি করে গলির ভেতর। কলকাতায়ও বসন্তদিনের কমনীয় লাবণ্য ছড়িয়ে থাকে আকাশে বাতাসে, এটা টের পায় মিতা। গাড়ির হর্নের শব্দ, মানুষের ব্যস্ততার পদশব্দ ওঠে আসে। উঠে আসে কিছু মুখ, বর্তমানের দেখায়, চেনাজানায়, সম্পর্কে। মতির মুখ আয়ত ভেসে ওঠে।

সকাল পৌনে সাতটার সময় বেরিয়ে সাতটা দশের লোকাল ধরতে উঠোন থেকে নেমে সরু রাস্তায় পা দিয়েছিল স্রস্তপায়ে মিতা। মাথায় ভিজে চুল শীতল হয়ে ছিল তার। কী ভেবে পেছন ফিরে উঁচু দিকে তাকাতে বুকটা ধকাস করে ওঠে মিতার। সারা শরীর বয়ে হিম নেমে যায়। দিপু সরকারদের বড় ছেলের নতুন তৈরি বাড়ির ছাদে খোলা সিঁড়ি বেয়ে উঠে গিয়ে, নীচের দিকে ঝুঁকে কী যেন নাগালের মধ্যে ধরতে আরো ঝুঁকছে। শরীরে শপাং শপাং চাবুক লাগে মিতার। সে যেমন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরেছিল, তেমনি স্থির শোণিতপ্রতিমা হয়ে ওঠে মিতা। মাথার ভেতর ঝিমঝিম শুরু হয়। কে যেন তাকে স্থির টেনে রেখেছে পেছনের দিকে। সহসা দিপুর জননীত্বের অনুভূতি এসে তাকে সম্পূর্ণ নিয়ে নেয়। এই সংসারে সে কোনোভাবেই বুঝি

দিপুর মা এটা তার অবচেতনে লুকিয়ে ছিল। সংসারের আর সকলেরা তাকে এই গোপনতার ভেতর থাকতে দিতে চায়। মিতাও থাকতে চেয়েছে। কিন্তু মুহূর্তের মায়া অন্য জিনিশ। দিপু ছাদ থেকে পড়ে মরে যেতে পারে, মায়ের মন তুমুল হয়ে পেড়ে ফেলে মিতাকে। দিপু তার কাছে থাকে না, আসে না, ঠিক আছে, কিন্তু দিপুর খারাপ কিছু, জীবন আশঙ্কা, জীবনহানির মুহূর্ত, প্রথম সন্তান গর্ভে নিয়ে মাথা ঘুরে ওঠার অনুভবের মত, এখন ভেতরের সেই অনুভূতি এসে মিতাকে তোলপাড় করে দেয়।

দৌড়তে গিয়ে বাঁ-পাটি জুতো ছিঁড়ে যায়। দু পাটি জুতো গড়াগড়ি খায় রাস্তায়। ছুটে যায যেন দু-বছর আগেব জীবন। দিপুর মা হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রাণপণ আলুলায়িত জননীপ্রতিমা স্মৃতিসত্তা দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কাটা ঘুড়ি পাক খেয়ে খেয়ে যেমন যায তেমন সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায় মিতা। নিঃশব্দে পদশব্দহীন এগিয়ে যায় দিপুর দিকে। দু-হাত দিরে ঝাঁপিযে দিপুকে টেনে তোলে। দিপু যে এতটুকু সহজেই উঠে আসে, একেবারে বুকে এসে মেশে।

দিপু আকস্মিকতায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। সে বুকে এসে মেশে শরীরের শক্তির টানে। এবং সম্মোহন লেগে থাকে ততোধিক তার নয়নে। বাস্তব জ্ঞান হারিয়ে তাকিয়ে থাকে তার জননীর দিকে। স্বপনজাগরণেও যা নেই এমন একটা ঘটনায় সে হতচকিত।

মিতা দিপুর মাথায় ডান হাত বুলিয়ে. একটু ঝুঁকে বুকে চেপে, মুখটা দিপুর কাছে এনে 'সোনা আমার মানিক আমার, এখানে কে তোকে আসতে বলল। তোর কিছু হলে সইতে পারব না রে।'

কণ্ঠস্বরের ভেতর দিপু সহজ হয়ে উঠল। এবং মায়ের সঙ্গে সম্পর্কের বাস্তববোধ ফিরে পেল দিপু। 'আমাকে তুমি ধরলে কেন ?'

'তুই যে পড়ে যেতিস সোনা !'

'আমার নাম সোনা নয়, জানো ত। তুমি ট্রেন ধরতে ছুটবে জানি, পেছন ফিরে দেখবে না জানি। আর একটু হলে ফড়িংটা ঠিক ধবে ফেলতাম।'

'কেন রে দিপু, তোর ফড়িং না ধরলেই চলে না ? মায়ের চোখের আড়ালে, মাকে কষ্ট দিস কেন ?' দিপুর মাথাটা ধরে বুকে টেনে নেয় মিতা।

দিপু শরীরের শক্তি দিয়ে, মাথাটা নিচু করে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় সহসা। 'যাও দিকি বক বক কোরো না। জোরে একটা কামড়ে নিতাম। আমার দাঁতে কত ধার তা ত জানো না।'

দিপু মিতার সামনে দু-হাত তফাতে গিয়ে যেন মিতাকে শাসাচ্ছে।

খোলা ছাদের ওপর, দৌড়ে গিয়ে দিপুকে ধরতে যেতে ভয় হয় মিতার। এই বুঝি দিপু ধরা না দিয়ে পেছন ফিরে দিশেহারা হয়ে দৌড়বে। এবং খোলা ছাদ দিয়ে নীচে গড়িয়ে যাবে উলের গোলার মত। দু-হাত তফাতে দাঁড়িয়ে লোভ গিবতে থাকে মিতা। দিপুর শমনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

দর দর ঘেমে ওঠে সে। সে তাকিয়ে তাকিয়ে দিপুকে দেখে। 'চল, ঘরে ফিরে তোকে মুড়ি আর নাড়ু দেব।'

'সে ত কাকিমার মুড়িনাড়ু। আমাকে কাকিমা দেয়। তুমি ট্রেন ধরতে যাও।'

'আজ আমি যাব না।'

'কামড়ে রক্ত বের করে দেব কিন্তু!'

'কামড়া, আয়!'

'ও, ধরে ফেল আর কি।'

'তোর ত মা সোনা!'

'মা হও জানি। কাকিমা নও ত!'

'পয়সা দেব।'

'পয়সা আমার আছে। তুমি গল্প জানো না একটাও।'

'জানি। আজ বলব।'

দিপুর ঠোঁটে অবিশ্বাস। 'জানোই না। দিনের বেলায় গল্প শুনতে নেই। রাতে কত গল্প বলে কাকিমা।' হাসছে দিপু।

মিতা দিপুর শমনের সামনে দর দর ঘামে। গলা শুকিয়ে যায়। অপত্য-স্নেহে শরীর দুমড়ে মুচড়ে উঠছে। হাহাকার উঠছে বুকে। দিপু তাকে একেবারে মিথ্যে করে দিচ্ছে। দিপু তার কাছে যেতে দিচ্ছে না। একটা সংলাপ বলার মত দূরত্ব রেখেছে। শাসন ও ঘৃণার সংলাপ ছুঁড়ে দেবার জন্য যতটুকু দূরত্ব লাগে। আর দিপু সেই দূরত্বকে রেখেছে, ছুটে ধরতে এলে নাগাল না পায়। ছাদ থেকে পড়ে যাবার আগে ধরতে পারবে না।

ভয়ের শিহর এসে কাঁপান মিতাকে। এগিয়ে গিয়ে ধরতে গেলে যদি দিপু টুব করে দিগন্তের সূর্যের মত ডুবে যায়! দিপু গর্ভের ভেতর, আর সেই শিহর যেন এখন পেয়ে ভার হয়ে ওঠে মিতা। অথচ সেই গর্ভের সন্তান দিপু। দিপু তার কেউ নয়। দিপুর সে কেউ নয়? কিন্তু দিপু থাকে, ভাল থাকে, দিপুকে ভাল থাকতে দেবার অনেকে আছে, মা বিনা দিপু ভালও ছিল, এখনো আছে, পরেও থাকবে, দিপুর ভাল থাকাতে মিতা কোনো অমঙ্গল চায় নি, কেউ দিপুকে ভাল থাকতে দিচ্ছে তাদের প্রতি অনাস্থাও নেই মিতার, এখনো নেই, পরেও থাকবে না—কিন্তু দিপু থাকে, ভাল থাকে না, দিপুকে ভাল থাকতে দেবার অনেকে থাকলেও দিপু ভাল থাকে না, মা বিনা যদি দিপু ভাল না থাকে, এখনো খারাপে আছে, পরেও খারাপে থাকবে, যে কোনো মুহূর্তে দিপুর কোনো অমঙ্গল কিছু হয়ে যাবে, এটা মা হয়ে সইতে পারবে না মিতা। তার জন্যে তাকে যদি মা নাও হতে হয় সইতে পারবে। দিপুর কেউ নয় সে, দিপু ভাল থাকুক। মা না হয়েই থাকতে চেয়েছে। ছাদ থেকে পড়ে যেতে পারে দেখে বড় বিচলিত হয়ে উঠেছে মিতা। হাহাকারে ভরে উঠেছে বুক। দিপু শিশু, তার বিপদ সে নিজে জানে না। দিপু শিশু, মায়ের প্রতি কী ব্যবহার

না জানুক, মিতা মানে ছেলের প্রতি তার কোনো ক্রোধ হয় না, সে তার ব্যথা স্মৃতিতাড়নার বেদনা মিশিয়ে দিতে পারে মৃত্যুর অন্ধকারতার ভেতর, দিপুর জন্যে তার কোনো নিজস্ব মৃত্যু নেই, দিপুকে তার মৃত্যুর সঙ্গে মিশিয়ে নিতে পারবে না।

দিপুর খারাপ চাইত যদি, তা হলে এখনি দিপুকে ধরতে যেত, দিপু অবোধ শিশু, পেছন ফিরে দৌড়ে, ছাদ থেকে পড়ে ধড়ফড় করে মরে যাবে। দিপুর জন্যে মিতার বেঁচে থাকাও নেই। দিপুর বেঁচে থাকার মধ্যে আছে মিতা।

গর্ভের ভেতর ছোট অবয়বটাকে একটু একটু করে লালন করার মত তাকে গড়তে হয় তা হলে। নানা অনুভূতি এসে মিশে যাবে আগেকার জীবনের নানা ঘটনা মুহূর্ত দিয়ে। দিপু তার পেটে নড়াচড়া করতে করতে বড় হয়ে উঠছে। আগেকার জীবনের নানা অনুভূতি ঘটনার মুহূর্তের সঙ্গে মিশে যাবে, সেখানে মিথ্যা নেই। মিতা সেটা গড়তে পারবে না। গড়তে পারত যদি, বাংলাদেশ তার নিজের দেশ হত। সে তার প্রকৃতির মধ্যে থাকত। ঋতুর বিবর্তনের ভেতর। সূর্য ডোবা-ওঠার ভেতর। ঘনযামিনী পেত। নদীর ছন্দ শুনতে পেত। শুনতে পেত নানা পাখপাখালির কাকলি। ছোট ছোট ফড়িং প্রজাপ্রতি পোকামাকড় নানা বর্ণে তার জীবনকে ঘিরে রাখতো। সুবাতাসে জুড়িয়ে যেত মন। ক্লান্তিতে সুশীতল ঘুমিয়ে যেত। স্বপ্ন নানা রঙ গন্ধ কল্পনা নিয়ে ডালপালা মেলে দিত মনের ভেতর। দিপুর বাবাকে নিয়ে যে সাধ আহ্লাদ, অপূরণ অতৃপ্তিতে স্বপ্ন ত দেখতে পারত! দিপুর বাবার কাছে যতটুকু পাওয়া, তার ভেতর থেকেই স্বপ্নগুলো ডানা মেলত। ছড়িয়ে থাকত তাদের উঠোনের কাঁচা মাটিতে, নদীতে, খালে বিলে, খেতে খামারে। অবকাশের ভেতর, ক্লান্তি মুছে ফেলার একার ভেতর, ঘুম ভেঙে যাওয়া শাঁ শাঁ নৈশব্দ্য রাতের ভেতর। ঘুম-না-আসা ঘুমপূর্ব ঘুমশয্যার ভেতর। হারিয়ে হারিয়ে যাওয়া, ছড়িয়ে ছড়িয়ে যাওয়া, নানা কথা ভাবনার ভেতর। নানা কথা নানা ভাবনা মুছে মুছে ফেলার ভেতর। নতুন ভাবনা নতুন কথার ভেতর নতুন চাওয়া, নতুন করে পাওয়ার চমকের ভেতর। বধূবিশেষে পাওয়ার অভ্যাসের ভেতর, বধূনির্বিশেষ অনভ্যাসের পাওয়ার বিদ্যুচ্চমকে গর্বিত আনন্দের ভেতর, দিপু পেটের ভেতর নড়াচড়া করে উঠছে।

গর্ভের ভেতর ছোট অবয়বটাকে একটু একটু করে লালন করার স্মৃতিটুকু নিয়ে নিজের মনের ভেতর সেই অনুভূতিকে মেশাতে পারে না মিতা।

'আমার ফড়িংটাকে তাড়ালে, তুমি দোষী।' দিপু মিতার দিকে আঙুল তুলে এ কথাটা বলে।

মিতা বলে 'আমার দোষ।'

'বা, দোষ করলে, শাস্তি পেতে হয়।'

'শাস্তি, কী দিবি, দে।'

'ভারি ত কানমলা খাবে, তারপর ধরতে আসবে বুঝি? আমি তোমার কাছে গেলে ত।'

'কেন, তুই আমার কোলে আসতে চাস না?'

'আমি ছোট আছি যে কোলে চড়ব!'

'ও বড় হয়েছিস? এত বড়।' দু-দিকে হাত ছড়িয়ে বড় বড় চোখ করে দিপুকে ভোলাতে চায়। ঘুমপাড়ানি গানের সুর ছন্দে নয়। তার চাতুরির ভেতর নিয়ে ফেলতে পারে দিপুকে। 'ওরে বোকা, তুই ত তা হলে অফিস করবি এখন! অফিস যেতে হলে খুব সকালবেলা ভাত খেয়ে বেরতে হবে। এই এত বড় ট্রেনে চড়ে যেতে হবে। তারপর কোন মিনিবাসে চড়তে হবে, যে বড় হয়েছে সেই জানবে,—তুই জানবি! জানিস! জানিস না!' দিপুকে দিপুর বড় হওয়ার কল্পনাজালে ফেলে দিয়েছে মিতা। এই চাতুরি, মিতার, নিজের মনেই কষ্ট দেয় মিতাকে। নিজের অবোধ শিশুর সঙ্গে ভাব জমাতে হচ্ছে, চাতুর্য দিয়ে। এবং দিপুর দিকে সে এই সুযোগে টিপি টিপি পায়ে এগিয়ে যায়। এই মুহূর্তে দিপু যদি বুঝতে পারে, তা হলে দিপু পেছন ফিরে ছুটতে শুরু করে দিতে পারে। ছাদ থেকে পড়ে ধড়ফড়িয়ে মরে যেতে পারে। এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দিপুর সঙ্গে কথা বলাও নিরাপদ নয়। যতক্ষণ দিপুকে তার দু-হাতের কাছে রাখছে, ততক্ষণ নিরাপদ নয়। আর দিপুকে ছাদে রেখে নেমে যাওয়া নিরাপদ নয়। যে-কোন মুহূর্তেই দিপুর প্রিয় ফড়িংটা ফিরে আসতে পারে, ছাদের কিনারে, নীচের দেয়ালের দিকে। দিপুকে অনেকটা ঝুঁকে ধরতে হবে। আর ফড়িংটা যদি আরো নীচের দিকে নামতে থাকে, দিপু আরো নীচের দিকে ঝুঁকবে। তারপর দিপুকে ধরে না নিয়ে গেলে কিছুতেই শান্তি পাবে না। দিপুর জন্যে তার অনেক কষ্ট হাহাকার হয়ে জড়িয়ে ধরে। হাত দুটো দুদিকে মেলে দেয় মিতা। মিতা যেন মা নয় দিপুর, পাড়ার রিনি পিসি। কিংবা কোন নটী। ছলাকলায় মুগ্ধ করতে চায়। 'তারপর বাস থেকে কোথায় নামবি, তুই জানবি কী করে? তুই কি তেমন বড় হয়েছিস? কত গাড়ি কত দিকে যাচ্ছে। রাতে কেমন আলো। রাতে আলোয় কোনটা কোন দিকে চেনা মুশকিল। তুই কি একা চিড়িয়াখানায় গিয়ে চিড়িয়াখানার বাঘ দেখতে পারবি নাকি? ইয়া বড় বড় বাঘ। এত বড় তার মুখ, ইয়া বড় থাবা। এই জোর লাফায়।' খপ করে বাঁ-হাতটা ধরে ফেলে দিপুর। এবং জড়িয়ে কোলে তুলে নেয়।

দিপু কাঁদতে শুরু করেছে। মিতার শরীরে এলোপাথাড়ি লাথি ছুঁড়ছে। হাত দিয়ে খামচাচ্ছে। 'আমাকে ধরলে কেন? আমাকে ধরলে কেন?' হাপুস নয়নে কাঁদছে। কোল থেকে নেমে যাবার জন্যে শত চেষ্টা করছে। এমন করে জড়িয়ে ধরে সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে মিতা। দিপুকে একা ছাদের ওপর রেখে যেতে পারবে না মিতা। মিতা জানে তার একটা গোপন পরিচয় আছে।

দিপুর চিৎকার করে গ্রাহি গ্রাহি কান্না। উঠোনে উঠতে বিন্দু ছুটে এল রান্না-ঘর থেকে। বিন্দুর আঁচল লুটিয়ে পড়েছে রোদের ধুলোর ভেতর।

'কি হল, দিদি, দিপুকে ধরে আনলেই বা কেন, ফিরে এলেই বা কেন?' মেজ দেওরের বউ বিন্দুর কথার কোনো উত্তর দেয় না মিতা। এক মুঠি চুল খামচে ধরে টান মেরে আছে দিপু। মুখটা নীচের দিকে নেমে আসে মিতার। চুল টেনে বুকে চড়ে মিতাকে মারছে দিপু।

'আহ্ দিদি দিপুকে নামিয়ে দাও না।' বিন্দু বলে।

মিতার জেদ চেপে যায়। কারুর আদেশ উপদেশ তার বিষ মনে হয়। নিজের মনেও রাগ হয় বেশি। দিপুর ওপরও। দিপুর মার খাচ্ছে সে। মেজ দেওর সতীশ উঠোনের চালার এক কোণে তার দেড় বছরের ছেলেটাকে সামনে নিয়ে জামাকাপড় পরে, কাপ ধরে চা খাচ্ছে। এখুনি মসলন্দপুর চলে যাবে, তার সাইকেল সারাইয়ের দোকানে।

চুল থেকে হাত দুটো ছাড়াতে হাতের জোর দিয়ে দিপুর কচি হাতে কষ্ট দিতে হল মিতাকে। চুল থেকে হাত দুটো ছাড়িয়ে দিতে, এবার দিপু, মিতার মুখে খামচে ধরেছে জোর। দিপুর সঙ্গে জোর লড়াই চলছে মিতার। দিপু চিৎকার করে কাঁদছে, মিতা নীরব।

দেখল ছোট দেওর শ্যামল উঠোনে বেরিয়ে এসেছে। অনেক রাতে বাড়ি ফিরেছিল, এখনো পড়ে পড়ে ঘুমচ্ছিল। অন্ধ শ্বশুর একটু একটু চুমুক দিয়ে দিয়ে কাপ ধরে চা খাচ্ছে।

শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে হাত দুটো ছাড়িয়ে দাঁত কিড়মিড় রাগে দিপুর পিঠে দুম দুম কিল মারে মিতা। কোল থেকে নামিয়ে ঠুকে বসিয়ে দেয় দিপুকে। 'চোপ্, একদম কাঁদবি না!' দিপু চিৎকার থামিয়ে ফোঁসফোঁসায়। মার খেয়ে মুখ তার লাল। মারের ভয়ে চিৎকার বন্ধ করেছে। কটমট করে শাসনের চোখে দিপুর দিকে তাকিয়ে আছে মিতা।

বিন্দু 'কী হল দিদি? এত শাসন করছ? দিপু কি অন্যায় করার মত ছেলে?'

'একা একা সরকারদের নতুন বাড়ির ছাদে ছিল, ওকে দেখার কেউ আছে কি?'

'দিদি অন্যায় ভরে কথা বলো না। ওকে কে দেখে সারাদিন? তোমার পেটেই জন্মেছিল শুধু, দিপু আমার ছেলে।' বিন্দু রুখে ওঠে।

মিতা নমস্কারের ভঙ্গিতে বিন্দুর দিকে হাত দুটি তুলে ধরে 'জোড়হাত করছি বিন্দু, পেটে ধরেছি বিশ্বাস করিস ত, তা হলে আমাকে শাসন করতে দে।'

বিন্দু বারান্দা থেকে নেমে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিল, পেছন ফিরে, 'আদর করতে না জানলে শাসন মানায় না দিদি।'

'আদর করি কি না দেখিস!'

'একদিনে হয় কি দিদি!'

মিতা উত্তর জানে না, চুপ হয়ে যায়।

রান্নাঘরে ঢুকে, বিন্দু কত কথাই বলে নিচু স্বরে, কোনো কথাই শোনা যায় না। বিন্দুর যে মিতার দিপুর প্রতি এই ব্যবহার মনঃপূত হয় নি, এটা বোঝা যায়। তাতে আরো জেদ বাড়ে মিতার।

'বৌদি, মাথা গরম করে ফেললে, এই সকালে?' সতীশ দেড় বছরের ছেলে দিলীপকে বারান্দায় রেখে নীচে নেমে যায়। হামাগুড়ি দিয়ে ধেয়ে যাওয়া দিলীপকে টুকিটুকি দিয়ে বেরিয়ে যায় ট্রেন ধরতে।

'ছেলেদের মারধোর করে মানুষ করা খুব খারাপ।' শ্বশুরমশায়, কাশে আর বলে 'গায়ে মার সহে নিলে আবো বড় বড় অন্যায় ধরবে।'

শ্যামল ঘরের ভেতর ঢুকে গেল। হয়তো ফের ঘুমিয়ে পড়বে। শ্বশুর-মশায় একটু দূরে গিয়ে পেছন ফিরে বসে।

মিতা দেখল নীচে দাঁড়িয়ে থাকা কুকুরটা গেল না।

মিতা দেখল, দিপু ভয়ে কান্না থামিয়ে, কেঁপে কেঁপে উঠছে ফোঁসফোঁসা-নিতে। শাসনের চোখে দিপুর দিকে তাকিয়ে আছে মিতা। তার চেয়ে বেশি মনে-প্রাণে জননী হয়ে উঠতে চায়।

দড়ি থেকে গামছা পেড়ে, ঘটির জলে গামছা ভিজিয়ে, দিপুর মুখ মুছিয়ে দেয়। হাত পা মুছিয়ে দেয়। তারপর দিপুর চোখে চোখ রাখল। দিপুর চোখ নড়ল না।

'বোস, তোর জন্যে মুড়ি আনছি।'

রান্নাঘরের দরজার মুখে দাঁড়িয়ে মিতা দেখল বিন্দুর কপালে নানা আঁকি-বুকি। নানা কথা ভাবছে নানা হিশেব-নিকেশ করছে সাংসারিকতার। যা মিতা করে না। এসব সাংসারিকতার মিষ্টি একটা স্বভাব গড়ে ওঠে। মাথা বার বার নুয়ে পড়ে ভাবনার ঘনসন্নিধ্যে। সিঁথির পথটা দিনে দিনে সাংসারিকতায় একটা গড়ন পায়, প্রতিদিনে আঙুল ঘষে সিঁদুর লাগানোয়। মাটিতে আয়না রেখে হুমড়ি খেয়ে পড়ায়। মিতাকে বিন্দু দেখতে পায় নি, বিন্দু নিজের মনে ভাবনায় আছে।

'বিন্দু!'

বিন্দু মুখ তুলে মিতাকে নজরে পায়।

'দিপুকে একটু মুড়ি দে ত।'

বিন্দু কোনো কথা বলে না। আলু কুটছিল। আলু কুটে রাখা জলের ডিশে হাত ডুবিয়ে ধুয়ে, হাত ঝেড়ে, শাঁখা-নোয়ার শব্দ তুলে, আঁচলে হাত মোছে। উঠে দাঁড়িয়ে, পাশে ফিরে, আবার নুয়ে, এক বাটি মুড়ি তুলে আনে বিন্দু, টিন থেকে। দুটো নাড়ুও দিল। বাড়িয়ে ধরল মিতার দিকে। কোনো কথা বলে না বিন্দু। মিতা জানে, এটা এক অবহেলা তার প্রতি।

রোদ চড়েছে, গরম ধুলোর ওপর আলপনা আঁকে মিতার পা। সেও এ

সংসারে ভীষণ নীরব। ভাল মানায়ও তাকে। পাশ ফিরে দেখে পেঁপে গাছটায় পেঁপে ধরে আছে হাড়েগোড়ে। দত্তদের পুকুরের গায়ে জঙ্গল ঝোপ গাছপালা। নিপাট কালো জল। রাতে এই জলের শীতল স্পর্শ পায় মিতা। কুকুরটা তার পেছু পেছু ঘাটে আসত। কুকুরটা যদি কথা বলতে পারত, তা হলে কুকুরটার সঙ্গে তার দু-চারটে কথা হতে পারত।

হাত ধরে দিপুকে টানে মিতা। ঘরের ভেতর নিয়ে যায় দিপুকে। নীচে আসন পেতে দরজার সোজাসুজি মেঝেতে বসে দিপুকে নিয়ে। 'খা।' দিপুর চোখে, হাতের চেটো ঘষে জল মুছিয়ে দেয়। দিপুর ভেতরে লুকিয়ে রাখা কান্নাকে ছুঁলো মিতা।

দিপু মুখ গুঁজে মুড়ি খায়। মিতার দিকে তাকায় না কেন ?

মিতা শাড়ি বদলায়। ব্লাউজ অন্তর্বাস খুলে ফেলে, শাড়িতেই বুক ঢাকে। স্তনদুটি তার আরাম পায়। দিপুর কাছে এসে বসে। দীর্ঘশ্বাস পড়ে তার। মনটাকে শান্ত করতে চাইছিল, দিপুর মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। খোঁপা ভেঙে, খোঁপা বাঁধে দিপুর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। দিপুর মুখে চোখে চোখ রেখে শান্ত হতে চাইছিল মিতা।

মুড়ি খায় দিপু মাটির দিকে তাকিয়ে। তার মায়ের দিকে তাকায় না। দিপুর পিঠে মিতার ডান হাত নেমে আসে। ঘামাচি মারে। নাকের ডগার ওপর দিয়ে দৃষ্টি ফেলে নিকট দেখায় নিবিষ্ট হয় মিতা।

দরজার মুখে ছায়া পড়ল। দেখল, বিন্দু মুখ বাড়িয়েছে। দিপুকে দেখছে। মিতা মুখ তুলে তাকাতে বিন্দু চলে গেল তার দেড় বছরের খোকাকে বুকের স্তন দিতে।

মিতা নুয়ে পড়া মুখ নিয়ে বলল, 'গায়ে ব্যথা করছে ?'

দিপু মাথা নাড়ল। না। কথা বলল না।

'তোর একটা প্যান্ট কিনে এনে দেব।'

দিপু চোখ তুলে তাকিয়ে চোখটা নামিয়ে দেয়। মাটির দিকে মুখ রেখেই বলল, 'কাকিমার কাছে যাব।'

'কাকিমার কোলে ভাই আছে না !'

দিপু কি বুঝল, কিছু বলল না আর। 'তোর গায়ে কেউ সাবান মাখায় না ?'

দিপু মুখ তুলে বলল, 'কাকিমা সাবান মাখিয়ে দেয়।'

'কাকিমা খুব ভাল না রে ?'

'কাকিমা খুব ভাল।'

'আমি খুব খারাপ !'

দিপু কোনো কথা বলে না।

'কাকিমা তোর জামাপ্যান্ট কিনে দেয় নাকি ?'

'মেজকাকা দেয়।' দিপু মুখ তোলে। 'মেজকাকার সাইকেল সারানোর

দোকান আছে। এত টাকা মেজকাকার। আমার জন্যে লজেন্স আনে, বিস্কুট আনে। কাকিমা বিকেলবেলা বিস্কুট দেবে দুটো।'

'আর কী দেয়?'

'আরো কত কি।'

তেমন আবার মুড়ি খেতে থাকে দিপু।

বাইরে রোদ বাড়ছে হলুদ রোদে ভরে আছে চারদিক। বসন্তদিনে কোথায় যেন কোকিল ডাকে। মিতা নিবিড় চোখে দিপুকে দেখতে চায়। অলসমন্থর সময় এসে মিশেছে মিতার কাছে। দিপু। দিপু! দিপু! মুখ ধরে দিপুকে চুমু খেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু অতখানি ঘনিষ্ঠ নয় দিপুর। পাগলপারা হয়ে দিপুকে আজই কাছে পেতে চেয়েছে। দিপুর অভ্যাস নেই।

মুড়ি খেতে খেতে দিপুর ঘুম এসেছে দু-চোখে। বাটির তলায় অবশিষ্ট মুড়ি। বাটি ধরে ঘুমে ঢুলছে। বাটিটাকে নামিয়ে রাখে মিতা। তারপর দিপুকে হাঁটুর ওপর মাথা রেখে শোয়ায় মিতা। দিপুর খুব ঘুম পেয়েছে। হাঁটুর ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমন্ত দিপুকে কোলে তুলে, বুকে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল মিতা। দিপু কী ভারী হয়েছে! মিতার বুক জুড়ে ভরে উঠল দিপু। দিপুকে বিছানায় শুইয়ে দেয়। তারপর মিতা, দিপুর পাশে পা মেলে বসে। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে রাখে। তাকিয়ে থাকে ঘুমন্ত দিপুর দিকে। মাঝে মাঝে নড়ে নড়ে উঠছে ঘুমের ভেতর। এমনি করেই বুঝি নড়ে উঠত পেটের ভেতর?

মরা ছাই ছাই বিকেল এসেছে দরজার কাছে। এখুনি সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসবে। আলো মরা ধুসরতা মিশে আসছে বাতাসে। দিপু বেলা গড়িয়ে ঘুমচ্ছে। আজ দিপুকে দুপুরে নিজের বিছানায় শুইয়েছে মিতা। ঘুম থেকে উঠে, স্নান করে খেয়ে দেয়ে আবার ঘুমিয়েছে দিপু। দিপুকে নিজের বিছানায় এনে কাছে রাখার নেশায় পেয়েছে মিতাকে। বিছানায় পা মেলে বসে, দেয়ালে পিঠ ঠেসিয়ে ছুঁচ সুতো নিয়ে ছেঁড়া জামাটামা সেলাইয়ে বসেছে মিতা সেই থেকে। দিপুর দিকে তাকিয়ে দেখেছে। সে জানে, দিপুকে নিয়ে তার এ পাগলামি। বিন্দু সারাদুপুর ছটফট করেছে। মাঝে মাঝে দরজার কাছে এসে মুখ বাড়িয়ে দিপুকে দেখে গেছে। মিতা না থাকলে বিন্দুর কাছেই থাকত দিপু। বিন্দু দিপুকে ছেড়ে থাকতে পারছে না। দিপুও যেতে চেয়েছিল। দিপুকে জোর করে, ভুলিয়ে তার বিছানায় শুইয়েছে মিতা।

বিন্দু ঘরে ঢুকল। গরম চায়ের কাপ নিয়ে এসেছে। 'ওহ এখনো ঘুমচ্ছে? দিদির শাসন বটে।' চায়ের কাপ বাড়িয়ে দেয়।

মিতা চায়ের কাপ নিয়ে বিন্দুকে বসতে বলে। 'বোস।'

'বসলে চলবে না দিদি।' দিপুকে মুখ তুলে দেখে। 'অত ঘুমনো ভাল নয়।'

চায়ের কাপ নিয়ে দরজার সামনে শ্যামল এসে দাঁড়াল। 'বড়বৌদি দিপুকে তুলে দাও। বিকেলে একটু খেলতে দিলে না?'

বিন্দু বিছানায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে দিপুকে নাড়ায়। দিপুর ঘুম ভেঙে যায়। দুদিকে হাত ছড়িয়ে আড়ামোড়া ভাঙছে। পিট পিট করে বিন্দুকে দেখছে। বিন্দু দু-হাত বাড়ায়। বিন্দুর দু-হাতের ভেতর উঠে যায় দিপু। বিন্দুর গলা দু-হাতে জড়িয়ে বুকে মাথা গুঁজে দেয়। বারান্দায় নিয়ে গিয়ে দিপুকে নামিয়ে দেয়। 'শ্যামল, দিপুকে দোকান-তলার দিকে একটু ঘুরিয়ে আনো ত। এসে মুড়ি খাবে। বাব্বা কী পাষাণী মা!'

শ্যামল দিপুকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

আলো মরে এল। আরো ধূসর হয়ে উঠল। লুটিয়ে বাতাস দেয়। গাছে পালায় পাখি ডাকে। বুনো গন্ধ যেন নেমে আসবে এখুনি। বাইরেটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে মিতা। তার কিছু ভাবতে ইচ্ছে করছে না। সে শুধু দেখতে চায়। আলো কেমন ধীরে ধীরে মরে সেই মায়া দেখতে চায়। তার ভেতর যে কুঁচো টুকরো শব্দ গড়ে ওঠে, সে শুধু শুনতে চায়। এ-ভাবে নিষ্পলক থাকলে চোখে শীতলতা এসে মেশে। দৃশ্য ঝাপসাও হয়ে ওঠে। হাত থেকে চায়ের কাপটা মাটিতে পড়ে যায়।

সেলাই করে কোলের ভেতর রাখা দিপুর জামা আর তার দুটি ব্লাউজ বের করে আনে। সরু ছুঁচটাকে খুঁজে পেল না। কত হাতড়ালো, পেল না। বিছানায় কোথাও আছে। বিছানায় কোথাও গেঁথে আছে হয়তো। খুব শখ হয়েছিল দিপুকে এবার তার বিছানায় নিয়ে শোবে। ছুঁচটা বিছানায় কোথাও লুকিয়ে থাকায়, শখটাকে মুহূর্তে মেরে ফেলে মিতা। দিপুকে কখনো এ বিছানায় শুতে দিতে পারবে না।

অবেলায় ঘুম এসে গেল মিতার।

তার ঘুমের ভেতর দিপু কেমন লাফিয়ে লাফিয়ে যায়। ধরতে পারে না। দিপু যেন কোনো ছোট্ট পাখি। হাতের কাছে এসে ধরা দিতে দিতেও ধরা দেয় না। দিপুকে ধরতে পারে না, পারবে না। অসংখ্য কীটপতঙ্গ জলাভূমি, ধানখেতের ভেতর লাফিয়ে লাফিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে দিপু। বিরাট আকাশের তলায়। কাঁচা রোদের ভেতর। তার সঙ্গী হয়েছে নানা রঙের পাখপাখি। সুন্দর তাদের ডানা। সুন্দর তাদের ঠোঁট। হাওয়ায় দিপুর চুল ওড়ে। দিপুর চোখ, পাখির চোখের চোখ। দিপুর গায়ের রঙ পাখির রঙের রঙ। দিপু কোথায় উড়ে উড়ে যায় কীটপতঙ্গ পাখিদের সঙ্গে নিয়ে? মিতাও দিপুর সঙ্গে উড়ে উড়ে যায়, দিপুর পেছু পেছু, কীটপতঙ্গ পাখিদের পেছু পেছু। আগে আগে দিপু, আগে আগে পাখিরা। নদীর ওপর দিয়ে উড়ে যায়। নীল আকাশের বুকে ওড়ে। নীচে থাকে সবুজ মাঠ, সবুজ গাছপালা। বিশাল আকাশের ভেতর দিপু কোথায় হারিয়ে যায়।

চাচার দোকানে হালুয়া রুটি খেয়ে মির্জাপুরে হেঁটে এসেছে মতি। তার সমবয়সী সঙ্গ ভাল লাগে না। একা একা ঘুরতে, একা থাকতে তার ভাল লাগে। একা একা ভাবতে তার ভাল লাগে। একা একা কোথাও চলে যেতে তার মন হয়। সবু কাদের নীলুদের সঙ্গে দেখা করে না। দেখা করতে তার ভয় লাগে। ভাল লাগে না। কাজের সময়, কাজ করে বেশ সময় কেটে যায়। তারপর শুরু হয় একা একা থাকা। একা একা ঘুরে বেড়ানো। একা একা নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলেও। সামনা সামনি সমবয়সী বন্ধুরা এসে পড়লে, উলটো দিকে চলে যায় মতি।

একা কারখানার ভেতর তার বেশ কাটে। অন্ধকার কারখানায় জোনাকি ঢুকে গেলে, বেশ স্বর্ণরেখার ওড়াওড়ি দেখে কাটে তার। কখন যে ঘুমিয়ে পড়ে, নিজেই জানে না। নানারকম স্বপ্ন দেখে মতি। বেশ। চমৎকার লাগে। স্বপ্নের ভেতর দিদিকে পায়। অদ্ভুত সঙ্গ পায় তার। সে সব সঙ্গ সে আদৌ লাভ করেনি। স্বপ্ন ভেঙে যাবার পর, স্বপ্নের বিস্ময় তার চোখে ও মনে লেগে থাকে কতক্ষণ। আর জাগরণের ভেতর তেমন কিছু ভাবনার স্রোত তৈরি হয়। নারী পুরুষের সঙ্গমের রহস্য সে জানে না। কিন্তু ভাবনায় নানা অনুভূতিমালা তৈরি হয় তার। যুবতীদের দেখে, নানা ভাবনায়, বস্তুগত সাদৃশ্যে, সারাক্ষণ মন তার একই কথা ভেবে চমকিত থাকে।

গতকাল সন্ধেয়, মির্জাপুরে ট্রামলাইনের ধারে দেয়ালে একটা পোস্টার দেখেছিল তাকিয়ে তাকিয়ে। অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়েছিল। অর্ধনগ্ন এক মেয়ের ছবি। কোনো মেয়ে দেখলে, মিতাদি চলকে ওঠে তার মনে, এই ছবি দেখার ভেতরও মিতাদি ভাবনায় চলে আসে। কাল এই পোস্টারটাকে আবিষ্কার করেছে। ঘুম থেকে উঠে, জলখাবার খেয়েই সে ছুটে এসেছে তাই।

মির্জাপুর সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডের সীমান্ত এলাকা। একটু আলোকিত অঞ্চল। দু-পাশে কাগজের দোকান। মিষ্টির বাক্সের দোকান। দু-সারি ট্রামের লাইন আছে। মাঝে মধ্যে ট্রাম এসে পড়ে।

ছবিটা পেয়ে যায় মতি। রেলিঙে পিঠ ঠেকিয়ে তাকে একটু পেছনের দিকে হেলতে হয়। উঁচু দিকে চোখ রেখে দেখল মেয়েটাকে। ছবির নীচে ইংরাজীতে কী সব লেখা। মতি A B C D পড়তে পারে। বানান করতে পারে না LOVE OF NIGHT. ওভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছবিটাকে দেখে। চমৎকার অনুভূতি হয়। সিনেমা পোস্টার। ইংরেজি সিনেমা। সিনেমাটা কোথায় হচ্ছে জানে না মতি। কাউকে জিজ্ঞাসা করলে বলবেই না। সিনেমা হলের নামের অক্ষরগুলি একটা একটা করে পড়ে মতি। GLOBE. এবং বার বার পড়ে। মুখস্ত করে ফেলে। উচ্চারণে কী হয় জানে না। পাটোয়ার বাগানের মুখটায় একটা মসজিদ আছে। মসজিদে মৌলবী সাহেব থাকে। আজান দেয়, নামাজ পড়ায়। আর ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের পড়ায়। ইংরেজি

পড়তেও জানে। তাকে জিজ্ঞাসা করলে বলে দিতে পারবে।

পাশ ফিরে দূরে চোখ যেতে দেখল, আর একটা একই পোস্টার। এটা ছেড়ে ওটার দিকে দ্রুত পায়ে যায় মতি। দুজন লোকের সঙ্গে ধাক্কা লাগে তার। একজন ত খিঁচিয়ে উঠল। মারতে যায় আর কি। মতির কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে চোখ তুলে দেখল একই ছবি। দেখলে গা শির শির করে ওঠে। এক ভাল লাগা বোধ পায় মতি। পাশ ফিরে দেখল আরেকটা ছবি। ছুটে যায় পরের ছবিটার কাছে। ট্রাম লাইনে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখছে মতি, ছবিটাকে। পেছনে ট্রাম এসে ঘণ্টি মারছে, শুনতে পাচ্ছে না মতি। মতি সরছে না দেখে ট্রামটাও যেতে পারছে না। লাফ দিয়ে ড্রাইভার নেমে, মতিকে হাত দিয়ে একটা ধাক্কা মারে। মতি গড়িয়ে যায় ট্রাম লাইনের ওপর। ট্রামটা তার পেছনে আছে দেখে, ফট করে রেলিঙের দিকে চলে যাবার মুহূর্তে মতি দেখল মিতাদিকে ওপারে। মিতা তাকে দেখতে পায়নি। ট্রামটা না গেলে সে ছুটে যেতে পারছে না। ট্রামটা চলে যাবার অপেক্ষা করে।

ট্রামটা চলে যাবার পর দেখল মিতাদি অনেকটা এগিয়ে গেছে। প্রথম ছবিটার নীচে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। দ্রুত হাঁটে মতি। লোকজন ফুট জুড়ে হেঁটে আসছে হেঁটে যাচ্ছে। লোকজনের সঙ্গে অনবরত ধাক্কা খাচ্ছে মতি। মিতাদি হারিয়ে গেল। তার মানে রামনাথ বিশ্বাস লেনের গলিতে ঢুকে গেছে। রামনাথ বিশ্বাস লেনে মতি পড়তে, দেখল মিতা বাজারের বাঁ-দিকের রাস্তা ধরে সোজা হাঁটছে। এলোমেলো লোকজনে, ঠেলা ভ্যানরিকশয় সংকীর্ণ গলি। বুদ্ধু ওস্তাগর লেনে এসে, একেবাধের মিতার গায়ের কাছে পড়ে মতি। 'দিদি।'

মিতা তাকায় আর হেসে ওঠে। মিতা মতির কথাই ভাবছিল। থমকে দাঁড়িয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে হাসিটাকে স্থির ধরে রাখে মিতা। 'কি রে পেছনে কখন এসে পড়লি ?'

মিতার হাসিটা দেখে পোস্টারের ছবিটা মনে পড়ে যায় মতির। 'এই ত এলাম।'

'হাঁপাচ্ছিস যে ?'

'অনেকক্ষণ পেছন পেছন ছুটছি।'

'কোথায় দেখতে পেলি ?'

'মির্জাপুর থেকে।'

'ও বাবা।' মিতা হাসে। মিতার হাসিটা কাঁচা রোদের রঙ পেয়ে টকটকে লাল হয়ে ওঠে।

মতির বাঁ-হাতটা ধরে মিতা। এবং মতির হাত ধরেই হাঁটতে থাকে তারা।

'কালকে বাড়িতে ছিলে ? এলে না ?' মতি মিতার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাঁটে।

'বাড়িতে ছিলাম। ট্রেন ফেল করেছি।' মিতা মিথ্যে কথা বলে। মাঝে

মাঝে মতিকে দেখে আর মতির হাত ধরে মন্থর পায়ে হাঁটে। যেন মতিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

মতি বলল, 'তুমি ইংরেজি জানো?'

'দূর বোকা, তা হলে এখানে পড়ে থাকব কেন! এ কথা মনে হল কেন তোর?'

'এমনি মনে হল।'

'এমনি এমনি কিছু মনে হয় না। কিছু ভেবেই জিজ্ঞেস করেছিস।'

'না না।'

'এই বোকা, দিদিকে মিথ্যে কথা বলতে নেই। পাপ হয় জানিস না?'

মতি হেসে ফেলে। 'সিনেমা হলের নাম জানতে চাইতাম।'

সিনেমা হলের কথায় মিতা একটু মুষড়ে পড়ে। কপাল কুঁচকে নিল। খুব ক্লান্ত বিমর্ষ দেখাল মিতাকে। বিষণ্ণতায় ভেতরে ভেতরে ব্যথিয়ে উঠছে। তার পর হাঁটতে হাঁটতে মুখ না ফিরিয়েই মিতা বলল দূরাগত স্বরে 'সিনেমা দেখতে চাস!'

'হ্যাঁ।' মতি সম্মতি জানাতে আর দেরি করে না।

মিতা চলা থামিয়ে দিয়ে মতির মুখের দিকে তাকাল। 'সিনেমা দেখতে চাস?'

এবার মতি মিতার চোখে চোখ ফেলে ঘাড় কাত করে সলজ্জ মুখে। মুখ তার রাঙা হয়ে ওঠে।

দু নম্বর কালী সোম স্ট্রিটের ...সের মুখটার স্ল্যাবটায় পা দিতে নড়ে স্ল্যাবটা, কেঁপে ওঠে স্ল্যাবটা। কেঁপে ওঠে মিতার শরীর।

চোদ্দর তিনের গলির ভেতর ঢুকে, দেয়ালের দিকে সরে গিয়ে, দেয়ালে পিঠ রেখে থমকে দাঁড়িয়ে যায় মিতা। 'তুই আমার সঙ্গে সিনেমা যাস দোষের নয়, তুই ত আমার ভাই রে—কিন্তু তুই যে আমার সঙ্গে সিনেমা যাস কাকে কাকে বলেছিস?'

'কাউকে না।'

মিতা দেখে, মতির ফের মুখটা টকটকে লাল হয়ে ওঠে।

'কে বলে মতি বোকা রে!'

'আমি বোকা হব কেন? আমি কি বড় হই নি?'

'খুব চালাক তুই? খুব বড় তুই?'

মতি রাঙা হাসে।

'তোর গোঁফ দেখি?' গোঁফের রেশের ওপর ডান তর্জনী বুলোয় মিতা।

মতি শিহরিত হয়। ভাল লাগে।

'না, তোর গোঁফ খুব ভারী হবে।'

'যাবে ত সিনেমা?'

'আমার সঙ্গে দেখতে তোর ভাল লাগে ?'

রাঙা মুখ কাত করে মতি।

'আমার অত সিনেমা ভাল লাগে না। তুই ধরিস বলে যাই। আমি ত ঘুমিয়ে পড়ি কতবার।'

'বেশ কর ঘুমিয়ে। যাবে কি না ?'

'যাব।' মতির কান মলে দেয় মিতা।

'টিফিনের সময় আসবে ত ?'

'মজিদ মালিকের ঘরে তুই আয় না।'

মতি মাথা নেড়ে সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি জানায়।

মিতা একটা মৃদু হাসি দিয়ে পেছন ফিরে চলতে শুরু করে।

হাঁ-করে মিতাকে দেখে মতি। অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। গলিতে হেঁটে যাওয়া রাস্তায়, যতদূর পর্যন্ত দেখা যায়, ততদূর পর্যন্ত সে দেখে। চোদ্দর তিন গলি থেকে চোদ্দর চারের গলিতে ঢুকে গেল। এবং সেই অদৃশ্য পথের দিকেও সে তাকিয়ে থাকে। কোন মায়া অঞ্জন লেগে থাকে মতির চোখে ? মতির বয়স কম, সে বেশি কিছু জানে না।

সকালের কাঁচা রোদের আলোয় মতির শরীর দূর্বার মত মিষ্টি দেখায়। লোকজনও তেমন এখনো আসে নি। প্রসন্ন সকাল ছুঁয়ে থাকে মতির শরীরে। টাটকা আনন্দের ভেতর সে ঘুরে-ফিরে মরে। ক্লান্তিহীন পোকার মত তার প্রাণতা। খুব সকালবেলা উঠে জল তুলেছে। স্নান করেছে। একটু পরেই তাকে কাজে বসে যেতে হবে। রিম রিম কাগজে রুলিং টানা হবে। কিছু স্টপ্ কাজ হবে। আর সব হবে রানিং কাজ। রানিং কাজ সহজে হয়ে যাবে। শুধু টুলের ওপর বসে কাগজ লাগিয়ে গেলেই হবে। সেগুলোকে শুধু গুছোবার দরকার। বিজয়দা রুলিঙে বসলে মতি নিজেই কাগজ গুছোয়। রিমের পাহাড় খসায়, রিমের পাহাড় গড়ে।

কোন বালিকাকে যদি সে ভালবাসতে পারত ? তার বিয়ে হলে ত কোন কমবয়সি মেয়ের সঙ্গেই বিয়ে হবে। বিয়ের স্বপ্ন তার মনে জড়ো হয়। সারাক্ষণ। কিন্তু এখন তার বিয়ে হবে না। সে এখন তেমন রোজগার করতে পারে নি। মিতাদি যদি তার এই মনের কথা জানতে পারে তা হলে, ক্ষেপিয়ে মারবে তাকে। মিতাদি যদি বলে, তুই আমাকে বিয়ে কর ? ধ্যেৎ ! লজ্জা লজ্জা ! কিন্তু মিতাদির সঙ্গ তার ভাল লাগে। মিতাদি যদি তাকে বিয়ে করতে চায়, তা হলে সে রাজি হয়ে যাবে। মতি জানে, শুধু শুধু এ-কথা ভাবছে সে। মিতা তার চেয়ে কত বড়। মিতাদি যদি চায়, তা হলে সে মিতাদির বুকের ভেতর ঢুকে যেতে পারে।

মসজিদের বারান্দায় দাড়িওয়ালা বুড়ো মৌলবি বসে বসে তসবি গুনছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মৌলবিকে দেখে মতি। মৌলবিটা বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েদের

ইংরেজি পড়ায়। দু-একটা ইংরেজি কথায় কথায় বলে থাকে। হাঁটু ভেঙে নামাজে বসার ভঙ্গিতে বসে আছে। দাড়িতে মেহেদির রঙ।

'কী দরকার? তেল পড়ে দিতে হবে?'

'না। GLOBE-তে কী হয়?'

'গ্লোব।'

চোখ নেচে ওঠে মতির। গ্লোব। গ্লোব সিনেমা। ধর্মতলার দিকে আছে। সেখানে সুন্দর সুন্দর বাড়ি আছে। অনেক গাড়িঘোড়া।

মতি পেছন ফিরে চলে যাচ্ছিল, মৌলবি পেছনে ডাকে 'এই ছোকরা!'

মৌলবির ডাকে এগিয়ে এসে আবার দাঁড়ায় মতি।

'গ্লোব মানে জানিস?'

মাথা নাড়ে, না জানায় মতি।

'গ্লোব মানে গোলোক। গোলোক মানে গোল। যেমন পৃথিবীটা গোল। মৌলবির পান-খাওয়া তেঁতুলবিচির মত দাঁতগুলো হেসে ওঠে। টুকটুকে লাল জিভ। 'কার ঘরে কাজ করা হয়?'

'লক্ষ্মী সাহার ঘরে।'

'চোদ্দর তিনের ঘর?'

মাথা হেলিয়ে হ্যাঁ জানায় মতি।

'ও ঘরটা ছিল কেরামতের। ওপারের লোক। ঢাকা জেলায় ঘর। কেরামতের হাতে গড়া কারিগর মইনুকে দিয়ে কেরামত চলে যায়। তা বিশ বছর হল। তখন বুড়ো হয়ে গেছে কেরামত ওস্তাদ। খুব পুরনো ওস্তাদ। যখন মশারি খাটিয়ে রুলিং কাজ হত। কীভাবে কাজ হচ্ছে, দেখে যদি শিখে ফেলে, তাই মশারি খাটিয়ে কাজ হত। তখনকারের লোক ছিল কেরামত। কেরামত বুড়ো বয়সে এদেশের ঝিউড়িকে বিয়ে করে বসে। তারপর ওদেশে গিয়ে খুব অভাব অনটনে কষ্ট পেয়ে মরে গেছে শুনেছি। মইনু চালাতে পারল না কারখানা। তার কাছ থেকে লক্ষ্মী সাহা কারখানা নেয়।'

মতি গ্লোব কথাটা মুখস্ত করে ফেলে। চলে যাবার জন্যে পেছন ফেরে।

অমনি বুড়ো মৌলবি ধমকে ওঠে 'এই বেয়াদব ছোকরা! কথা শেষ করতে না দিয়ে চলে যাওয়া মহা বেয়াদবি। ঘর কোথা?'

'নেতড়া।'

'সাগরেদ হয়েচ?'

'না, নিম কারিগর।'

'কখনো নয়। নিম কারিগর হতে হলে আরো উমর বাড়বে তোর।'

'না—'

'ঢের বাকি ছোকরা।'

'কাজে যাব।'

'তবে দাঁড়িয়ে কেন? যা যা।'

'কী বললেন, বলুন।'

মৌলবি ফট করে চোখ বুজে তসবি গুনতে শুরু করে দেয়।

মতি কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে পেছন ফিরে দেখল, মৌলবি তসবি গোনা বন্ধ করে তার পথের দিকে তাকিয়ে আছে।

আজ সবিতা কাজে আসে নি। সেলাই করতে করতে চোখ ঘুমে ঢুলে আসে মিতার। গলার ভাঁজে ঘাম ভরে আছে। মুখে, ঠোঁটের ওপর কিছু কিছু ঘাম। চোখ বুজে গেলেই, সেই দৃশ্যটা চলে আসে মিতার। গোটা পদ্মা নদী তার চোখে চলে আসে। এবং চোখ বুজলেই। অথচ তার চৈতন্যে থাকে মজিদের কারখানায় আছে। কিন্তু পদ্মা নদীটা চোখ বুজলেই এসে যায়। আর চোখ জুড়ে আকাশ নদী সমান হয়ে ওঠে। তীরে পায়ের তলার মাটি কতটুকু আর! আকাশ ও নদী মিশে আছে। দূরে দূরে কালো নৌকো-গুলি যেন খেলনা, ছেলেখেলা। এতখানি প্রসন্ন ঔজ্জ্বল্য যে, চোখ থেকে সরানো যায় না। এই কটা বছরেও হারিয়ে যায় নি। নদীর পলিমাটি যেন এখনো গোড়ালিতে লেগে আছে। বাস উঠে গিয়েছিল বোটের ওপর। আরো, আঠার বিশটা বাস লরি উঠে গিয়েছিল। তারপর বাস লরিগুলো নিয়ে বোট নদী পারাবার করতে লাগল। আরিচা ঘাট। নদী আর থামতে চায় না। দূরের নৌকো কাছে আসে, তবু নদী শেষ হয় না। তীরের দোকান পসারি মুছে যায় তবুও নদীর আর-তীর পায়ের কাছে আসে না। হাওয়ায় আঁচল পত পত করে ওড়ে। হাওয়ার শব্দে ও দোলায় একা একা কাঁদলে পাশের জন টের পায় না। ছেমড়ারা শশা বেচে, ঝালমুড়ি বেচে। আর দুজন লোক কাটা পেঁপে বেচছিল। দুজন লোক বড় বড় মাটির হাঁড়িতে ঘোল বেচছিল। হুড়কিতে ডুবিয়ে গেলাসে ফেটে নুন দিয়ে খদ্দেরদের দিচ্ছিল। দুজন নুলো ভিখিরি ছিল। একজন অন্ধ গায়ক ভিখিরি। কাচের ঘরে বসে থাকা সারেং পান চিবুচ্ছিল। তার পেছনে নীচে ছোট ঘরটায় তার বিবি রান্না করছিল। তার কাছে ছিল একটি শিশু আড়াই বছরের। কাছি ফেলা লোকটা দাড়িওয়ালা। ছোটখাটো, কিন্তু শরীরের বাঁধন ভাল। তাকে দেখে গ্রামের আসাদ আলি বলে বার বার ভুল হচ্ছিল মিতার।

এবং ভুল হয়। এমন অনেক কিছুতে ভুল হয়। চোখ বুজে আছে, চোখ খুললেই যেন সে পদ্মা নদী দেখবে। এবং এই ভুলের মিথ্যে অনুভূতি চোখে মনে নিয়ে দিন পোহানো। অমন বড় একটা নদী চোখ থেকে চলে গেলে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। অমন একটা দেশ চোখ থেকে সরে গেছে। অমন সুন্দর মাঠ প্রান্তর গাছপালা। নির্জনতা। আহা! ক্রমাগত মনে পোকার মত ওড়ে ও-দেশের প্রকৃতি। মিতা জানে, সে যখন হাঁটে তখনো ও-দেশটা

তার সঙ্গে হাঁটে। সে যখন কথা বলে, ও-দেশটার মানুষ হয়ে কথা বলে। লতার মত পায়ে পায়ে জড়িয়ে যায় ও-দেশ। বাংলাদেশ। জয়বাংলা। কত মাইনষে দেশডারে স্বাধীন কইরাসে। কত মানুষ মইরল। এ-সব কথা রেডিও কয়। মিতাও কয়। ঘুম ভেঙে জাগরণে এখনো বিভ্রম হয়, সে পেয়ে যাবে দেশটাকে। এবং তা যেন এক মুহূর্ত তার হাতে এসে ধরা দেয় অনুভূতি মায়ায়। যেমন দেখব বললে শাপলা দেখা যেত, দোয়েল দেখা যেত। ঘাসফড়িং, বুনো গন্ধ। জলের নরম গন্ধ। পায়ে ধুলো-কাদা। বাতাসে চোখ শীতলতায় ভরে উঠছে।

গ্রামের আসাদ আলিরে কতদিন দেখি নাই। আসাদ আলি মিষ্টি স্বভাবের মানুষ। থমকে দাঁড়িয়ে কথা জিগায়। আসাদ আলি পৃথিবীতে ছিল না, এখন মনে হয়। হাসিনা ভাবি কইত, তার স্বামীর রোগ সেরে যাবে। এই আশ্বাস তখন কতখানি মনে শক্তি জোগাত, তা জানে মিতা।

দিপু বাসে সারাক্ষণই ঘুমিয়ে। আর মিতার মন কেমন করে সারাক্ষণ। কান্নায় টল টল করছিল সারা শরীর। মুখ ভরে উঠছি। কান্না। পদ্মার বুকে কেঁদে চললে হাওয়ার শব্দে কান্নার শব্দ তুলে নেয় পদ্মা, হাওয়া তুলে নেয় অশ্রুগুলি। পদ্মার বুকে কাঁদলেও কাঁদা হয় না। আবার পদ্মা কান্নার পরিবেশ দেয়। আঁচল উড়ে যাচ্ছিল, আঁচলটা সামলাতে গিয়ে, আঁচলে বাঁধা চাবির গোছা হাতে পেয়ে নতুন করে আকুল করা কান্না আসে। সারেং খালাসি জানে না। সারাক্ষণই মনে হচ্ছিল মানুষটাকে ঘরে রেখে এসেছে। এই বিকেলে, দোকান খুলতে যাবে। দাওয়ায় বসে কিছু একটা সংসারের কাজ করছে। পাট দিয়ে রান্নাঘরের শিকে বানাচ্ছে। অথবা জল চেয়ে না পেয়ে নিজেই ঘটিতে জল গড়িয়ে নিচ্ছে। ঘর বার করে গামছাটা নিজেই খুঁজে নিচ্ছে। চালার বাতায় কিছু একটা খুঁজছে। একটুকরো ব্লেড অথবা কানে ঘোরানোর মুরগির পালক। এক ঝাঁক কবুতর উড়ে এসে, নেমে পড়ে যদি উঠোন পেরিয়ে, খোলা দরজা দিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে গিয়ে সরার মুসুর কড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তা হলে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরস্ত করছে লোকটা

দেওর অনন্ত সঙ্গে ছিল, ইন্ডিয়া আসার পথে। পদ্মার বুকে বাস থেকে নেমে দাঁড়িয়ে ছিল বাতাসে। চোখে কালো চশমা আঁটা ছিল। রোদের চশমা। অনন্ত তার চোখ দুটি লুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে, মিতার আরো আশ্রয়হীন মনে হয়েছিল। অনন্ত এক ছেমড়ার কাছ থেকে শশা কিনে খেল। ব্যাগের ভেতর পুঁটলিতে মুড়ি ছিল, মিতার কতক্ষণ খিদে পেয়েছে, কিন্তু বের করে খেতে সাধ যায় নি। খেতে মন সরছিল না। শরীরের ভেতর খিদে সুপুরির মত আটকে ছিল।

পদ্মার বুকে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে মিতা। চোখ খুললেই দেখতে পাবে পদ্মা নদী। হাওয়ায় তার আঁচল উড়তে থাকবে। দু-পাশে ছবির মত

ছড়ানো-ছিটানো নৌকোগুলো দেখতে পাবে। কত দূরের নৌকো কত ছোট দেখা যায়। এই দেখে, কাছের মানুষকে কাছে কাছে রাখতে ইচ্ছে করে। মনের দূরে নয়নে চলে আসে। নয়নে মন খেলা করে। প্রিয় মনের মানুষ নয়নে ধরা দিতে চায়। মন যেন নয়ন হতে চায়।

চোদ্দর-তিন পাটোয়ার বাগান মজিদের কারখানার মাচায়, ফর্মার স্তূপের পাশে, সংকীর্ণতায়, হাঁটু মুড়ে বসে, তন্দ্রায় মুখ নুইয়ে, যেন সে পদ্মার বুকে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম ভেঙে গেলে, চোখ খুললে পদ্মা দেখতে পাবে, এই শান্তিতে আরো ঘুমোয়। কিন্তু চৈতন্য জানে, সে মজিদের কারখানার মাচায় এই বিভ্রমের কটা শান্তি আছে বলে, বিভ্রমে থাকতে ভালবাসে। মানুষের দেখা না ফুরোয়, দেখতে দেখতে চোখ চলে যায় ত যাক। দেখার শান্তি না পেলে, চোখ নিয়ে কী হবে? দেখার বিভ্রমের ভেতর শান্তি পেলে দেখবে।

মইয়ে কারো উঠে আসার শব্দ।

'এই যে দিদি, ঘুমিয়ে পড়লে হবে? কাজ করবে কে?'

চোখ মেলে দেখল মজিদ। মালিক মাচায় উঠে এসেছে।

মিতা ঘুম তাড়াতে ডান হাতখানা আড়াআড়ি চোখে চেপে রাখে। বিশৃঙ্খলা সরাতে চায়। কিন্তু পদ্মা ফুটে ওঠে চোখে আয়ত হয়ে।

'ঘুমাবেন না ত! পার্টির কাজ দেব কী করে? ছোড়দি আসে নি দেখছেন, তবু ঘুমায়ে পড়েছেন?' মজিদ সেলাই করা ফর্মা গুছোয়।

'বা রে, ঘুম পেলে ঘুমোব না?'

'বাড়িতে কী করেন? ঘুমোন না?'

'বা, বাড়িতে কত রাত হয় ফিরতে জানেন ত।'

'রাতে কী করেন, জানব কী করে?' মজিদ হাসে।

'একদম বাজে বকবেন না।'

'হায় আল্লা দিদি ফোঁস করে উঠলেন যে?'

'সব সময় মানুষের মন এক থাকে না।' মিতা করতল দিয়ে চোখ কচলায়।

মজিদ মুখ গুঁজে 'আপনাদের নিয়ে আর পারি না। আপনাদের কখন মন কী হয়, হাত গুনে বলা যায় না। সেদিন ত সবিতা রাস্তায় কাকে কাঁঠাল কিনে নিয়ে যেতে দেখে, মুখ ভার করে মাচায় এক ঘণ্টা বসে ছিল। ছোড়দির স্বামী কাঁঠাল খেতে ভালবাসত খুব।—কী হয়েছে আপনার?'

'কিছু না—মাথায় হাত দেবেন না ত।'

মজিদ মিতার মাথা থেকে হুকটা সরিয়ে নেয়। 'মাথায় কতখানি গরম চড়েছে দেখছিলাম।'

'দেখতে হবে না যান।'

'বারে খুকি।'

মজিদের এই কথায় খুক করে হেসে ফেলে মিতা। মুখে আঁচল তুলে চেপে ধরে।

'এই রে. খুকি হেসেছে।'

এই কথায় আরো হেসে লুটিয়ে পড়ে মিতা। 'ভারি, এসে হাসাচ্ছেন ত, যান। কত কাজ পড়ে রয়েছে।'

'কাজ পড়ে রয়েছে, এই মনে পড়ল? ঘুমাচ্ছিলেন ত বেশ।'

'শুয়ে ঘুমাচ্ছিলাম, এসে দেখলেন?'

'না, চোখ চেয়ে ঘুমাচ্ছিলেন।'

এই কথায় হেসে ওঠে মিতা। 'বেশ করব, ঘুমাব। মালিক হয়ে একেবারে মাথা কেটে নিচ্ছেন। আপনার মত কত মালিক গড়াগড়ি খাচ্ছে রাস্তাঘাটে।' মনে হল মিতার, কথাটা বলা ঠিক হয় নি, তখন আরো একটু হেসে সামাল দিতে চায়। 'রাগ করলেন নাকি দাদা? হাসির ছলে বললাম।'

'হ্যাঁ রাগ করেছি।' নকল রাগের স্বর।

'দোষ করেছি যখন ছোট বোনটারে শাস্তি দেও। তবে আপনার মত মালিক' হেসে লুটিয়ে পড়ে মিতা।

মজিদ বই গুনছিল। 'বলে যান। থামলেন কেন?'

মিতা হাসি থামিয়ে নিয়ে, ঠিকঠাক হয়ে 'দাঁড়ান কাজে বসি।' সেলাইয়ে বসে, শান্ত হতে চাইল। বার দুই গলা খাঁকারি দিয়ে নিল। 'আপনার বউ-টাকে তাড়িয়ে দিলেন কেন?'

'তাড়ায়ে দিলাম? ডাক্তার দেখাতে এসেছিল, ঘরে গেল।'

'ঐ হল। এক সপ্তাহও রাখলেন না।'

'কলকাতায় থাকতে চায় না মোটে। হাঁপিয়ে ওঠে।'

মজিদের এই কথার স্বরে মজিদকে মিতা অনেকখানি অকৃত্রিম দেখে। মিতা সেলাইয়ে ডুবে যায়।

মজিদ নীচে নেমে গেল।

মিতার খুব ইচ্ছে গেল মাচার কিনারে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে মজিদকে এক-বারটি দেখে। হামা দিয়ে তখুনি নিঃশব্দে মাচার প্রান্তে মুখ বাড়াতে দেখল মতি দরজায় সই হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মিতার সঙ্গে চোখাচোখি। মতিকে দেখে মিতার চোখ হেসে উঠল। বুকের ভেতর ঘাম গড়িয়ে গিয়ে সড় সড় করে। আঁচল বুক ভরে রাখলে এমনটা হয় না। আঁচল ঘাম শুষে নেয়। কিন্তু বুকের দুধ ফিনকি দিয়ে আঁচলে ছড়িয়ে পড়লে শুষে নিতে পারে না আঁচল। দিপুকে কোলে করে পাড়ার কনকদিদি বা আবজলের মেয়ে বেড়াতে নিয়ে গেলে অনেকক্ষণ. বুকের দুধে আঁচল ভরে যেত। টনটন করে উঠত বুক। চাপ দিলে ফিনকি দিত বুকের দুধ। আঁচল অনেকক্ষণ ভিজে থাকত। আর মাটিতে টসে পড়লে, সহজে শুষে নিতে পারত না মাটি। শাদাটে ভাবটা অনেকক্ষণ ধরে থাকত। গাই দুধ গোয়ালা খাঁটি না জলঢালা দিচ্ছে, এটা বুঝতে আঙুল ডুবিয়ে মাটিতে ফোঁটা ফেলে দেখে মানুষ। জল মেশানো দুধ

হলে, মাটি সঙ্গে সঙ্গে শুষে নিত। খাঁটি দুধ হলে শুষতে পারত না মাটি। শাদাটে ভাবটা অনেকক্ষণ ধরে থাকত। আর শিশু অনেকক্ষণ বুকের দুধ খাচ্ছে না, বুক ভরে উঠছে, নড়াচড়ায় ফিনকি দিয়ে বুকের দুধ আঁচল ভিজে উঠছে, বুকে দুধের ভারে কষ্ট পাচ্ছে। মন উতলা হয়ে উঠছে শিশুর জন্যে। বুক ব্যথিত হয়ে উঠছে শিশুর জন্যে। আঁচল শুষে নিতে পারবে না, অনেকক্ষণ গায়ে ভিজে থাকবে।

'এই মতি, উঠে আয়।' মতিকে ডাকল মিতা।

মন কেমন ঘন হয়ে ছিল। অনেকক্ষণ কাজের ভেতর নিজের মনে নানা কথা উজোল পাজোল করছিল মিতা। সবিতাও ছিল মাচায় তার মুখোমুখি। এই অবস্থায় নেমে আসে মই বেয়ে মিতা। তারপর চোখে সে ধোঁয়া দেখে। সে বুঝতে পারছে, সে পড়ে যাচ্ছে কারখানার মাটিতে। এবং লুটিয়ে পড়ছে।

তারপর মনে হল তার মাথার চারপাশে এবং মাথার ভেতর একটা ভ্রমর গুনগুন গান গেয়ে চলেছে। কারখানার সবাই তাকে ঘিরে ধরেছে। তাকে ঘিরে ধরে সকলে কতরকম সেবা শুশ্রূষা করছে। ভ্রমরটা গান গায় মাথার ভেতর পাক খেতে খেতে। স্নায়ুতে সেই গানের অনুভূতি চারিয়ে যাচ্ছে। এবং সে চাইছে, এই ভ্রমরের গান আরো অনেকক্ষণ শুনতে। সে চাইছে, আরো অনেকক্ষণ সকলে তাকে ঘিরে ধরে থাকুক। আরো অনেকক্ষণ সবাই তার সেবা শুশ্রূষা করুক। সে উঠতে পারবে জেনেও উঠতে চাইছে না। সে জ্ঞান ফিরে পেতে পারবে জেনেও ফিরে পেতে চাইছে না। এবং সে এমন একটা অনুভব তৈরি করে যে, তাতে তার জ্ঞান ফিরছে না। সকলে তাকে ঘিরে ধরুক। সকলে তার সেবা করুক। সে এরকম অবস্থায় থাকতে চাইছে।

ভ্রমরটা অন্ধকারের ভেতর গান করে যায়। খুব মিষ্টি অনুভূতির গান। তার বুকের কাপড় বিস্রস্ত অনেকের চোখে হলেও, এই বিস্রস্ততার সে কী জানে? সে ত মাথা ঘুরে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছে। বুকের কাপড় বিন্যস্ত করবে কী ক'রে সে? সে তার নিজের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে শূন্য করে ফেলেছে। অনেকের দায়িত্বের মধ্যে চলে গেছে। এবং এই জ্ঞান না হারালে অনেকে তার দায়িত্ব নেবে না। অদ্ভুত ঘোরে ভ্রমরটা। গুন গুন করে। গান গায়। একটা কালো অন্ধকার গোল হয়ে থাকে। শীতল অন্ধকার।

মিতা কাউকে দেখতে পায় না। কিন্তু প্রত্যেকের উপস্থিতি টের পায়। তাদের তাকে নিয়ে নানা ব্যস্ততা যেন দেখতে পায়। তাকে নিয়ে অনেক কথা তৈরি হচ্ছে। অনেক তৎপরতা তৈরি হচ্ছে। সে চাইলেই যে উঠে পড়তে পারে তা নয়। কারণ সে উঠতে চাইছে না। সে এরকম অবস্থায় থাকতে চাইছে।

ভ্রমরটা তার শরীরের চারপাশে ঘুরছে। মিষ্টি অন্ধকার ছেয়ে আছে চারপাশে। অদ্ভুত ঠাণ্ডা বোধ। সুন্দর শীতলতা। কারো কণ্ঠস্বর শুনতে পায়

না, কিন্তু ভ্রমরের গান শুনতে পায়। খুব মিহি নির্জনস্নিগ্ধ সুরে। মাথার ভেতর এসে যেন বসেছে। স্নায়ুতে ছড়িয়ে পড়ছে। একটা রঙিন ঘুড়ি যেন, অনেক দূরের আকাশে উড়ছে!

চোখ খুলে গেল মিতার। সে দেখল, সকলে ঘিরে আছে তাকে। মজিদ মিয়া, জলিলভাই, সাগরেদ, বস কারিগর। সে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল। মতিও খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। মুখ ভিজে আছে জলের ঝাপটায়। চোখ ভিজে আছে। চোখের পাতাদুটি ভারী হয়ে আছে শীতলতায়।

মিতা বলল 'কী হয়েছে আমার! সকলে—'

'না কিছু হয়নি।' মজিদ।

মিতা কাপড় সামলায়।

সামনে মতি করুণ মুখে মিতার দিকে তাকিয়ে আছে। পাথরের মত তার মুখ। যেন মতি হাসতে জানে না।

'ঐ একটু মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন।' মজিদ 'একটু চুপ করে বসেন। কাজ-ফাজ করতে হবে না। এই সবে তিনটে বাজে, বেলা পড়লে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাবেন। সঙ্গে লোক দেব।'

মিতা হাঁটুর ওপর আড়াআড়ি দুটি হাত রেখে তার ওপর মুখ চেপে ফোঁস ফোঁস করে হঠাৎ কেঁদে ফেলে। তারপর সঙ্গে সঙ্গে মুখ তুলে আঁচলে চোখ মুছে উঠে দাঁড়ায়।

মজিদ 'এখন উঠবেন না, কাজ করতে হবে না আপনাকে। বাড়ি চলে যাবেন একটু পরে।'

'না, কাজ করব।' তরতর করে মই বেয়ে ওপরে উঠে যায় মিতা।

নিচে উৎকণ্ঠিত মজিদ 'কথা শুনলেন না দিদি?'

'ভয় নেই, ভাল আছি। অত সহজে মরব না।'

'না মরলেই ভাল।'

'মরলে আপদ যায় বলুন।'

'আপদ হতে যাবেন কেন!'

সবিতা মই বেয়ে উঠে 'ভারি খেলটা দেখালি দিদি। তার পরে আবার কাজে বসে গেলি?'

'কী করব, কাজ করে খেতে হয়, কাজ করব না?'

'কেন, একবেলা নাইবা কাজ করলেন। বড় দাদা হয়ে বলেছি, কথাটার মূল্য দিচ্ছেন না!'

'চুপ করে বসে থাকা যায় নাকি?'

'কেন, বাইরে যান, হাওয়া খাবেন, পান কিনে খাবেন, চা খাবেন।'

মজিদ মাচার নীচে মইয়ের কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলে।

মিতা তেমন স্বরেই বলে 'পান খাবার চা খাবার পয়সা নেই।'

'আমি দিচ্ছি। এখানে মরলে কত বিপদে পড়তাম বলুন ত। আচ্ছা বেঁচেছি। থানাপুলিশ হত। চা-পান খেতে একটাকা দিতে পারব না আর?'

মই বেয়ে তরতর করে নীচে নেমে এসে মজিদের সামনে হাত পেতে দাঁড়ায় মিতা। 'দিন।'

মজিদ চমকে ওঠে 'ও বাবা, এ মেয়ে মরবার নয়।'

জলিল মিয়া সাগরেদ কারিগরদের নিয়ে কাজে বসে গিয়েছিল। সে মুখ তোলে 'সহজে মরবে মনে করেছেন?'

'এই বুড়ো, তুমি একদম কথা বলবে না।'

মজিদ একটা কাঁচা টাকা হাত বাড়িয়ে ধরে মিতার দিকে। মিতা টাকাটা ছোঁ মেরে নেয়। তারপর পেছন ফিরে মতির হাত ধরে। 'চল মতি, চা খেয়ে আসি।'

মতির মনটা ধূসর হয়ে ছিল। মিতার হাতের ছোঁয়ায় প্রসন্ন হয়ে ওঠে মতি। দরজা থেকে গলিতে টেনে নামায় মতিকে মিতা। মিতা মতির ডান হাতটা আবেগ দিয়ে চেপে আগে আগে হাঁটছে। সেই টানে সমর্পিত মতি। যেন এমনটা চায় সারাক্ষণ। মিতাদি তাকে টেনে নিয়ে যাক। সে পলল ধ্বসের মত নেমে যায়। আবেগে আবেগে ভরে ওঠে। 'দিদি, তোমার কিছু হয় নি ত?'

'না রে।'

'তুমি মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলে। জ্ঞান হারিয়েছিলে।'

'তাতে কার কী আসে যায়?'

'তুমি কি ঠিক মত খাও না, ঘুমোও না?'

এক পলক পেছন ফিরে মতিকে দেখে মিতা। ঠোঁটে ম্লান হাসি লেগে থাকে 'কাজ ফেলে দেখতে এলি যে?'

'এক ঘণ্টা কাজ বেশি করে দেব।' মতি অনুভব করল তার ডান করতল ঘেমে নেয়ে গেছে। তার সমস্ত শরীর ঘামছে। সাঁড়াশির মত যেন তার হাতটা ধরেছে মিতাদি। 'তোমার শরীর তুমি যত্ন নাও নি।'

মিতা কোনো কথা বলছে না।

মতি আবার বলছে 'তোমার যদি কিছু একটা হয়ে যেত?'

কথাটার কোনো জবাব না পেয়ে আবার বলে 'আমিই হয়তো জানতে পারতাম না।'

'মতি তুই আর অন্য কোনো কাজে ঢুকতে পারিস না?'

মিতা মতির হাতটা ধরে রেখেই এগিয়ে যেতে যেতে পেছন না ফিরেই বলে।

'না।' মতি মিতার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। মতি জানে না কেন তার দিদি এ-কথা শুধোয়। সে কিছুই জানে না। 'কেন?'

'এই কাজে ত মাইনে কম।' মতিকে পেছন ফিরে দেখে মিতা।

'সেই ত।'

'তা হলে ?'

'কিন্তু আর কোনো কাজ যে জানি না।'

'কী কাজ শিখতে মন করে ?'

'গ্যারেজে মোটর মেকানিক্স-এর কাজ।'

'তবে শেখ না।'

'কে শেখাবে ? টাকা কই ? নিজের পয়সায় খেয়ে এক-দু বছর শিখতে হবে। জানাশোনাও নেই।'

'ব্যবসা করতে মন চায় না ?'

মতির চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। 'ব্যবসা করতে মন চায়।'

'কী ব্যবসা ?' মিতা মতিকে পেছন ফিরে দেখে।

সবজির ব্যবসা। শেয়ালদা থেকে মাল কিনে নেতড়া ইস্টিশানে বেচব।'

'ও ব্যবসায় টাকা লাগে ?'

'হ্যাঁ।'

'টাকা ত তোর নেই।' হাতটা ছেড়ে দেয় মিতা মতির। মুহূর্তে মতির নিজেকে খুব নিরাশ্রয় মনে হয়।

মিতা দোকানদারকে পান সাজতে বলে। পানে কী কী দিতে হবে বলে দেয়। তারপর পানটা নিয়ে মুখে পুরে চিবোয়। পানের বোঁটা নিয়ে চুন নিতে যায়।

সেই ফাঁকে মতি একটা সিগারেট কিনে ধরিয়ে ফেলেছে সটান। খুবই লায়েক ভঙ্গিতে টান দিচ্ছে। কেমন একটা অস্থিরতা ভাব এসেছে তার মধ্যে।

মিতা পেছন ফিরে দেখে. কিছু বলে না।

রাস্তার দুদিকে কারখানার বাইরে পাদানির মত চিলতে বারান্দা আছে। পান-দোকান থেকে সরে গিয়ে একটু ছায়ায় গিয়ে বসে মিতা। মতি তফাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে।

এখানে এই চিলতে বারান্দাকে ব্যবহার করে জুতোর প্যাকেটের কারখানার শিশু শ্রমিকরা। রাস্তায় শুকোতে দিয়ে, প্যাকেট সাজিয়ে সাজিয়ে এখানে রাখে। কারখানা থেকে রাস্তায় নামায়, শুকোতে দেয়। তারপর শুকনো প্যাকেট তুলে তুলে সাজায় বারান্দায়। বারান্দা থেকে মাল ডেলিভারি যাবে রিক্সাভ্যানে। রিক্সাভ্যান চালক নিত্যদিনের কাজে লাগে। এ-কারখানা ও-কারখানার ঘুরে ঘুরে কাজ করে। তেমনি মুটে ঠেলাওয়ালাও। এখানে রাস্তার ধারে নিভৃতে রাতের বেলা রিক্সাভ্যান ঠেলা রাখে। কোনো বাইন্ডিং কারখানায় নির্দিষ্ট জনের নির্দিষ্ট আস্তানা আছে। এরা অনেকে বিহার মুলুকের। কেউ কেউ ফুটপাথেও ঘুমোয়। এদের গায়ে গেঞ্জি, পরনে লুঙ্গি আর গামছা, এইটুকুই সম্বল। আর হয়তো বাড়তি একটা লুঙ্গি আছে। কোনো কোনো কারখানার নিভৃত খোঁজে লুকিয়ে রেখে দেয়। হয়তো একটু সাবান থাকে তাতে। ছোট শিশিতে একটু

কড়োয়া তেল। দু-একটা পুরনো চিঠিও সযত্নে রাখা থাকে। ওদের নামে কোনো কারখানার কেয়ার অফে চিঠি আসে। মুন্নিভাইকা চিঠ্‌ঠি, শিউচরণকা চিঠ্‌ঠি। ছ আট মাহিনা গুজার যায়, বহু বিবি বাল বাচ্ছাকে লিয়ে রাতমে নিদ নেহি আতা। ছ আট মাহিনাকে বাদ দোশো পানশো রুপাইয়া জমে। সেগুলো নিয়ে মুলুক যায়। মুলুকে দু-তিন মাস কাটিয়ে আসে।

এইসব বারান্দায়, রাস্তায় শিশু শ্রমিকরা বাক্স বয়ে বয়ে এনে শুকোয়, তোলে। যেন দেখে মনে হবে, এরা সব বাক্স নিয়ে খেলা করছে। খুব সচেতন খেলা। কঠিন কোনো শ্রম নয়। হালকা বাক্সগুলি এনে শুকোতে দিচ্ছে, তারপর তুলে সাজাচ্ছে। সমুদ্রবেলায় বালি নিয়ে খেলার মত। কিন্তু এটাই শ্রম। এবং এরা এদের শ্রম সম্পর্কেও যথেষ্ট সচেতন। এরা দৈনিক এক টাকা দু টাকা রোজ পায়। এক ঘণ্টা টিফিন পায়। পাঁচ থেকে আট বছর এদের বয়স। রাস্তায় কাউকে ঘড়ি হাতে যেতে দেখলে, সময় জিজ্ঞাসা করবে। কতক্ষণ পরে টিফিন বুঝে নিতে চায়। কতক্ষণ পরে ছুটি বুঝতে চায়। শিশুর সারল্যে জোরালো সচেতনতা শ্রমের নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কে। দরিদ্র মালিককেও নাস্তা-নাবুদ করে তোলে। ছেঁকে ধরে চার-পাঁচজন শিশু। এ ওকে গালাগাল দিয়েছে কেন, ও ওকে মেরেছে কেন। কারো কোমরের বোতামবিহীন প্যাণ্ট খুলে পায়ের ওপর খসে পড়ে। কেউ শিকনি হাতে মুছে মালিকের গায়ে হাত দিয়ে আন্তরিকতার স্বরে কথা বলছে।

প্যাকেট কারখানায়, এই সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে পাঁচ বছর বয়স থেকে আট বছর বয়স পর্যন্ত শিশুরা কেন? বিস্ময়ের যথেষ্ট অবকাশ আছে। এরা সাধারণত এই ওয়ার্ডেরই দরিদ্র পরিবারের শিশু। এদের মা-বাবারা খাওয়াতে পারে না। মায়ের আঁচলে না পড়ে থেকে এক-দু টাকা যা আসে লাভ। নিজের রুটিটা নিজে জোগাড় করতে পারবে।

প্যাকেট কারখানায় পরিণত শ্রমিক কি কাজ করতে পারে না? না পারে না। কারণ, এসব কারখানাগুলি আট ফুট বাই পাঁচ ফুট। পরিণতদেহী দুজন শ্রমিকেই ভরে যায়। ক্ষুদে শিশুরা পাঁচ ছ জনে হাঁটা চলা কাজ করা, মাল বয়ে শুকোতে দেয়া করতে পারে। তা ছাড়া প্যাকেট করা যতখানি বহনক্ষম সেই মত দরজার আয়তন, ঘরের আয়তন থাকে। এবং প্যাকেট নিয়ে চলাচল করলে রাস্তা জুড়ে চলাচল করে না। পরিণত শ্রমিক হলে সে যতখানি বইতে পারবে, ততখানি কাজ করিয়ে নিতে হলে কারখানার আয়তন তা দেবে না, রাস্তায় বারান্দায় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। যত কম বয়সের শিশু হবে ততই উপযুক্ত। বিস্ময়ের আর সীমা নেই।

দুপুর। রাস্তায় চড়া রোদ। বারান্দায় বসে বসে পান চিবোয় মিতা। প্যাকেট কারখানায় ছোট ছোট শিশুরা তার পাশ দিয়ে যায়। তাদের মাথা ও পিঠ ছোঁয় মিতার হাত। শিশুরা কাজের ব্যস্ততায় চলাফেরা করায়, এই

স্পর্শ বিঘ্ন সৃষ্টি করে, যখন চোখ তুলে মিতাকে দেখে, তখন এই স্পর্শ খুশি করে। এই শিশুদের মিতা আদর করে যেন। এবং ঘুমের তন্দ্রা আসে তার। চোখে বিশাল পদ্মা নদী উঠে আসে। সে ঘুমিয়ে পড়েছে ক্লান্ত কায়ায়। অনেক দূরের জিনিশ দেখা যায়। অনেক বড় নৌকো অনেক ছোট করে দেখা যায়। বড় নদীর বুকে বড় নৌকো অনেক অনেক ছোট।

মতি দেখে তার মিতাদি বুকের দিকে মাথা ভেঙে ঘুমচ্ছে। কপালে মুখে ঠোঁটের ওপর টিপ টিপ ঘামের কণা জমছে। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খায়। আর তার দিদিকে দেখে। তারও বুঝি ঘুম পাচ্ছে। রোদ আর গরম বাতাস তার চারপাশে। চৈতন্য ক্লান্ত হয়ে আসে।

মিতা হঠাৎ তন্দ্রা ভেঙে সহসা 'দ্যাখ ত জিভটা কত লাল ?' মিতা জিভ বের করে।

মতি বলে 'বেশ লাল।'

মিতা জিভ ভাঙচে নেয় মতির দিকে।

মিতা মতিকে ফোটায়। ফুলের মত, বীজকম্প্র অঙ্কুরের মত। পারে বলে মিতার হ্লাদের আর সীমা নেই। সে শুধু স্রোতের আবর্তের মত ঘুরে-ফিরে মরে। ছায়াব করতলে যেন তার মুখ রেখেছে। একটু শান্তি পাততে চায় যেন সে। গাঢ় সবুজের দিগন্ত থেকে যেন সে নীলিমার টুকরো নীল এনে ধরে রেখেছে তাব ভ্রু-সন্ধিতে। পাতায় পাতায় সবুজে রঙে রঙে গাঢ়তায় শীত-লতায় শান্তিতে ভরে থাকতে চায়। দেহের এক গন্ধ আছে তার, সে গন্ধ নিজে পায়। নিজের দেহের গন্ধে নিজে মরে থাকে।

মিতা বলল 'তুই কী কী ক' ' এখন ভাবছিস ?'

'কিছু না।'

'কিছু না ?'

'না।'

মিতা বলল 'আজ কী বার রে ?'

'বুধবার।'

'কত তারিখ ?'

মতি মনে মনে ভেবে নেয় 'সাত তারিখ .

'মার্চ মাস ত।'

'হ্যাঁ।'

'দোল কবে পড়ছে জানিস ?'

'জানি না।'

'দূর হাঁদা। এই রোববার।'

'তা হবে। আমি কী জানি।'

'কত তারিখ হয় ?'

মতি গাঁট গুনে হিশেব করতে বসে।

সেই ফাঁকে মিতা আলগা খোঁপা ভেঙে, নতুন করে খোঁপা বেঁধে নেয়, দুটি হাত দুদিকে তুলে। কনুই দুটি দুদিকে বাতাসে গেঁথে যায়। মতির সামনে আর-এক রমণীয় মুদ্রায় ভরে ওঠে।

মতির চোখ চলে যায় বুঝি। হিশেব আর হয় না।

'এগার তারিখ রে, এগার তারিখ। এতক্ষণ ধরে গাঁট গোনার কী আছে। দোলের আগের রাতে ঘোষপাড়ায় সতীমার মেলা হয়। সারা রাত আখড়ায় আখড়ায় কীর্তনগান হয়, বাউল গান হয়। পুজো হয় সতীমার মন্দিরে। জানিস না?'

'না।'

'কি বোকা রে।'

'বোকা ত বোকা, যাও।' একটা ধাক্কা দেয় মতি বাঁ-হাতে মিতার বাহুতে। মতির মুহূর্তে মনে হয় মিতাদিকে সে গলা টিপে মেরে ফেলে।

'মিতার তেমনই হাসি মুখ। 'শনিবার, চল, যাবি?'

মতি সঙ্গে সঙ্গে মাথা কাত করে, হ্যাঁ জানায়! মুহূর্তে রাগ তার পড়ে যায়। 'কী ভাবে যাবে?'

'কল্যাণী সীমান্তের ট্রেনে।'

'যাব।' মতির হাসি মুখ।

'কী রোদ রে, গরম!'

মতি রোদের দিকে তাকায়। মতির চোখ থেকে অনুভব থেকে রোদও সরে থাকে, মিতাদি বলে দিলে তবে রোদ আসে, চোখে ও অনুভবে।

মিতা 'তুই যাবি বলে সতীমার মেলায় যাব।' তারপর যেন তার ঘুম ধরছে এমন চোখে-মুখে অভিব্যক্তি এনে বলে 'কী ঘুম ধরছে রে।' মিতা হাই তোলে।

রাস্তায় লোকজন নানা মাপের, নানা বয়সের, নানা ছাঁদের। নানা রকম যানবাহন। রোদে ছেয়ে আছে পথ। বায়ুস্তরের। 'তোকে দেখাব বলে, সতীমার মেলায় যাব।'

মতির ঘ্রাণে মিতাদির মাথার চুলের গন্ধ ব্যাপ্ত হয়।

মতি মিতাদির ঘুমিয়ে পড়া ভঙ্গির সঙ্গে কথা বলল 'আমি তোমার জন্যে যাব।'

মিতা আরো বেশি তন্দ্রার ভেতর যেন যেতে চাইছে। খুব মৃদু স্বরে বলল 'আমার জন্যে তুই খুব ভাবিস?'

'ভাবি না আবার!'

'আমি মরে গেলে কাঁদবি?'

'রাগিও না।'

'তোর রাগকে আমার খুব ভয় করে। আমার ওপর কোনোদিন রাগ করবি না বল?'

'না করব না। রাগ করি নাকি?'

'তবে কী করিস?'

'অভিমান।'

চোখ বোজা অবস্থায় হেসে ওঠে মিতা। চোখ খুলে মতিকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে তার। কিন্তু মিতা শরীরের শান্তিকে ধরে রাখে। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় প্যাকেটের শিশু শ্রমিকদেরও ধরতে চায়।

মিতা শান্ত হতে চায়। শান্ত। চোখ বুজলে সেই পদ্মা নদীটা চলে আসে। অন্য দেশ অন্য রাষ্ট্রের নদী, সহ নৈকট্যে। চোখ বুজলেই নদীটাকে ধরতে পারে। এই মিথ্যে মায়া নিয়ে সে সান্ত্বনা পেতে চাইবে। নদীটা মিথ্যে নয়। স্মৃতি মিথ্যে নয়। দেশটা মিথ্যে নয়। চলে আসাটা মিথ্যে নয়। নদীটা চোখ জুড়ে ধরা দেয়।

লক্ষ্মী সাহা মেশিনে কাগজ লাগায়, বিজয় কারিগর স্টপ কাজ করে। বাঁ-হাতে হ্যাণ্ডেল ঘোরায়, আর ডান হাতের ইশারায়, কাগজের যথাস্থানে পিন বসায়, পিনের হ্যাণ্ডেল তোলানামা করে। বিজয়কে সারাক্ষণ কাগজের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। কাগজ সরে আসায় নির্দিষ্ট মুহূর্তটাকে ধরে। যথাসময়ে পিন বসায়। পিনগুলো কাগজের বুকে আঁচড় কাটে, সুতোর বুক বেয়ে চলে যায় কাগজগুলো। রুল টানা হওয়া কাগজগুলো নীচে পড়ে যায়। সেগুলো আবার গুছোতে হয়। মতি এই গুছোবার কাজটা করে। কারখানায় মতি নেই। বিজয় কাজ বন্ধ করে মতির কাজটা করে। মনে মনে রুষ্ট মতির ওপর। লক্ষ্মী সাহা অনেক বেশি রেগে আছে মতির ওপর।

শুক্রবারের বিকেল। মতি পাঁচটায় ছুটি করেছে। হাতের কাজ শেষ করার জন্যে এক ঘণ্টা ওভারটাইমে রাজি হয় নি মতি। মতির যে কী হয়েছে! লক্ষ্মী সাহা, কারিগর বিজয় কতবার বলল, তবু মতি কাজ করল না। কাপড়-জামা পরে বেরিয়ে গেল সটান।

লক্ষ্মী বলল 'মার্কেটের বাইরের কাজ উবে গেল বিজয়।'

'কলকাতার বাইরের কাজ আর আসবে না।' বিজয় মুখ গুঁজেই বলে।

'তাই ত রে, দিনকাল খুব খারাপ।'

'কলকাতার বাইরে চন্দননগর, শ্রীরামপুর, অশোকনগর, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, এসব জায়গায় রুলিং মেশিন চলে গেছে, বাইরের কাজ আর আসে না তাই।'

'বাইরের উটকো কাজে রেট বেশি। একটা দুটো বাইরের কাজ সপ্তাহে না পেলে ভাল লাগে শালা!'

'শালার বউটা আইল পরশু। শালা ওপার থেকে এসেছে তিন মাস,

শালার বউ দুটো বাচ্চা নিয়ে চলে এল এই পরশু।'

'দেশ কোথা ?'

'ফরিদপুর।' মুখ গুঁজে কাজ করতে করতে দুজনে এরকম কথা বলে বেশ। এতে কাজটা জমে ভাল। কাজের ক্লেশ তত লাগে না। বিজয় বলল 'শুনলাম নাকি ম্যাণ্ডেলা মুক্তি পাচ্ছে ?'

'কি জানি।' লক্ষ্মী সাহা অত খবর রাখে না। 'কে বলল ?'

'খবরের কাগজে লেখেছে। সাতাশ বছর জেলে ছিল।'

'সাতাশ বছর ?'

'কাগজে তাই লেখেছে। ওদেশে এরশাদ সরকার মুনির খুকুর ফাঁসি দিচ্ছে সেলজ এসে বলল।'

'কেন ফাঁসি দিচ্ছে ?'

'রিমা হত্যা মামলা চলছে এখন ও-দেশে। রিমা ছিল মুনিবের বউ। খুকুর সঙ্গে মুনিবের খারাপ সম্পর্ক হল। দুজনে রিমাকে মেরে ফেলে। এখন ও-দেশে রিমা মুনির খুকুর কিস্সা আকাশে বাতাসে। শালার বউটা বলছিল। কি সব গান বেঁধেছে। 'স্ত্রী খুন করিয়া যাবৎ জীবন চায়, সাফাই সাক্ষী মেনেছিল সাক্ষী নাই পায়/সবার কাছে এখন বলে যাই, ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলবে মুনির শোন বাংলার ভাই কোর্টে রায় দিয়াছে মুনির খুকুর ফাঁসি, রায় শুনিয়া বাংলা বাসির মুখে ফুটে হাসি।'

'এসব গান বেঁধেছে নাকি ?'

'আপনার কোন জেলা ঘর ছিল যেন ?'

'ঢাকা জেলায় মানিকগঞ্জ সাবডিভিশন।'

'যাও ?'

'না। ভাইপো আছে দুইডা। গত বছর বইন্যা হইছিল, ভেসে গেল কিনা।' লক্ষ্মী সাহা পাশ ফেরে, দেখে দরজায় মিতা। 'দিদি, আসেন আসেন' কাজ বন্ধ করে মেশিনের ভেতর গোঁজা টুলটা বাড়িয়ে দেয় লক্ষ্মী সাহা। আবার কাজে বসে যায় দুজন।

মিতা ছুটি করে বেরিয়ে এসেছে, ফিটফাট পোশাকে। টুলের ওপর বসে।

লক্ষ্মী সাহা কাজ করতে করতে বলে 'মতিরে নিয়া আর পারলাম না।'

মিতা 'কেন কী করেছে মতি ?'

'আর বলবেন না দিদি' কপাল কুঁচকে ধরে লক্ষ্মী, মুখে কাজের ক্লেশ জড়ো হয়। 'আর রাখতে পারলাম নারে ছোঁড়াডারে। বুইলেন, এমন করে আর চলে না। সকলেই আসে দু পয়সা কামাতে। বাবুগিরি করতে কেউ কলকাতায় আসে না।' কাজ থামিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে 'এই দেখেন, আজ একঘণ্টা ওটি করলে কাজ উঠে যায়, বললাম, করল না। এমন কর্মচারী নিয়া কে কাজ করবেন বলেন ? ঘুরে বেড়াবে, তবু কাজ করবে না।'

'আপনার মত মানুষের দোষ দিতে পারি না দাদা।' মিতা বলে।

'ওর অনেক গুণ আছে স্বীকার করি। চোর নয়। রাতে কারখানা আগলায়। কারখানা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে। মেশিন পরিস্কার করে। এদিক দিয়ে দোষ দেব না। যে যতটা নয়, তা বলে কী করব দিদি! কিন্তু ইদানি যেন কেমন হয়ে গেছে। সত্যিকারের কথা দিদি, আমি মালিক নই, যেন বাড়ির চাকর, এমন জ্ঞান করে। এতটা ছিল না। মতিকে যা বলব, তাতে রাজি। ও অনেক বুঝদার এখন। তাই এখন আর বুঝাই না।'

'একটু বুঝিয়ে বলবেন।'

'বুঝবার মাল সে এখন আর নেই। সে এখন অনেক বুঝদার হয়েছে। সে এখন এবার আমাকে বোঝাবে। আপনাকে দিদি দিদি করে বলে বলে বলতে যাওয়া, না হলে বলতাম না।'

মিতার মনটা মুষড়ে পড়ে। মতিকে কি এরা ভালবাসে না? এখন মনে হয়, মতির আলাদা মন আছে, মতি একজন ব্যক্তি। মতি এরকম চোয়াড়ে হয়ে উঠলে, ভাল নয়। মতিই নিজের ক্ষতি নিজে করবে। মতির কিছু ক্ষতি হতে নেই। মিতা ভেতরে ভেতরে অস্থির! অথচ শান্ত মনে হাতের ঘড়ি দেখে। 'ছ'টা দুইয়ের লোকাল ধরতে হবে।' আর মাত্র বারো মিনিট বাকি। গেলাম লোকালটা ধরতে হবে।' টুল থেকে খুট করে উঠে পড়ে মিতা। টুলটা নড়ে যায়, একটা খটাক্ শব্দ হয়। বেরিয়ে আসে মিতা।

গলির মাঝখানে মতির সঙ্গে মুখোমুখি মিতার।

মিতা 'কী রে, কারখানাতেও আজকাল এসে পাওয়া যায় না তোকে?'

'তুমি গিয়েছিলে?'

'না ত কি।'

'তুমি যাবে বললে থাকতাম।'

'আর সকলে ওটি করলে থাকতিস্ না?'

'কে বলেছে? লক্ষ্মীদা?'

'যেই বলুক।'

'আমার ভাল্ লাগে না, করি না।'

এই কথায় মিতার মনটা কেমন ধূসর হয়ে ওঠে। ম্লান মন নিয়ে দাঁড়িয়েছে সে। 'চললাম।'

'দাঁড়াও, কারখানা থেকে পেমেণ্ট নিয়ে আসি, তোমাকে এগিয়ে দেব।'

'না থাক, তোকে আসতে হবে না।'

'কেন?'

'ট্রেনটা ছুটে ধরব। আর আজ তোকে পেমেণ্ট দেবে? আজ ত শুক্রবার।'

'অ্যাডভান্স পেমেণ্ট নেব। কেনাকাটা করব। কালকে মেলায় যাব।'

'বাব্ বা রাতে ঘুম ধরছে না তোর, বল্ !'

মতি হাসে।

'লক্ষ্মীদা দেবেন ?'

'সকালে শুনিয়ে রেখেছি।'

'বেশ করেছিস। হাঁদারাম। আমি চললাম, তোকে আসতে হবে না এখন।'

মিতা ছিটকে বেরিয়ে যায়।

মতি হাঁ হয়ে তাকিয়ে দেখে। একটু হেঁটে হেঁটে মিতাদিকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এলে বেশ লাগত ! অবাক বিস্ময়ে মিতার ছুটে যাওয়াটা হতভম্বের মত নিশ্চল দেখে মতি। মনটা ভার হয়ে ওঠে। দূর এসব ভাল্ লাগে না। শূন্য ফাঁকা লাগে নিজেকে। দেয়ালে লাথি ছুঁড়তে ইচ্ছে করে তার খুব। কিংবা কাউকে ধরে খুব পিটিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। কেন ? কেন এমন করে তার ?

দড়াম করে কারখানার ভেতর ঢোকে মতি। লক্ষ্মী সাহা ও বিজয় এখনো কাজ করছে। 'লক্ষ্মীদা, পেমেন্টটা দেবেন ?'

লক্ষ্মী মুখ ফেরাল। অসন্তুষ্ট চোখ মুখ। 'এখন নয়।'

'আপনাকে বলেছি ত সকালে।'

লক্ষ্মী সাহা কাগজ লাগানো ছেড়ে ক্ষিপ্ত হয়ে দু হাত দু দিকে ঝাঁকিয়ে বলে 'বলেছিস ত মাথা কিনে নিয়েছিস।

'কাজ করেছি, পয়সা চেয়েছি।'

'বেশ করেছ, টাকা পাবে।'

'আমার এখনই লাগবে।'

'ঠিক আছে টাকা পাবে। পেমেন্ট নিয়ে অন্য কারখানা দেখো। কারখানা বন্ধ হবার সময় নিস।'

'আপনার কাছে কাজ করব না, এখনই টাকা দিন।'

'মতি !'

'চোখ রাঙাবেন না।'

'কেন, মারবি নাকি ?'

'বাজে কথা বলবেন না। তখন থেকে ভাট বকছেন। টাকা ফেলে দিলে কথা বাড়ে না।'

লক্ষ্মী সাহা টুল থেকে ছিটকে নামে। রাগে থর থর করে কাঁপছে। পেরেকে গুঁজে রাখা জামাটা টেনে বুক পকেট থেকে একগোছা টাকা বের করে আনে। দ্রুত গুনে এক খামচি ছুঁড়ে টুলের ওপর ফেলে। 'নে।'

মেজাজে টাকাটা তুলে গুনে পকেটে ভরে মতি।

লক্ষ্মী সাহা দেয়ালের কোনায় টাঙানো দড়ি থেকে কয়েকটা পুরনো জামা প্যান্ট গামছা গেঞ্জি লুঙ্গি টেনে এনে মতির পায়ের কাছে ফেলে। হুমড়ি খেয়ে মেশিনের পেছন দিকটা চলে গিয়ে একটা ময়লা ছেঁড়া কাঁথা আর একটা

তেলচিটে বালিশ টেনে এনে মতির সামনে আছড়ে ফেলে।' 'যাও, নিয়ে বিদায় হও।'

এটা মতি নীরবে দেখে। এবং মাথায় আগুন উঠে যায় তার। ভেতরে ভেতরে ভীষণ গরজায় সে। এখনই যেন লক্ষ্মী সাহার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। টুঁটি ছিঁড়ে ধরবে লক্ষ্মী সাহার। রাগে থমকে শান্ত থাকে সে। কী এমন দোষ করেছে যে লক্ষ্মী সাহা তাকে কারখানা থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে? বিজয়দাও কিছু বলছে না। দু-হাতে জামা কাপড় কাঁথা বালিশ তুলে দরজার বাইরে গলিতে রেখে চোদ্দর তিনের গলিতে হাঁটে।

'খান্না' থেকে সোজা বাসে চেপে রাজাবাজার ট্রামডিপোয় নামে মতি। রাত এগারটা। সেই যে লক্ষ্মী সাহার কারখানা থেকে বেরিয়ে এসেছিল, এই ফিরছে। হাঁটতে হাঁটতে 'খান্না' সিনেমায় পেঁছেছিল। হাঁটতে তার ভাল লেগেছিল। তারপর নাইট শোয়ের টিকিট কেটে হেঁটে গিয়েছিল শ্যামবাজার, ঘোড়ায় চড়া নেতাজিকে দেখতে। নেতাজি আলোয় ভরে উঠেছিল। ওখানে রাস্তার ঘুগনি আর একটা পেয়ারা কিনে খেয়েছিল মতি। তার বয়সী একজন তার পা মাড়িয়ে দিয়েছিল। মতি তাকে মারতে যায়, সামলে নিয়েছে। তারপর ওখান থেকে বেরিয়ে এসে খান্নায় নাইট শোয়ে সিনেমা দেখা। সিনেমার নাম 'ম্যায়নে প্যার কিয়া'। মন-প্রাণ ভরে আছে মতির, সিনেমার নাচ গান গল্প ঘটনায়। একটা সুর মাথার ভেতর সারাক্ষণ পোকার মত ঘুরছে। সেটাকে কন্ঠে এনে গুনগুন করে উঠছে। তা ছাড়া সিনেমাটার এক ভাললাগা বোধ তার বুকে মাথায় সারা শরীরে খেলছে। স্বর্ণরেণুর মত ওড়াওড়ি। সিনেমা দেখতে দেখতে একেবারেই ভুলে গিয়েছিল লক্ষ্মী সাহার ঘরে আজ থেকে তার আর ঠাঁই নেই। বাস থেকে নেমেই মনে পড়ে গেল মতির। বিকেলের ঘটনা। তার পুরনো জামা-কাপড় বিছানা বালিশ লক্ষ্মী সাহার কারখানার সামনে পড়ে আছে। আজ আর তার নির্দিষ্ট থাকার জায়গা নেই। অথচ সিনেমা দেখে মনটা ভরে ছিল। ভেতরে একটা দোলা, ছন্দের রেশ বয়ে চলেছে। একটা রোদের চশমা কিনেছিল সে আজ সন্ধেবেলা। চোখে দিয়ে আছে এখনো চশমাটা। অনেক বেশি ছায়াময় লাগে চারপাশ। রাতকে আরো রাত করে দেখে। একটা রঙ লেগে থাকে সমস্ত কিছুতে। বেশ লাগে কিন্তু মতির। মতির বড় সাধ ছিল এ রকম একটা চশমার। রাতেও চোখে লাগিয়ে রাখতে চায় সে।

পাটোয়ার বাগানের প্রায় অন্ধকার রাতের নির্জন রাস্তায় ঢুকে মনে ভ্রম হয় চশমার দেখায়, কোনো এক সুড়ঙ্গপথ। কোথাও অন্ধকারের দেয়াল হয়ে আছে নিরেট কালো। ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে কোনো অনন্ত অন্ধকার কাছে চলে এসেছে। রাস্তার আলো পিচুটি চোখে দেখার মত ম্লান হয়ে যায়। অনেক কারখানায় আলো নেই। অনেক কারখানার ঝাঁপ বন্ধ।

সাড়ে এগারটা বাজে।

সিনেমা হলে ঢোকার আগে একশো গ্রাম মুড়ি আর দুটো সিঙাড়া মিশিয়ে নিয়ে খেয়েছিল। রাতের খাওয়াটা সিনেমা দেখতে দেখতে খেয়েছে। খাওয়ার কোনো ঝক্কি-ঝামেলা নেই। শুয়ে পড়তে পারলেই হল। কিন্তু শোবে কোথা? তার কাছে লক্ষ্মী সাহার ঘরের চাবি নেই। জামাকাপড়, বিছানাপত্তর?

চশমাটা খুলতে ইচ্ছে করছে না তার। অন্ধকারের ভেতর আরো অন্ধকার দেখে। মনে হল তার, কতক্ষণ সে কারো সঙ্গে কথা বলে নি। অথচ নিজের সঙ্গে কথা বলা শেষ করা যায় না। নিজের মনে সে কত কথা বলে। ঘুরেফিরে কত প্রশ্ন করে নিজেকে। ঘুরে-ফিরে কতবার নিজের ইচ্ছে আকাঙ্ক্ষাকে যত্ন করে।

চলতে চলতে গলির ভেতর হোঁচট খায় মতি। হোঁচট খাওয়ার পর মনে হয় কাছাকাছি কারো সান্ত্বনার চোখ নেই। তাকে কেউ দেখছে না। তখন নিজেকে একা ও বেদনাতুর অনাত্মীয় একজন মনে হয়। তার হাই ওঠে। ঘুম পায়। অথচ ঘুমবে কোথায়? পাটোয়ার বাগান লুপ্ত নগরীর মত সুড়ঙ্গময় নির্জন হয়ে আছে। শুধু অন্ধকারের মধ্যে হাঁটতে হচ্ছে তাকে।

চোদ্দর তিনের গলিতে একেবারে বাদুড়ের মত অন্ধকার। একবার মনে করল চশমাটা খুলে ফেলে। তা হলে রাস্তার আলোর আভা ছুটে আসবে চোদ্দর চারের দ মত গলিটার ভেতর। কিন্তু খুলল না চশমাটা।

অভ্যাস বশে লক্ষ্মী সাহার কারখানার দরজার কাছে চলে আসে মতি। পায়ে ঠেকে তারই বিছানাপত্তর জামাকাপড়। দরজায় তালা লাগানো। দরজায় হাত বোলায় মতি। ডান দিকের পাল্লাটার ওপরে শ্রীদেবী, মন্দাকিনী অথবা কিমি কাতকারের—যে-কোনো একজনের একটা ছবি সাঁটা আছে। সেটা মতি লেই দিয়ে মেরেছিল। ছবিটার ওপর হাত রাখে মতি। প্রতিদিনের দেখায় ছবিটা স্পষ্ট অবয়বে মতির চোখে ধরা পড়ে। অবস্থান মত মতি কাগজের স্তনে হাত দেয়।

কতক্ষণ আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকা যায়? পায়ে মশা কাটছে। ঘুমে চোখ ভার হয়ে আসছে। কোথায় যাবে মতি? মতি জানে না। দরজায় নুয়ে আছে সে। শরীর পলকা হয়ে আছে। কাগজের স্তনে হাত দিয়ে অন্ধকারে শরীর ভেঙে দাঁড়িয়ে থাকে মতি লক্ষ্মী সাহার বন্ধ দরজার সামনে।

একটা টর্চের আলো গলির ভেতর চমকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কাগজের স্তন থেকে হাতটা সরিয়ে নেয় মতি। আলোটা চোদ্দর চারের গলির ভেতর ঢুকে গেল। মতি আবার কাগজের স্তনে হাত দেয়। সে ঘুমিয়ে পড়তে চায়।

ট্রেন থেকে নেমে, মতি দুদ্দাড় জনস্রোতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল।

মিতা প্রায় কাতরকণ্ঠে বলে 'এই মতি অত জোরে হাঁটিস না সোনা। ফেলে রেখে ছুটবি নাকি?'

মতি চলা কমিয়ে দেয়। 'তুমিও জোরে হাঁটো না দিদি।'

'কিসের জন্যে জোরে হাঁটব বল ত? মেলা কি ফুরিয়ে যাচ্ছে নাকি?'

মতি হাঁ করে সামনের দিকে তাকায়। আলোয় আলোকার। মাইকের জটলা। মতির আনন্দ চলকে ওঠে। এত মজা আছে?

পেছন থেকে এসে ডান হাতটা মতির চেপে ধরেছে মিতাদি।

মতি বলল 'গান হচ্ছে না?'

'হ্যাঁ। কত জায়গায়, কত গান হবে।'

'আমি অনেক গান শুনব।'

'তা শুনিস। হারিয়ে যেও না আবার।'

'তুমি আমার কাছে কাছে থাকবে।'

'কিন্তু তুই এতই চঞ্চল যে, মনেই থাকবে না তোর, আমি তোর সঙ্গে আছি।'

'দূর, আমি তোমার সঙ্গে আছি।'

মিতা মতির করতল মোচড়ায়। 'ভারি কথা শিখেছিস না?'

মতি চেঁচিয়ে ওঠে 'এই যে জলের কল!'

সারি সারি দোকান-পসারি সবে শুরু হয়ে গেছে। একটা খাবারের দোকান। খালি-গা একজন কালো লোক হ্যাজাকে পাম্প দিচ্ছিল বসে বসে, আর দুজন কারিগর উনুনে বসে ঢাকাই পরোটা ভাজছিল।

দোকানের পাশেই কল। কলের চারপাশ কাদা হয়ে আছে, জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ায়।

মতির বয়সী একজন ছেলে কল টিপে দিল, মতি পেট ভরে জল খেল। মতি দেখল পাশে মিতাদি দাঁড়িয়ে আছে। বাঁ কাঁধে ফোমের ব্যাগ। কলের দিকে এগিয়ে এল হাঁটুর কাছে শাড়ি তুলে। কলের ডাণ্ডি চাপ দিতে লাগল মতি। আর দেখতে লাগল মিতাদিকে। হ্যাজাকের আলোয় ভেসে গেল মিতাদি। একটা বাসন্তী রঙের শাড়ি পরে এসেছে মিতাদি। হ্যাজাকের আলোয় জল খায় মিতা। নুয়ে পড়ে তার শরীর। চোখ দুটিতে আলো লেগে গিনির মত ঝিকিয়ে ওঠে। কানে দুল পরে এসেছে, দুল দুটি ঝিকিয়ে যায়। মতি দেখে মিতাকে। মিতা বুঝি নিজেকে মতিকে দেখায়। মিতা জল খাচ্ছে কম, ফেলছে বেশি।

কাদা পেরিয়ে মিতাদি আসতে যায়, শরীর আঁকায় বাঁকায়। মিতা মতির উদ্দেশে বলল 'লাফ দেব, আমাকে ধরবি তুই।'

মিতা লাফ দেয়। মতির দুই করতলে মিতার মুখ এসে পড়ে। মিতা মতির কোমর দু-হাতে জড়িয়ে ধরে।

তারপর মতির বাঁ-হাত ধরে হাঁটে মিতা। দু-দিকে দোকানপসারি। হরেক কিসিমের মাল বিকোয়। আর মাঝখানের রাস্তা জুড়ে জনস্রোত বয়ে চলেছে। মিতা ইচ্ছে করে ভিড়ের মধ্যে মতিকে নিজের দিকে টেনে নিতে চায়, মতির পিঠে ধাক্কা লাগায়। মিতা বুঝতে পারে, মতি কেমন চমকে ওঠে।

মতি এই ফাঁকে পকেট থেকে গগল্‌সটা বের করে চোখে এঁটে নিয়েছে।

মিতা তা দেখে হেসে ফেলে। 'ও মা, রাঙা চশমা পরেছিস মতি? তোকে কেমন দেখায়। ওমা বেশ মানিয়েছে রে তোকে, কিন্তু তোর যে চোখ দেখা যায় না।'

মিতার হাত ছাড়িয়ে রাস্তার কিনারে যেতে চায় মতি।

'ও মতি, কোথায় যাস?'

'বাঁশি কিনব।'

হাত ছেড়ে দেয় মিতা। মতিকে দেখে। মতি নতুন জামাপ্যান্টে কত বড়টা। ফুটপাথের দোকানে ঝুঁকে বাঁশি দেখছে উলটে-পালটে। বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে বাজাচ্ছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিতা লোকজনের ধাক্কা খাচ্ছে। যেন বাতাসে কোনো গাছ দুলে উঠছে। মিতার উৎফুল্ল মুখ, চারদিকে লোকজন দোকানপসারি। আলোর উৎসব। মাইকে আখড়ায় আখড়ায় গান ভেসে আসছে। মনটা আনন্দে ভরে ওঠে। এখানে এসে দাঁড়াতে মিতার যে কী ভাল লাগে! যেন তার কোনো দুঃখ নেই। যেন সে কাতর নয়। একটা প্রকাণ্ড আনন্দের মাঝখানে এসে ভুলে গেছে সব সে। আর মতিকে পেয়েছে। মতি, মতি রে। হাতের কাছে শুধু মতিকে চায় মিতা। মতি কাছ থেকে সরে না যায়।

মতি বাঁশি নিয়ে রাস্তায় উঠে এল মিতার মুখোমুখি। মিতার হাত ধরে টানছে। 'চল, আলুর দম খাব।'

মিতা মতির ভঙ্গি দেখে হেসে কুটিপাটি। 'তুই কি আমার হাতটা ছিঁড়ে নিবি নাকি?'

মতির দুরন্ত ভাব। 'ছিঁড়ে দেব। চল বলছি।'

মতি টানতে টানতে ফুটপাথের দোকানে নিয়ে যায়। দু প্লেট মশলা দেয়া আলুর দম পেয়ে যায় ওরা।

মতি চামচ ডুবিয়ে আলুর দম খায়। 'বেশ খেতে রে।'

'আরো এক প্লেট খাবে নাকি?'

'না না।'

লোকজনের ধাক্কা খায় আর আলুর দমের প্লেট নিয়ে এঁকেবেঁকে যায়।

'ওখানে জিলিপি ভাজছে, দিদি!'

আলু দম খাওয়া শেষ করে মতি ছুটে যায় সেদিকে। মিতা তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছিল। একটু একটু করে। মতিকে ভিড়ের ভেতর দিয়ে ঢুকে গিয়ে এগিয়ে যেতে দেখে, হেসে ফেলে বিষম খায়। হাত বাড়িয়ে জলের গ্লাস নিয়ে জল খায়। তারপর চটপট আলুর দমের প্লেটটা শেষ করে, ভিড় দু-হাতে সরিয়ে মতির কাছে চলে আসে। মতি ঝুঁকে পড়ে একঠোঙা জিলিপি নিয়ে পয়সা মেটাচ্ছে। মতির পিঠ ছোঁয় মিতার ডান হাত।

মতি পেছন ফিরে হাসে। 'দেখ, গরম গরম জিলিপি।' জিলিপির ঠোঙার

মুখটা খুলে মিতার দিকে বাড়িয়ে দেয় মতি।

মিতা টুক করে একটা জিলিপি নেয়। খাওয়ার লোভটা এসে গেছে তার। মতি খাওয়ার লোভটা দিল। জিলিপি খায়। বেশ লাগছে। বেশ স্বাদ। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তারা জিলিপি খায় আর ভিড়ের আঘাতে এঁকেবেঁকে যায়। মতির মুখের দিক থেকে চোখ ফেরায় না মিতা। মতির চোখ দুটি দুরন্ত ফড়িঙের মত।

'ও দিদি, দেখ, ওখানে ম্যাজিক খেলা দেখাচ্ছে! দেখবে? লোক ডাকছে।'

'এখনই দেখে সব শেষ করবি নাকি?'

'নাগরদোলা।'

'চল চড়ি।' মিতার চোখ নেচে ওঠে।

মতি মিতাকে ফেলে রেখেই এগিয়ে যায়। মিতা মতিকে ধরতে দ্রুত এগোয়।

নাগরদোলার কাছে এসে মিতা মতির ডান হাতটা খপ্ করে ধরে ফেলে। 'খবরদার, নাগরদোলা চড়ার পয়সা আমি দেব।'

বুকের ভেতর রাখা ছোট ব্যাগটা বের করে আনে মিতা। মতি সেদিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থমকে যায়! মিতার বুকের দিকে তাকিয়ে আছে। মিতা মতির দিকে চোখ ছোট করে তাকায়। যেন বলতে চায়, কী দেখছিস!

একটা বাক্সের মধ্যে মতিকে নিয়ে মিতা উঠে পড়ে। তাতে আরো কয়েকজন আছে। একেবারে শূন্যে উঠে যায়। আলোকিত চারধার। মতির অদ্ভুত অনুভূতি। গা শির শির করে। মিতা মতিকে একেবারে জড়িয়ে ধরেছে। মতি মিতার চুলের গন্ধ পায়। নারকেল তেলের গন্ধ। ঘ্রাণের ভেতর কি আরাম দেয়। মিতার শরীরের গন্ধ পায়। মিতাদি তার কোমরটা দু-হাতে জড়িয়ে ধরে বুকের সঙ্গে মিশে আছে। মিতার ঠোঁট দুটি এসে লাগছে মতির কণ্ঠার ওপর। মতির খুব ইচ্ছে করে মিতাদিকে জড়িয়ে ধরে। সে পারে না। মেলা নাগরদোলা আর এই মুহূর্তে মিতাদি তাকে জড়িয়ে বসে থাকার অনুভূতিতে মতি কী যে আনন্দ পাচ্ছে। সে শুধু মিতাদিকে জড়িয়ে ধরতে পারে না। মতি জানে, তার সে সাহস নেই।

মুহূর্তেই নাগরদোলায় টিকিটের সময় ফুরিয়ে যায়। মতির হাত চেপে চেপে নেমে আসে মিতা। খুচরো চুল উড়ে এসে পড়েছে মুখে। চোখ দুটি আরো ডাগর হয়ে উঠতে চাইল তার।

মতি কিছু দেখার আবেগে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে একটু এগিয়ে গেল। 'ও দিদি ওখানে পয়সা দিয়ে লটারি খেলে ভি[illegible]শ পাচ্ছে।'

'ও মতি ফেলে যাস না।' কাতরকণ্ঠে ডাকে মিতা। এবং ছুটে গিয়ে মতিকে ধরে ফেলে। এবং মতির হাতে একটা কাঁচা টাকা গুঁজে দেয় মিতা। 'খেলবি ত খেল!'

সে টাকাটা নিয়ে দান বসায় মতি। কিট্ কিট্ কিট কিট্ করে লটারির

চাকা ঘুরছে। মতি মাথা গুঁজে টাকাটার দিকে চেয়ে আছে। মিতা মতির পিঠে হাত রেখে তাকিয়ে আছে। মতি ভাগ্য দেখছে। ফুস, একটা গুলি সুতো উঠল।

মতি আবার নিজের পয়সা বের করে খেলছে। কিট্ কিট্ কিট্ কিট্। এবার একটা মাছ লজেন্স পেল।

মিতা মতির হাত ধরে টানে। 'সব পয়সা হেরে যাবি, চল।'

মতির আরো একবার খেলতে ইচ্ছে গিয়েছিল।

ভিড় ঠেলে এগোয় মিতা, মতিকে কাছে কাছে নিয়ে।

'ও দিদি, নতুন মিষ্টি দেখেছ?'

'তোর কি সব মিষ্টি খাওয়া চাই?'

'মিষ্টি খাব না ফের!'

'একটু রাত হোক, মিষ্টি খাব।'

ভিড়ের ভেতর টুক টুক করে এগিয়ে যায় মতি। মতির সঙ্গে হেঁটে পারে না মিতা।

ভিড়ের মধ্যে মিতার কণ্ঠ বেজে ওঠে 'তুই আমাকে ভালবাসিস না রে মতি?'

মতি পেছন ফিরে তার মিতাদিকে দেখে। মিতাদি কেমন লজ্জাহীন খোলা খুলি হাসছে।

'চল কোথাও গিয়ে বসি। গান শুনি চল?'

মতি বলে, 'ঐ দেখ, কত জায়গায় মাইক দিয়ে গান হচ্ছে। বেশ লাগছে কিন্তু।'

'আমাকে কেমন দেখাচ্ছে বল ত.'

মতি এই কথায়ও পেছন ফিরে গাঢ় বিস্ময়ে তার মিতাদিকে দেখে। কোনো উত্তর করতে পারে না। যেন তার গভীর কান্না পায়। মিতাদিকে চুমু খেতে ইচ্ছে যায়। আদর করতে ইচ্ছে যায়। মিতাদিকে একান্ত কাছে পেতে ইচ্ছে যায়।

কিন্তু এই মেলাও তার কাছে কম বিস্ময় আনন্দের না। মেলার মধ্যে ঢুকে গিয়ে মতি শুধু মেলা হয়ে উঠতে চায়। গান বাজনা দোকান পসারি, নানা রঙিন জিনিশপত্র নানা রকম ভেলকি, কতকিছু, চিত্রবিচিত্র কতকিছু।'

'ও দিদি নরক দেখব।' দিদির হাত ধরে টানে মতি।

'তুই দেখ, আমি দেখব না।'

'না তুমিও।'

'আমি দাঁড়িয়ে আছি, তুই গিয়ে ঢোকনা।'

'তুমি দেখবে না?'

'তুই দেখলেই আমার দেখা হবে। দেখে এসে বলবি। আমার নরক ফরক একেবারে ভাল লাগে না।'

'তা হলে আমি দেখব না।'

'দ্যাখ না গিয়ে, বেশ ভাল রে।'

মতি নরকে ঢুকে যায়। যা দেখে তার বীভৎস লাগে। অসহ্য গা ঘিন ঘিন করে তার। যেন বমি বেরিয়ে আসবে। পয়সা দিয়ে এমন দুঃখ নেয়ার কী দরকার ছিল? এমনিতে ভেতরে ভীষণ ভিড়, বাঁকানো-চোরানো নানা শাস্তি পাওয়া মানুষ। চোখ ঝলসানো আলো। গরম। প্রাণটা বেরিয়ে আসে যেন মতির। মতি এসব দেখবে না।

মিতা বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মতির অপেক্ষা করছিল। মতি কোনো-ভাবেই তার চোখকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে না যায়, সেজন্য তার সতর্ক চোখ জেগে পড়ে থাকে।

মতি বেরিয়ে আসে।

মিতা তার হাত ধরে 'কী দেখলি?'

'ও দেখে নাকি পয়সা দিয়ে?'

'তবে দেখতে চাইলি যে।' মতির পিঠে হাত বোলায়। 'চল গান শুনি, ঐ আখড়াটায়। কী সুন্দর পোশাক পরে এক বাউল কি সুন্দর নেচে নেচে গাইছে দ্যাখ।' মতির মুখ প্রসন্ন হয়ে ওঠে।

আখড়াটার দিকে মতিকে নিয়ে এগোয় মিতা।

মতি লাফিয়ে ওঠে, 'ঐ যে, ওখানেও গান হচ্ছে।' আরো একটু ঘুরে 'ও দিদি, ওখানেও আর-একটা গানের আসর। যেখানে তাকাচ্ছি, সেখানেই গান হচ্ছে। চল গান শুনি, এটায় যাবে না, ওটায়, না ওটায়?'

মতিকে টানতে টানতে নিয়ে চলে মিতা। সামনের আখড়ায় একেবারে পেছনের দিকে খড় বেছানো একটু জায়গা ছিল, মতির হাত ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'বোস।'

মতি বসে। মতিকে কাছে ধরে রাখার জন্যে কাঁধের ব্যাগটা মতির কোলের ওপর রাখে মিতা। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

মতি বাউল দেখতে বসে বসে গলা বাড়ায়।

মিতা বলল 'ওভাবে দেখতে পাবি না, গান ত শুনতে পাচ্ছিস, দেখার কী আছে।'

হাওয়ায় মতির চুল ওড়ে।

মতির কোলের ওপর ব্যাগ রাখা অবস্থায় মিতা ব্যাগের চেন খোলে। 'দাঁড়া, রুমাল বের করি।' রুমাল বের করে নাকের কাছে ঠেকায় 'কেমন, মিষ্টি গন্ধ না? সেদিন ট্রেনে কিনেছি।'

মতি হাসে।

'তোর মুখে কি ধুলোবালি! আয় তোর মুখ মুছিয়ে দিই। 'মতির মুখ মুছিয়ে দেয় মিতা। 'তোকে যে তখন বললাম না—থাক বলব না।'

'কী বলতে হবে কিন্তু।' মতি মিতার চুল ধরে টানে।

'আহ্ ছাড়, ছিঁড়ে যাবে।'

'না বলতে হবে।'

'তাহলে বলি? না।'

মতি চুল ধরে টানে।

সত্যি সত্যি কয়েকগাছা চুল ছিঁড়ে নিল মতি। 'বল বলছি।' হাঁটুতে হাত দিয়ে চাপ দেয় মতি। ব্যথা দেয়।

'বলছি বলছি, আহ্ লাগে না!' একটু থেমে গিয়ে 'হ্যাঁরে তুই আমাকে ভালবাসিস?'

'বলব না।' মতিও মজা করতে শিখেছে। 'তোমার কথা শুনি।'

'তুই কথা শুনবি কি, তুই ত একটা পাগল।'

'পাগল ত পাগল।' মতি অপলক মিতার দিকে তাকিয়ে আছে।

'হেঁটে এসে পায়ে কি ব্যথা রে। তোর কোলে মাথা রেখে একটু পিঠ সোজা করব? তোর কষ্ট হবে না ত?'

'ধ্যেৎ! কষ্ট কি। এই কথা বলতে এত বাঁকিয়ে কথা বলছিলে?'

'তুই সত্যি একটা বোকা।' কোলের ওপর মাথা রেখে চিৎ হয়ে শোয় মিতা। মতির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মতির শরীর শিহরিত হয়। এবং তার মুখটা নেমে আসতে চায়।

'আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কী দেখছিস মতি?'

'কিছু না, তোমাকে দেখছি।'

'আমাকে তুই কী দেখিস এত?'

'দেখি।'

'কী ভাবিস?'

'কিছু না।'

'কিছু না?' মিতা মাথা নাড়ায়।

মতি কিছু জবাব দেয় না।

মিতা চোখ বোজে। ঠোঁট দুটো মৃদু নড়ে উঠল 'আমার চোখ দুটোয় তোর আঙুল দিয়ে বুলিয়ে দে ত।'

মতি মিতার চোখের বোজা পাতায় আঙুল বুলোয়। মিতাদি তাকে দেখতে পাচ্ছে না, দিদির মুখ থেকে চোখ ফেরায় না মতি। স্পর্শে ও দেখায় ভেতরে অস্থিরতা বেড়ে যায় মতির। মিতাদি যদি ঘুমিয়ে পড়তো, তাহলে দিদির বুকে হাত দিত সে। তার বেশ লাগতো। মতির বড় কষ্ট হয়, দিদি তার কী জানে? কেন? বাউল নেচে নেচে গান গায়। ঘুরে ঘুরে নাচে। মিতাদি তার বুকে বিলি কাটছে। মতি বুঝছে তার ভেতরের পুরুষটা ভেতরে ভেতরে কেমন ছটফট করছে। দিদি জেগে আছে তাহলে। একটু

বুকে হাত দিতে পারত যদি! তারপর আর? আর কী? কীভাবে? দিদির গলা টিপে মেরে ফেলবে কি? হাত দুটো নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেই দিদি মরে যায়।

'সাপ সাপ' চিৎকারে আখড়ায় লোকজন দাপাদাপি হুল্লোড় করে উঠল। দিদিকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে সহসা উঠিয়ে সরিয়ে নিয়ে যায় মতি। মিতা আচমকা ভয় পেয়ে যায়।

জাত সাপ নয়। একটা লাউডগা সাপ। আখড়ার লোকজনদের বিশৃঙ্খলা আর থাকে না। যে-যার আবার নিজের জায়গায় বসে যায়। কেউ শুয়ে, কেউ বসে, কেউ কাত হয়ে. কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শুনছে। বিজলি বাতিতে চোখ ঝলসে যায়। মিতা খোপা বাঁধে। মতিকে হাত ইশারা করে কাছে ডাকে। মতি কাছে আসতে খুব ঘনিষ্ঠ স্বরে বলে 'চল, অন্ধকারে কোথাও গিয়ে বসি। আলো চোখে সইছে না।' মিতা মতির দিকে হাতটা বাড়িয়ে বলল 'তুই ধরে নিয়ে চল।' মিতা চাইল মতিই তাকে নিয়ে যাবে। মতির উদ্যোগটা মতি দেখাক।

মতি ভিড়ের মধ্যে হাত ধরে ঢুকে গেল। মিতা শ্লথ হাঁটে। ভিড়ের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে মিতা। মতির হাত থেকে হাত ছেড়ে যায়। ভিড়, ধাক্কা-ধাক্কি। মিতা কাতরকণ্ঠে ডাকে 'মতি মতি!' মতি এসে আবার তার হাত ধরে। আবার এগিয়ে যায়। আবার ধাক্কাধাক্কি। মিষ্টির দোকান। মিষ্টির চুর সাজানো। লটারি খেলা হচ্ছে। বাতাসে পাঁপড় ভাজার গন্ধ। সার্কাস খেলার জন্যে লোক ডাকছে। মতি এই মেলার মধ্যে জেগে উঠছে যেন। বুকে দোলা দিয়ে উঠছে। নাগরদোলা শূন্যে উঠে যাচ্ছে। যেখানে যত ভিড়, সেখানে তত মজা। কোথায় যেন গঙ্গা-যমুনা আছে। একটা ছেলের দুটো মুখ। একই দেহ, দুটো মাথা। দুজনেই খায়, একজনের পেটে যায়। একজন খেলে আর অন্যজন খাবার জন্যে বায়না করে। ভারি দেখতে। রঙ-বেরঙের সব মিষ্টি।

কিছুক্ষণ পর মতি দেখল ভিড়ের মধ্যে যার হাত ধরে হাঁটছে, সে মিতাদি নয়, তার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট এক ছেলের হাত ধরে আছে। 'দিদি দিদি!' চিৎকার করে মতি। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। 'দিদি দিদি।' পেছিয়ে যায়। পায় না। আবার দ্রুত এগিয়ে যায়। 'দিদি দিদি।' এ-মুড়ো ও-মুড়ো ছোটে। দিদিকে পায় না মতি। এই সময় তার খুব ইচ্ছে যায়, দুটো লাল মিষ্টি খেতে। আর একবার লটারি খেলতে।

মতি তার হাতটা কখন ছেড়ে দিয়ে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেছে, এক ঘণ্টা মত ভিড়ের মধ্যে তন্ন তন্ন খুঁজেছে মিতা, মতিকে পায় নি। মতি কোথায় হারিয়ে গেল? কতজনকে যে পেছন থেকে মতির মত দেখতে, তার হিশেব নেই। সামনে গিয়ে দেখেছে, ও মতি নয়। এখন মিতা ক্লান্ত। বড় বেশি ক্লান্ত। একটা আখড়ার সামনে শিশিরে ভেজা ঠাণ্ডা নরম ঘাসের ওপর বসে পড়ে। হাঁপায়

মিতা। মতি হারিয়ে গেল? বড় বিষণ্ণ হয়ে ওঠে মিতার মনটা।

মিতা আকুল চোখে মেলাটাকে দেখতে চাইল। শুধু ছেলেমানুষ হয়ে গিয়ে মেলাটাকে উপভোগ করতে করতে সমস্তকিছু ভুলে যেতে পারে। কী যে করে! কিন্তু মতিকে পাওয়া গেল না।

খুব চড়া গলায় নারীকণ্ঠ গান গেয়ে উঠল। কৃষ্ণাদাসী গান গাইছে। বিচ্ছেদের গান। সত্যি যেন বিচ্ছেদে প্রাণ কাঁদছে কৃষ্ণাদাসীর। রোগা, কালো মেয়েটার কী প্রাণ-ছেঁড়া কণ্ঠস্বর। গানের দুঃখ, নিজের দুঃখের সঙ্গে মিশিয়ে না নিলে বোধ হয় তেমন গান হয় না। কিংবা পরের দুঃখের কথা না জানলে, দুঃখকে দুঃখে প্রকাশ করা যায় না। অন্যে নিজের দুঃখের কথা ভাবতে পারবে, না হলে দুঃখের গান হয় না।

মতি হারিয়ে গেল কেন?

আবার ভিড়ের মধ্যে সেঁদিয়ে যায় মিতা। ভিড় ঠেলে এপাশ থেকে ওপাশে যায়। আব ভিড়ের অভ্যন্তরে চলে যায়। একে দেখে ওকে দেখে, মতির মত অনেককে মনে হয়। চিৎকার করে 'মতি মতি!' ভিড়ের চাপে আঁচল তার মাটিতে গড়াগড়ি খায়। ধাক্কা খায়। হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে সামলায়। 'মতি মতি!' পা থেকে জুতো খুলে পড়ে। কারো পা সেটাকে আরো একটু দূরে নিয়ে ফেলে। যেন মনে হয় মিতার, মতি তার কাছে কোনোকালে ছিল না, এখনো নেই।

ওপর দিকে তাকায় মিতা। আকাশ আলোয় ভরে আছে। চাঁদের আলোয় ভিড় ঠেলে ঠেলে এগোয়। একে দেখে, ওকে দেখে। একই জায়গায় বার বার ফিরে আসে। ক্রমশ যেন ভিড়ে নিজের মধ্যে ঢুকে পড়ছে মিতা। এবং নিজে একা যেন দোকানে চুড়ো করে সাজানো মিষ্টির মত একটা একটা করে খেয়ে নেবার মত সমস্ত মেলাটাকে খেয়ে নেবে। পারলে সেও মিষ্টি খেতে পারে। মেলায় পাঁপড় খেতে পারে। লটারি খেলতে পারে। বাঁশি কিনে ফুঁ-দিয়ে বাজাতে পারে। নাগরদোলায় চড়ে আনন্দে লুটোপুটি খেতে পারে। এক-দিন তারও শৈশব-বাল্য ছিল।

সামনে সতীমায়ের মন্দির। মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মিতা। সামনেই দোকানে পুজো দেবার উপাচর বিক্রি হচ্ছে। মিতা সঙ্গে সঙ্গে একটা সরা কিনে ফেলে। অগত্যা পুজো দিতেই চাইল সে।

আবার দু-বার নাগরদোলা চড়েছে মতি। আরো দু-বার লটারি খেলেছে। ঘুগনি খেয়েছে। লাল মিষ্টি খেয়েছে। দুটো বড় বড় সিগারেট কিনে খেয়েছে। তারপর তার খুব ঘুম ধরেছিল। হাই ওঠে। ক্লান্তি লাগে। পা লুটিয়ে পড়েছে। পায়ে ব্যথা। মিতাদি কোথায় গেল? সার্কাস দেখল। নানান ভেলকি দেখল। ম্যাজিক দেখল। হাতে কয়েকটা টাকা ছাড়া আর টাকা নেই।

তার পরেও মিতাদিকে কত খুঁজল। এদিক-ওদিক। এ দোকান সে দোকান। আখড়াগুলোতে মুখ বাড়িয়েও দেখেছে। কোথাও নেই। এই সময় তার খুব জলতেষ্টা পেয়েছিল। একটা জলের কলের মুখ ধরে এক পেট জল খেয়েছিল। কতজনকে যে মিতাদি বলে ভুল করেছিল!

একটা আখড়ায় গান শুনতে বসেছিল তারপর।

তার ভাল লাগছিল বাউলের নেচে নেচে গান। গলা ফাটিয়ে গান করছে। বসে থাকতে থাকতে, চেয়ে থাকতে থাকতে ঘুমে চোখ ঢুলে আসে। ঘুম, সরিয়ে আবার তাকায়। তারপর আবার কখন যে চোখ ঢুলে আসে। ঘুমে অর্ধঘুমের ভেতর কখন যেন মতির আনন্দে নাচতে ইচ্ছে করছিল। গানের ছন্দে সুরে ভরে উঠেছিল। এই গানে, মেলার আনন্দে অনেক কিছু ভুলে যায়, অনেক দুঃখ-বেদনা তার সান্ত্বনা পায়। যেন মাতৃত্বের হাত তার সারা শরীরে স্নেহের স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে। কেন যে মনে হল, এখন যদি তার মার গায়ের পাশে বসত, এবং সেই ছোটবেলার মত আচরণ করত! মাথাটা টেনে নিত বুকের দিকে। সেই আট বছর থেকে পাটোয়ারবাগানে চলে এসেছে। মাঝে আট ন বছর কেটে গেছে। সেই আট বছর যেন তার কাছে ফিরে আসতে চাইছে। এবং সে-রকম একটা শান্তি তার চোখে এঁটে আসছে। তার চোখে যেন স্বর্ণরেণু উড়ছে। কোনো অস্থিরতা নেই। একটা সমাহিত অবস্থায় বসে আছে মতি। কোনো পাখি যেন ভাবী ডানায় তার চোখের ওপর এসে বসেছে।

নাগরদোলা তার চোখের ওপর ওঠা-নামা করছে। হরেক ম্যাজিক হয়ে উঠছে চোখের ওপর। লটারির চাকা ঘুরছে বনবন। থামালেও থামে না। নাগর-দোলা যে কত শূন্যে উঠে যায়। খালি বাক্সো থেকে পিল পিল করে হাঁস বেরিয়ে আসছে। হাঁসগুলো ডানা মেলে আকাশে উড়ছে। আকাশের অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। মতিও উড়ে যেতে পারে। অনেক লাল লাল মিষ্টি চুড়ো করে সাজানো আছে সেখানে।

চোখ চেয়ে দেখে গান হচ্ছে। বাউল নেচে নেচে গান গাইছে।

মিতাদি কোথায় গেল? মেলার ভেতর কোথাও নেই মিতাদি।

মতি জেগে থাকার ঘোরতর চেষ্টা করে। কিন্তু পেরে উঠছে না। চোখের পাতা নেমে আসছে। ঘুমিয়ে পড়ছে, আবার জেগে উঠছে। বাউলের গান আর নাচ। ঘুমের ভেতরও শান্তি, জেগে উঠে গান শুনেও শান্তি। আনন্দ। ঘুমে জাগরণে আনন্দ পাচ্ছে মতি। মেলা জুড়ে আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। মতির পা দোলে, গা দোলে। গানে তাল দেয় তার শরীর।

আখড়ায় অনেকেই শুয়ে শুয়ে ঘুমচ্ছে। মতি আর পারে না। একটু ফাঁকা জায়গা পেয়েছিল। শুয়ে পড়ে। গানে ভরে উঠছে শরীর। নেচে উঠছে শরীর। মতি সটান ভারী ঘুমের মধ্যে চলে যায়।

দৌড় দৌড়। লোক ছুটছে। রাস্তায় ভিড়ের স্রোত চলেছে। স্টেশনের দিকে। গ্রামের মানুষ, যে-যেখানের ফিরে যাচ্ছে। সেই স্রোতের সঙ্গে মিশে যায় মতি। চলতে চলতে মনে হল মিতাদি তার সঙ্গে নেই। চোখ তার চার দিক মিতাদিকে খুঁজছে! মিতাদি কি হারিয়ে গেল? মিতাদি কি নেই হয়ে গেল? কোথাও দেখতে পাচ্ছে না! ভিড়ের ভেতর ভিড় হয়ে হাঁটছে মতি। মেয়ে পুরুষ বাচ্চা বুড়ো নানান মানুষের স্রোতে রাস্তা উপচে পড়ছে।

আকাশে রোদ উঠে গেছে। ঝকঝকে রোদ' মানুষের মুখ আরো চেনা হয়ে উঠছে। কোলে কাঁখে শিশু। সংসারের লোকজনের হাতে সংসারের নতুন কেনা জিনিশপত্তর। হাতা খুন্তি বেলনচাকি, হাঁড়িকুঁড়ি, বাসন-কোসন কাপ প্লেট, দা কাস্তে, চিমটে নরুন, জগ গেলাস, মুড়ি ভাজা মাটির হাঁড়ি, বেতের ধামা, বাঁশের কুলো, চিমনি, টিনের লণ্ঠন – নানা জিনিশ কিনে নিয়ে হাতে হাতে নিয়ে ফিরছে মানুষ। কোনো কোনো শিশু কাঁদে। শিশু কোল বদল করে মায়ের কোল থেকে বাবার কোলে গিয়ে। কেউ জোরে হাঁটতে পারে না, তার জন্যে বার বার থমকে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে কেউ। এ-ওর নাম ধরে ডাকছে। মা দিদি বাবা কাকা কাকি মেসো এসব ডাক ডেকে উঠছে। নানা সম্বোধন ভিড়ের ভেতর ফালাফালা হয়ে উঠছে নাড়ীছেঁড়া চিৎকারে।

মতি না হাঁটলেও স্রোত তাকে টেনে নিয়ে যায়। এক সঙ্গে এত মানুষের সঙ্গে কোনোদিন হাঁটেনি মতি। বাচ্চার মুখে বাঁশি বেজে উঠছে। ঝুমঝুমি বাজছে। দম দেয়া পুতুল কিট কিট করে উঠছে। বেলুনে হাত ঘষার শব্দ। দুমদাম বেলুন ফাটছে। শিশুর হাতের বল গড়িয়ে যাচ্ছে।

স্টেশনে এসে হতচকিত হয়ে যায় মতি। রঙের বন্যা বইছে। আজ দোল। রঙ খেলা শুরু হয়ে গেছে। প্ল্যাটফরম বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে রেল-লাইনে। দাপাদাপি হুল্লোড়। কয়েকজন যুবক ছুটে ছুটে রঙের পিচকারি ছুঁড়ছে। জামা শাড়ি রঙে রেঙে উঠছে। মুঠো মুঠো আবির ছুঁড়ছে। স্টেশনের মানুষরা রঙে রঙে মাখামাখি। পিচকারির রঙ ছুটে এলে শরীর বাঁকিয়ে হাত দুটো চোখের ওপর আড়াআড়ি রেখে বাধা দেয়। রঙে ভরে উঠলে তার মুখ হেসে ওঠে। তার আনন্দ হয়, আনন্দে সে রঙের খেলায় মেতে ওঠে। কারো কাছ থেকে মুঠো মুঠো আবির নিয়ে মানুষের উদ্দেশ্যে মানুষ ছোঁড়ে। বাতাস রেঙে যায়। মানুষ রঙে ভরে ওঠে। হাসি হল্লা। আনন্দের স্রোত বয়। রঙে থই থই করে প্ল্যাটফরম।

মতি প্রথমে রঙ নিতে বাধা দিচ্ছিল। একটা পিচকারি যখন তার জামা ভিজিয়ে দেয়, বুক ভিজিয়ে দেয়, মুখ রাঙিয়ে দেয়, তারপর আরো রঙ মাখতে উৎসাহ পায়। আনন্দে নাচানাচি করতে করতে মতি এদিক থেকে ওদিকে যায়। আর দেখতে পেয়ে যায় তার মিতাদিকে। মিতাদির হলুদ রঙা-শাড়ি নানা রঙে ভরে আছে। তাকে উদ্দেশ্য করে একজন পিচকারি ছুঁড়ছে।

মিতাদি যেন নেচে উঠছে। হাসিতে ভরে উঠছে। মুখে রঙ এসে পড়েছে। রঙে রঙে চেনা যায় না। শুধু নাক আর চোখ দুটি দেখে চিনতে পারে। মাথার চুলে নানা রঙের আবির। মিতাদি মুঠো মুঠো আবির নিয়ে খেলছে। গাদা গাদা মানুষের ভিড়ের দিকে মুঠো মুঠো রঙ ছুঁড়ে দিচ্ছে।

মিতার সারা অঙ্গ রঙ মেখে নিয়েছে। রঙে যেন স্নান করেছে। হাতে বাহুতে রঙ। কপালে, মুখে রঙ। গলায়, বুকে রঙ। শাড়ি, জামাতে রঙ, হাসিতে রঙ, স্বভাবে রঙ। রঙে রঙে রঙিন। এত হাসতে পারে? এত রঙ মাখতে পারে? এত আনন্দ করতে পারে? মিতা এত হাসতে পারে। এত রঙ মাখতে পারে। এত আনন্দ করতে পারে।

মতি যত দেখে, তত বিস্ময় বাড়ে তার। আকাশটাও রেঙে উঠবে বুঝি।

রঙে রঙে মিতা একেবারে অচেনা মানুষ হয়ে আছে. অনেক অচেনা মানুষকে মিতার মত লাগে, মতিও বুঝি রঙে রঙে অচেনা হয়ে উঠেছে. অনেক অচেনা মানুষের মত মতিকে লাগে. তাই মতির মিতাকে চিনে নিয়ে কাছে যেতে দ্বিধা হচ্ছে. মিতাও হাত ধরতে আসছে না মতির। মিতার সঙ্গে মতির দূরত্ব বেড়ে যায়। মাঝখানে থাকে এক রাশ রঙ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রেম

এক বিরহে থাকা যাবে, এক কারখানায় থাকা যাবে না। এক বিষাদে থাকা যাবে, তবুও এক কারখানায় থাকা যাবে না। সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে, দপ্তরিপাড়ায় মজিদ মিয়ার কারখানার চাকরিটা চলে যায় মিতার। দোলের আগের দিন ঘোষপাড়ার সতীমার মেলায় গিয়ে, সকালে স্টেশনে রঙ খেলে, ঠাণ্ডা বাধিয়ে এক সপ্তাহ জ্বরে ভুগে, মজিদের কারখানায় কাজে আর ফিরে পায় নি মিতা। কল্যাণী সীমান্ত স্টেশনে মিতা যে সেদিন রঙে রঙে ছেয়ে অতিরঙিন হয়ে উঠেছিল, সেই উপলব্ধিটুকু মিথ্যে নয়, এটা জানে মিতা। দোলের অনুষ্ঠান ছিল বলেই সেই বাইরে শরীরী রঙিনতায় দৃশ্য হয়ে উঠতে পেরেছিল। রঙ তাকে ছুঁয়েছিল। যে যে পুরুষরা তাকে লক্ষ করে রঙ ছুঁড়েছিল, তারা কেউ নয় তার। তারা বুঝি হয়ে উঠেছিল, প্রেমের প্রতীক। কোনো ব্যক্তিসম্পর্কে যাদের ধরা যায় না। কৃষ্ণকানাইয়া যেমন প্রতীকে জীবনের প্রেমের অনুভব আকুলতা তৈরি করে, কানাইয়ের প্রতি আকুলতা তৈরি হয় না, তেমনি কল্যাণী সীমান্ত স্টেশনে যারা তাকে রঙ দিয়েছে, তারা তেমনই প্রতীক হয়ে উঠেছিল।

সেই উপলব্ধির অনুরণন এখন মিতার সর্বশরীরে, দিনযামিনীর বিচরণে সেই আকুলতা তৈরি করে চলে প্রেম। পুরুষের প্রেম। তার সাড়ে ছাব্বিশ বছর বয়সের যুবতীসময় যতটা আকুল হতে পারে, চৈতন্য ও শরীরী অস্থিরতায়, ততখানিই। কেন এমন হয়?

কেন এমন হয়? প্রেমসম্পদে থাকার আকুলতা? বেঁচে থাকার প্রতি মুহূর্তে প্রেমসম্পদ চায়। না হলে বাঁচা মিথ্যে। বাঁচার নিজস্ব নিয়ম আছে। প্রেমের পুরুষ নেই বলে যে প্রেমসাগরে থাকবে না তা নয়। প্রেমচৈতন্যে মিতা সবসময় উৎকর্ণ থাকে। প্রেমসজাগতা এক, প্রেমবিরহ আর-এক, কিন্তু দুটোই যে একসঙ্গে থাকতে নেই তা নয়, থাকেই। মিতার সময়গুলো এই দুই ভাবমুহূর্তে কাতর থাকে। না হলে বাঁচাটা মিথ্যে হয়ে যেত। বাঁচার শারীরিক নিয়ম আছে, খাদ্যগ্রহণ, জল খাওয়া, স্নান করা, শাড়ি জামা পরা, প্রতিদিনের আরো সবকিছু করা, এগুলোর মতই প্রেমজাগরতায়ও তাকে থাকতে হয়। প্রেমবিরহ তারই আর একটি ভাব। প্রেমসম্ভাবনা প্রতিটি মুহূর্তে তৈরি করে আহত হতে থাকলে তার পাশাপাশি প্রেমবিরহেও তাকে থাকতে হয়। প্রেমসম্ভাবনার বাসনা তৈরি হয় কিছুটা অতীতপ্রেমের স্মৃতির আস্বাদের অনুপস্থিত আকাঙ্ক্ষায়। আবার নতুন আকাঙ্ক্ষা পরিপুষ্ট হয়, প্রতিদিনের চেনা, নতুন মুখের সম্পর্কের দ্বন্দ্বে। তা যে স্মৃতির প্রেমের উচ্চতা পায়, তা নয়, আবার স্মৃতির প্রেমের উচ্চতাকে ছাড়িয়ে যাবার সম্ভাবনার নতুন বাসনাও তৈরি করতে পারে, মানুষ ভেদে, মানুষের স্বভাবগুণ, মোহন আকর্ষণের যাদুতে। তা কতখানি জীবনযাপনে সত্য হবে, তা বলা যায় না। তবে প্রেমবাসনা তৈরি হয় এটা সত্য। সে বেঁচে থাকে বলেই এই ভাবনাকে মরতে দিতে পারে না।

গাছের সবুজের ভেতর, গোধূলির হালকা রঙের ভেতর, স্নিগ্ধ জলাশয়ের স্মৃতির ভেতর বাতাসের গোঙানির অবাধ্যতার ভেতর, আকাশের রঙ নানা পরিবর্তনের নানা মুগ্ধতার ভেতর, বাহিত, ভারী হয়ে ঝোপে, বীজের থেকে অঙ্কুর দানা ফাটিয়ে বেরনোর প্রক্রিয়ার সহজ স্বাভাবিকতায়, প্রেমবাসনার নতুন ইচ্ছে সে খুঁজে পায়। সেটা সে বাঁচার নিয়মেই পায়। আমাদের শরীরী ইচ্ছে, মনের বাসনা যে ভাবে সম্পর্কের দ্বন্দ্বে খুঁজে পাই, আবার নতুন ইচ্ছে নিয়ে একটা পরিকল্পনা তৈরি করি, তাতে পূর্বজীবনের যা পক্ষে আসে সেটুকুই গ্রহণ করতে পারি অধুনার যুক্তির নিয়মে। আকাঙ্ক্ষার কোনো পূর্বনৈতিকতা একভাবে মানুষ বহন করতে পারে না। তা ভাঙে, নতুন যুক্তি সে তৈরি করে। যুক্তিহীনতার তার অভাব হয় না। গাছের সবুজের ভেতর আলোছায়া খেলতে খেলতে যে সজীবতা স্নিগ্ধতা, বুনো গন্ধ, বাতাসে শাখা-প্রশাখা পল্লবে যে প্রাণের স্বাধীন সঞ্চার থাকে, তা দেখে মানবের স্বাধীন বাসনা তৈরি হতে পারে। এটা চৈতন্যের দ্বন্দ্বের নিয়ম। সংঘর্ষের সত্য। আমাকে আমি বলার সত্য।

পূর্বনৈতিকতার তন্তুজাল ছিঁড়তে, অপরাধের আকাঙ্ক্ষা হলেও, সে নতুন

যুক্তি তৈরি করে নিতে পারে। নেয়ও। রক্ত-মাংসের চাওয়ার কাছে নৈতিকতার কোনো চিরসত্য বলে পৃথিবীতে কিছু থাকতে নেই। কারণ যে নীতি আমরা তৈরি করি স্থান কাল পাত্রভেদে একই রকম তাকে থাকতে দেখা যায় নি। আর মানুষের মন ও শরীরী চাওয়ায় ত অরো স্বাধীনতাবিলাসী সে। তাকে শাসন করা যায় না। সে শাসিত হলে অসুস্থ হয়ে যেতে পারে বরং। সে অসুস্থতা যদি ইচ্ছে বিরোধী আচরণ করে, তা হলে সেটা অসুস্থতাই, সত্য নয়।

মিতা প্রতিমুহূর্তে জানে সে বিধবা, তার আর পুরুষসঙ্গে থাকার অধিকার নেই। এটা জেনে রেখেই মিতা প্রতিমুহূর্ত পুরুষসঙ্গ পাবার প্রেম আকুলতা বিপরীতভাবে তৈরি করে। দোকানদার ও তাকে আরো রঙিন করেছে। প্রেম নিজে নেবার এক আকুলতা সে পায়। কানে কানে যেন তার কথা বলছে কেউ। তাকে ছুঁয়ে কেউ। গা শিহরে শিহরে ভরে ওঠে। নতুন করে প্রেম। নতুন করে বাঁচা। মন কোনো নীতিতে বশ মানতে চায় না। সারাক্ষণই সে ভিজছে রঙের পিচকারিতে। সাড়ে তিন বছর বিধবা হয়েছে। এক বছর বাংলাদেশে ছিল। আড়াই বছর হল এখানে। অন্য দেশ অন্য রাষ্ট্রে। নিজের দেহের গন্ধে নিজেই মরে থেকেছে। নিজেই নিজের দেহের গন্ধ পায়। সে যে কারো কাছে প্রেম নিবেদন করতে পারে, এটা যে ভাবে নি তা নয়। এই ভাবনার বিদ্রোহ সে চায় নি। কিন্তু সতীমার মেলা। মানুষের মুখের অজস্রতার ভেতর, নিজস্ব নিভৃত জীবনের আকর্ষণ বোধ করেছিল। ঘটি বাটি হাতা খুন্তি কড়াই বঁটি ধুচুনি চাটু লণ্ঠন পিলসুজ চালুনি কুলো সরা মালসা হাঁড়িকুঁড়ি এসব এক অর্থবহতা দিয়েছিল তাকে তার জীবনের নিজস্বতার দিকে। তারপর সে জনসমুদ্রের স্রোতে চলে এল স্টেশনে। সেখানে রঙ আর রঙ। তাকে যারা রঙ দিয়েছে, তারা তার কেউ নয়। এ থেকে মিতা আর-এক প্রেরণাসূত্র পায়, যে কেউই তাকে এই প্রেম দিতে পারে। নিবেদনের ইচ্ছে না থাকলে কেউ তাকে প্রেম দিতে চাইলেও সে নিতে পারে না। নিবেদনের ইচ্ছে থাকলে, কেউ তাকে প্রেম দিতে চাইলে, সে প্রেম পাবে। স্বামীস্মৃতি, স্মৃতি হয়েই থাকে, জীবনের বর্তমানতায় তার কোনো দাম থাকে না, এটা সে বুঝেছে। সব চেয়ে বড় কথা, নিজের কথা নিজে বুঝেছে।

কত রাত হয়েছে, জানে না। ঘুম ধরে না। জানলার বাইরে হালকা অন্ধকার। বিছানায় একা। বাঁ-পাশে জানলাটা। জাগতে জাগতে কোনো পুরুষকে প্রেমে পেতে চায়, এই কামনা তার বিন্দু বিন্দু জমতে জমতে প্রাকার হয়ে ওঠে। কানের ভেতর গুঞ্জন, শ্বাস-প্রশ্বাসের ভেতর স্নিগ্ধ রঙ এসে মিশতে মিশতে প্রেমকাতরতার ভাব তৈরি করে তার। নিজের মনে সে হাসে। প্রেম-সম্ভাবনার ভাবনা তৈরি করে সে প্রসন্ন হয়ে উঠতে থাকে। যার সঙ্গে তার প্রেমের কথা হয় নি, প্রেম হয় নি, নরেনের কথা সে ভাবে। যে নরেন তার দিকে তেমন চোখে একটিবারও তাকায় নি, তার সঙ্গে মুহূর্তেই প্রেমসম্পর্কের কল্প-

ভাবনা সে রচনা করে ফেলে। অন্ধকারের বিছানায় শুয়ে, জেগে সে, অন্ধকারের গায়ে হাসির টুকরো মেশায়।

হঠাৎই নরেন ভাবনার ভেতর এল। নরেনের কাছাকাছি থাকার ভেতর একবারও আসে নি। এই রাতের একাকিত্বের ভেতর মুখটা উঠে এল। মাত্র দুদিন নরেনের কারখানায় কাজ করেছে। নরেন একটা ছোট্ট ঘরে একটা বয় নিয়ে কাজ করে। দু-চারশো বই চেয়ে পেতে পেতে এনে ডেলিভারি দেয়। একটা ছোট কাটিং মেশিন আছে তার। সেখানে দুদিন কাজ করেছে, আর হয়তো একদিন কাজ করতে পাবে। আরো একদিন কাজ যোগান দেবার মত মালিক সে নয়। অতি ছোট মালিক। শান্ত স্বভাবের, বড় ঠাণ্ডা ভালমানুষ। নির্লোভ, ক্রোধহীন, বেদনাহীন, হাহাকারশূন্য, শাদাসিধে ভূতের মত কর্মঠ। এই কাজ কারবারে নরেন তার মত করে সুখে থাকে।

নরেনকে দেখার আনন্দে একবারও ভাল করে দেখে নি মিতা। দু-তিন দিনের কাজে লেগে, দু-তিন দিন কাজ করে আবার অন্য জায়গায় কাজে যাবে। এখন তার স্থায়ী কাজ নেই। ছোট ছোট কারখানায় ঘুরে ঘুরে কাজ করবে। একজনের সঙ্গে স্থায়িত্ববোধের পূর্বস্থির এক সৌজন্য প্রথম থেকে শুরু হয়ে যায়, সেটুকুও এতে নেই। কাল কাজ করে পরশু অন্য ঘরে কাজে লাগবে, তবু এখন মিতা নরেনের সঙ্গে কল্পসম্পর্ক গাঁথতে চায়, গাঁথার আনন্দ পায় বলে, একা বিছানায়, অন্ধকারে, নিদ্রাহীন যামিনীতে। নরেনের সঙ্গে কল্পসংলাপ তৈরি করে। নরেনের হাসি তৈরি করে। নরেনের স্পর্শ তৈরি করে। নরেনের চাহনির ভেতর প্রেম এনে দেয়। সে কতটা নরেনের চাহনির বিনিময় তৈরি করতে পারে তার জন্যে সে নিজের স্বভাবস্বাধীনতার অর্গল খুলে ফেলে। কল্পনার মোহআবেশে বিছানার অন্ধকারের ভেতর তলিয়ে যেতে থাকে মিতা। নরেনের সঙ্গে তার প্রেম হয় নি, এটা তার প্রেমসম্ভাবনার ইচ্ছের জাগরণ। এতেই, প্রেম না হলেও এই জাগরণের রক্তস্পন্দন তাকে তোলপাড় করে।

বাইরের ছায়া ছায়া অন্ধকার, অন্ধকারেই থাকে। এখন মিতা ঘামে। যেন নরেনের সঙ্গে তার সত্যি প্রেম হয়ে গেছে। এতখানি কল্পনা মিথ্যে হলেও তাকে গ্রাস করার পক্ষে যথেষ্ট। অন্ধকার নিপাট হয় আরো। গাঢ় সবুজে ঘন হয়ে ওঠে। প্রেমভাব জাগরিত করে, প্রেম গ্রহণের অনুকূলতা তৈরি করে সে। যেটা সে আগে পারত না। নিজের সঙ্গে নিজে ছলনা করত। প্রেমের গোপনতা আলাদা জিনিশ, ছলনার গোপন নিঃস্বতার অন্ধকার বাড়ায়। সেই অন্ধকারে সদ্য কৈশোর পেরুনো মতি ছটফট করে। হায় মতি! মতির জন্যে বড় কষ্ট হয় মিতার। মতিকে তার শরীরের জ্বর ছুঁতে দিয়েছে, শরীরের মনকে ছুঁতে দেয় নি। মিতার বিকারের ভেতর মতির কাছে মতি সত্যি। মতির কাছে মিতা সত্যি নয়। অন্ধকার সিনেমা হলের ভেতর মতির হাত বুকে টেনে নিয়ে, শরীর চিনিয়েছে শুধু, মন চেনায় নি। মতিকে একটু একটু করে

অন্ধকার গিলে খেয়েছে। শরীরের তাপের আধার মনশূন্য মতির শরীরই চেয়েছিল মিতা। মতির যে মনকে সে স্নেহ করতে চেয়েছে, সে মন পুরুষের প্রেমিক মন হয়ে মতিকে মতি জাগ্রত করেছে। এ জাগরণ মতির ক্ষয়, মিতার অনাকাঙ্ক্ষিত।

মতির মন থেকে শরীরটাকে ছিঁড়ে নিতে চেয়েছিল মিতা। মতির পুরুষ চেয়েছে, মনহীন। প্রেমহীন শরীরসর্বস্বতার খেলায় মতি কষ্ট পেতে শুরু করেছে। এতখানি নির্দয়তা মতির প্রাপ্য ছিল না। সেও নিজের মত করে শরীর মন পরিপূরকতার বিনিময়ের প্রেম সন্ধান করতে পারত। একদিন সে সুন্দর প্রেম পেত, ছলনার শিকার হত না। সে ভুল করে ফেলেছে, মতি কি তাকে ক্ষমা করতে পারে না?

মতির যা হয়, মতিরই হয়। মতির ভাল মন্দের দায়িত্ব নেয় নি সে। তার কী হল, তাতে তার কী যায় আসে? সে যা চেয়েছিল করেছে। মতিকে মতিই রক্ষা করতে পারে। সতীমার মেলায় মতি হারিয়ে গিয়েছিল। মতিকে খুঁজে পাবার জন্যে আকুল হয়ে উঠেছিল। এটা মিথ্যে নয়। মতি হারিয়ে যেতে চেয়েছিল। মতির বয়সের ছেলেমানুষি মতিকে এমন বিচ্ছিন্ন করেছিল।

প্রেমচৈতন্যের ইচ্ছেকে আহত করেছিল বলে বিকারের মধ্যে ছিল মিতা—সন্তুষ্ট থেকেছিল। সেটা কোনো জীবন নয়। জীবনের অন্য মানে। প্রেম নিয়ে তাকে জাগতেই হয়। সেই জাগার ভেতর সুখ। পাবার ভেতর তীব্র সুখ, পাবার ভেতরও জীবন আছে, জাগার ভেতরও জীবন আছে।

প্রেমচৈতন্যের ভেতর নরেনকে ভালবাসার আকৃতি তৈরি করে মিতা। নরেন তার চেয়ে ছ-সাত বছরের বড় হবে। আত্মসমর্পণের পরিণত মন লুকিয়ে আছে। মনের নির্ভরতা পাওয়া যায়। এসব মনে মনে গড়ে মিতা। নরেনের কিছুই জানে না। তা নয় জানুক, নরেনকে যে এক মুহূর্ত দেখেছে, সেই শরীরী মনের নরেন প্রেমিক হতে পারবে না কেন মিতার? নরেন এসব জানে না, নরেনকে নিয়ে এসব ভাঙাগড়া করে মিতা।

অন্ধকার রাত পড়ে থাকে বাইরে। রাত এমনই প্রেম কাতরতায় বয়ে যেতে থাকবে। ভবে যেতে থাকবে। রাতের সৌন্দর্য কি তাতে বাড়বে না? রাতে কত সৌন্দর্য লুকিয়ে থাকে। দাম্পত্যের প্রেম নিকট হয়। এই প্রেমের জন্যে মিতা দাম্পত্যের প্রেমের স্মৃতির যুক্তিটুকু নেয়, আর কিছু নিতে পারে না। রতনলাল দাস তার স্বামী ছিল, এটাকে মেরে ফেলে মিতা। মেরে ফেলার জন্যে এ মুহূর্তে যে যুক্তি লাগে, সে যুক্তিটুকুও নেয়। তার সাড়ে ছ-বছরের ছেলে দিপু পাশের ঘরে জা বিন্দুর কাছে ঘুমোয়। দিপুকেও সে মিথ্যে করে দেয়। ফেলে-আসা পূর্ববাংলার মাটি প্রকৃতি নদী আকাশ এসব ভাল লাগার স্মৃতি, এখনের ভাল লাগায় মিশিয়ে নেয় শুধু। আর কিছু নেয় না। নেয় না, তার কোলে মৃত্যু হওয়া, তার স্বামীর সঙ্গে ভালবাসার বিচ্ছেদ বেদনাকে। নেয় না,

অন্য দেশ থেকে অন্য দেশে চলে আসার স্বদেশ জন্মভূমির বেদনাকে। অন্য দেশ অন্য রাষ্ট্রের বেদনাকে নেয় না। তার এখন বাঁচার পক্ষে যা যুক্তি লাগে, সেগুলোর সমর্থনের গ্রহণ সে এভাবেই তৈরি করে। যেগুলো বর্জন করে সেগুলো এক সময় জীবনের বেঁচে থাকার তীব্রতর গ্রহণ ছিল। স্বামী রতনলাল দাসের সঙ্গে তার যে দাম্পত্য ছিল জীবনের বাঁচার তীব্রতার অনুভূতি ছিল তা। তার কোনো বিকল্প সে তখন ভাবতে পারে নি। সেই দেশ, বাংলাদেশ, তার ভাল লাগায়, জীবনে মিশে গিয়েছিল। তার দিপু তার শরীরের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। দিপুকে সে লালন করেছিল। তার স্বামীকে সে চোখে চোখে মনের আঁচল বিছিয়ে ভাসবাসতে চেয়েছিল সারাজীবন। তার স্বামীকে ঘিরেই স্বপ্ন দেখেছিল কতরকম। সংসারের সুখ খুঁটে নিতে চেয়েছিল কবুতরের ঠোঁটের মগ্নতায়। বন্যায় ভেসে যাওয়া নদীর প্লাবনে বিনষ্টিকে ভুলে গিয়ে নতুন আশার সঞ্চার তৈরি করতে পারত। এখান থেকেই মিতা, পূর্বগ্রহণের স্মৃতি বর্জন করে, নতুন আশার যুক্তি নিয়েছে।

নরেনের সঙ্গে তার প্রেম হয় নি। নরেনের প্রেম পাবার জাগরণে সে শান্তি পায়। রাতে জাগতে আনন্দ পায় সে। রাত সৌন্দর্য পায়।

নরেনের আট ফুট বাই সাত ফুট কারখানা। দেয়ালের দিকে ঠেসানো কাটিং মেশিনটা এক-তৃতীয়াংশ জায়গা জুড়ে আছে। আর বাদ-বাকির আশি শতাংশ ফর্মা বই কাগজপত্রে ঠাসা। জায়গা বাড়াবার জন্যে কাটিং মেশিনের ছুরির কোপ দেবার হ্যাণ্ডেল আর বাটাম এগনো পেছনোর হ্যাণ্ডেল দুটি খুলে রাখতে হয়। মেশিনটা গা ঘেঁষেই থাকে। অনেক সময় মেশিনের ভেতর শরীর ঢুকে যায়। যদি হ্যাণ্ডেল লাগানো থাকে, ওঠার সময় মাথা ফেটে যেতে পারে। ঘরে কোনো মাচা মই নেই, যে ওপরে মাচায় উঠে গিয়ে গোপন হয়ে থাকবে মিতা, ওখানে একা একা কাজ করবে। এমন বিচ্ছিন্নতা সে পায় নি। তা হলে অন্য একটা বিচ্ছিন্নতা সে পায় নি। তা হলে অন্য একটা বিচ্ছিন্নতা তৈরি হতে পারত। শ্রমের বিচ্ছিন্নতা। শ্রমসঙ্গে থাকার যৌথ সম্পর্ক অন্তত থাকতে পারে। একটা তক্তি ফেললে, আর একটা তক্তি ঠেসিয়ে পড়তে পাবে। এই ঘনিষ্ঠ অবস্থানে নরেনের নিশ্বাসের শব্দ প্রতিটি পেতে পারে মিতা। গায়ের গন্ধ ঘ্রাণে অবিরত পেতে পারে। চোখের চাহনির মন ধরা পড়তে পারে।

আজ কাজে এসে মিতার হু হু করে ওঠে মন। সব সময়েই মুখিয়ে থাকে নরেনের প্রেম পাবার সচেতনতায়। নরেন চাপা স্বভাবের। এক নির্লিপ্ততা ধরে রাখতে পারে শরীরে মনে। নরেনের কে আছে কী আছে জানে না। বছর ত্রিশ বত্রিশ বয়স হবে নরেনের। সংসার আছে কিনা জানে না। তা থাকতেই পারে। আজ একটু কাজল পরেছে মিতা। নতুন একটা টিপ পরেছে। তার ছোট টিপের থেকে বড় টিপ পরার খুব ইচ্ছে। একটা ভাল শাড়ি পরে এসেছে।

বসন্ত মালতীর শিশিতে এক ফোঁটা ক্রিম পড়ে ছিল, সেটা হাতের চেটোয় উপড়ে করে ঢেলে মুখে মেখে এসেছে। অথচ আজই নরেনের কাছে তার কাজ শেষ হয়ে যাচ্ছে। বিকেল পাঁচটার পর। নরেন বইয়ে আস্তর দিচ্ছে। নুয়ে আছে মুখ নরেনের। সেলাই বন্ধ রেখে নরেনকে সে দেখে। কাজল ভ্রূ। একটু ফর্সা দেখতে। নরম স্বভাবের মানুষ। পাতলা গড়ন। একটা লুঙ্গি পরে আছে। গায়ে ফর্সা গেঞ্জি। কদিন দাড়ি কাটে নি, ফর্সা মুখে ঘন দাড়ি বেশ মানিয়েছে। আজই এমন নরেনকে তাকিয়ে দেখে মিতা। কাজের ভেতর দেখার ইচ্ছে থাকে। কাজ থেকে ইচ্ছে সরিয়ে দেখে।

এখন এগারটাব কিছু বেশি হবে। আজ বয়টা আসে নি।

হাতের কাজ থামিয়ে নরেনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে মিতা। নরেন মুখ নামিয়ে কাজ করছে। এ রকম তাকিয়ে থাকার মধ্যে নরেনের দৃষ্টি বিনিময়ের অপেক্ষা করে মিতা।

নরেন এই দৃষ্টি বিনিময় বোঝে, অপেক্ষা বোঝে, কিন্তু তার স্বভাবের নমনীয়তায় স্বভাবশৃঙ্খলা ভাঙে না।

'আমাকে তাড়িয়ে দেবেন ?' মিতা তেমনই তাকিয়ে থাকে। দৃষ্টি বিনিময়ের অবস্থা গড়ে।

নরেন মুখ তোলে। 'কাজ থাকলে কাজ করবেন, তাড়িয়ে দেবার কথা বলছেন কেন ?'

মিতা ঠোঁটে অদ্ভুত হাসি ফুটিয়ে রাখে। 'আপনার ঘরটা আমার খুব পছন্দ, বেশ, ঝামেলা ঝঞ্ঝাট নেই।'

এ কথার কোনো উত্তর করে না নরেন। মিতার হাসির দিকে, মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে আবার।

'আপনি কোথায় থাকেন ?'

'বেলঘরিয়া।'

'বাড়ি করেছেন ?'

'দরমার বাড়ি।'

'প্রতিদিন ফিরে যান ?'

'হ্যাঁ।'

'আমার অনেক দূর, বারাসাত।'

কথাটা এখানে এসে থেমে যায়। এই কথার পিঠে নরেন স্বভাবতই জিজ্ঞাসা করতে পারত, মিতার বাড়িতে কে কে আছে। ছেলের কথা না বললেও দেওর শ্বশুর জা এদের কথা বললেই, সে যে বিধবা এটা প্রকাশ হয়ে পড়ত। তা ছাড়া নরেন এটা জানেই, বিধবা না হলে কোনো মহিলা এ লাইনে কাজে আসে না। এ-রকম ব্যক্তিগত কথা এত কম সময়ের পরিচয়ে হয় না। আর বেলঘরিয়ায় নরেন থাকে, নিজের দরমার বাড়ি আছে, সেখানে নরেনের বউ বাচ্চা

আছে কিনা এটা জিজ্ঞাসা করার পরিচয় হয় নি তাদের। ফলে কথা বিনিময়টা এখানে থেমে যায়।

নরেন 'কাঁচিটা দিন ত।'

মিতা নিজের কাঁচিটা বাড়ায়।

'ওটা নয়। বড়টা। যেখানে থাকে।'

'আমি কী করে জানব, কোথায় থাকে?' মিতা হেসে ফেলে।

নরেনের ঠোঁটে একটু হাসি ফুটে ওঠে। 'ও আপনি জানবেন কী করে। আপনি ত এই দু'দিন কাজ করছেন। আপনার পেছনে, সুতোর বাক্সের ওপর।'

কাঁচিটা টেনে বের করে আনতে মেশিনের ভেতর মাথাটা গুঁজে দিতে হয় মিতাকে। কাঁচিটা টেনে এনে, মাথাটা তুলতে গিয়ে মেশিনে মাথা ঠুকে যায়।

'আহ্ লাগল নাকি?' নরেন অনুচ্চকণ্ঠে বলে।

মিতা মাথায় হাত বুলিয়ে হেসে ফেলে। 'না।'

মাথায় লেগে যাবার ঘটনায় নরেনের সহৃদয়তা বোধ অতি নরম এটা বুঝে যায় মিতা। আর কোনোদিন যদি কাজে আসে নরেনের কারখানায়, তা হলে, মেশিনে হ্যাণ্ডেল লাগানো অবস্থায় উঠে দাঁড়িয়ে মাথায় আঘাত লাগিয়ে মাথা রক্তাক্ত করে ফেলতে পারবে। সেবাপরায়ণ হয়ে উঠবে নরেন।

'আপনাকে ত দেখছি, সারাক্ষণ কাজ করেন। একটু জিরোতেও দেখি না। সব সময় কাজ করতে ভাল লাগে আপনার?' নরেনের নিচু হওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে মিতা বিনিময়ের অপেক্ষায়।

এটাকে প্রশংসা মনে করে মুখ গুঁজেই একটু মুখে প্রসন্নতা তুলে আনল নরেন। কিন্তু মিতা তা চায় নি। মিতা চেয়েছিল· বিশ্রামের ভেতর তারা কথা বলুক।

নরেন নিজে জেগে ওঠে না, নরেনকে জাগাতে হয়, এটা মনে ভাবে মিতা। সাইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে বই বাঁধাইয়ের অতি ছোট কারখানার মালিক নরেন। কারখানাটাকে জাগিয়ে তোলার জন্যে প্রাণপাত করতে হয়। শখ আহ্লাদ বিশ্রাম করার মন যে থাকে না, তা নয়। ওগুলোকে যাপন করলে তার চলে না। তার যা কারখানা, মালিক একাই নিজে হাতে কাজ করে। তাকে পাবলি-শাররা কাজ দিতে ভরসা পায় না। পাবলিশারদের কত বই। ছাপা হয়ে যাবার পর বাঁধাইখানায় পাঠিয়ে দিয়ে, তাড়াতাড়ি ডেলিভারি চায়। তাড়াতাড়ি বই বেঁধে দেবার শ্রমিক-সঙ্গতিও নেই নরেনের। নেই তার পরিসর—স্থান সঙ্কুলানও হয় না। আবার বেশি বই বেঁধে দেবার পুঁজিও তার নেই। বোর্ড পুস্তানির কাগজ, শিরিষ, লেই, সুতো, মজুরি আগে খরচ করার সঙ্গতি তার নেই। পাবলিশারদের কাছে নির্ভরযোগ্যতা তৈরি করার কোনোই সঙ্গতি নেই। খুব ছোট পাবলিশারদের দুশো চারশো বই চেয়ে চিন্তে কম রেটে এনে কোনো রকমে বেঁধে দেয়। এইটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হয় কারখানাটাকে। আর

নিজস্ব পরিশ্রম দ্বিগুণ তিনগুণ করতে হয়। সেই পরিশ্রমের ফাঁকে ফাঁকে শখ আহ্লাদ অবসর বিশ্রামের আকুতি যে মনে আকাঙ্ক্ষায় খেলে বেড়ায় না, তা নয়। এই জায়গাটা নরেনের ধরতে চায় মিতা।

নরেন সমস্ত কোলাহল শখ আহ্লাদের জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখে কঠোর পরিশ্রম করে। ওখানে যে না-পাওয়ার দুঃখ আছে, সেই দুঃখকে ছুঁতে চায় নরেনের। নরেনের মন নরম, ধরা দিলেও দিতে পারে। অদ্ভুত টানে মিতাকে। নিকট সৌজন্যে যে মানুষ নীরব থাকে, শুধু নীরবতায় সবকিছু বোঝায় তাকে ব্যক্তিগতে টেনে আনতে অন্যের আগ্রহ আকুলতা কাজ দেয়।

সেলাইয়ের ভেতর মুখ নুয়ে যায় মিতার। মন ভার হয়ে ওঠে নরেনের বিচ্ছেদে। আজ কাজ হয়ে গেলে, কাল থেকে কাজ আর এখানে করতে পারবে না। এই অভিমান মিতাকে কাঁপায়, কিন্তু সেই অভিব্যক্তি, নিকট বিচ্ছেদকে ভুলে গিয়ে, এই ক্ষণিক সম্পর্ককে দীর্ঘতর স্বভাবে প্রকাশ করে মিতা। এই অভিমান বোঝালে বুঝবে নরেন। কিন্তু নরেনকে নিষ্ঠুর হতেই হয়। এই নিষ্ঠুরতা এত স্বাভাবিক যে অভিমানের কোনো স্থান নেই। তবে বিচ্ছেদের দুঃখ নিয়ে কথা বলবে কেন? সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার স্বরই দিতে চাইবে নরেন। নরেনকে নিষ্ঠুর হতে হয় বলে কি নরেনের মন নেই? সেই মনকে যতটা পারে জাগিয়ে তুলবে। নরেন জেগে উঠুক। মিতার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকুক।

মুখ তুলে দেখল নরেন জামা পরছে। জামা পরার ফাঁকে একবার দেখল মিতাকে।

নরেন চলে গেল। চলে যাবার দিকে তাকিয়ে রইল মিতা। নরেনকে এই তিনদিন টিফিন আনতে দেয় নি। টিফিনের সময় হোটেলে খেতে যায়। আজ আবার হোটেলে খেয়ে মার্কেট ঘুরে আসবে। যদিও বা আজ নরেনের কাছে শেষ দিন, নরেনের সঙ্গে থাকার সময় সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে, নরেন চলে যাওয়ায়।

সামনে সরু গলির পথ। দরজাটা বন্ধ করে দিতে চাইল মিতা। একা ঘরে আরো একা হতে চাইল। মাচা নেই যে একটু ব্যক্তিগত হয়ে উঠবে। জামা খুলে ফেলতে চাইবে। অন্তর্বাসের বাঁধুনিতে স্তনদুটি ব্যথা পায়। খোঁপা ভেঙে খোঁপা নতুন করে বাঁধতে পারে। শাড়ির গিঁটের আঁটে টান হয়ে শাড়ি কোমরে গেঁথে থাকে। শাড়ির পাড় কোমরে বসে যাওয়া দাগ থেকে একটু নামিয়ে দিতে বা তুলে দিতে পারে। নরেন থাকলে পারে না। এখন নরেন চলে যাবার পর মিতার মনে হয় দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

উঠে দাঁড়ায় মিতা। দরজার কাছে চলে আসে। নিঃশব্দে দরজাটা বন্ধ করেও দেয়। ঘরের ভেতর বাল্বের আলো ভরে আছে। হলুদ রঙা আলো। নরেনের ঘরে নিঃশব্দে একা দরজা বন্ধ করে দিয়ে অদ্ভুত শিহর বোধ হয় তার। নরেনের ঘরে অসামান্য এক অধিকার রচনা করে। ছোট কারখানায়, কর্মচারিরা এরকম অধিকার রচনা করতে পারে। কাজ যখন হয় না, দরজা বন্ধ করে

পারিবারিকতার স্বভাবে একটু শোয়, একটু ঘুমোয়, কাপড় বদলায়, সাজগোজ করে। মহিলা শ্রমিকরা পুরুষদের চেয়ে বেশি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কারখানাটাকে পারিবারিক স্বভাবে নেয়। তাদের শাড়ি বদলে নিতেই হয়। যে শাড়ি পরে আসে, সে শাড়ি পরে কাজ করে না তারা। অন্য একটা শাড়ি পরে। আর চুলে চিরুনি চালিয়ে নিতেই হয়। আর আয়নায় মুখটা একটু দেখতেই হয়। মালিকেরই আয়নায় চিরুনি নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে হয়। এসব দৃশ্য কারখানার স্বভাবে স্বাভাবিক। অসামান্য বধূবেশ পায় এই দৃশ্য। দৃশ্যটা মহিলাই তৈরি করে। শ্রমের প্রক্রিয়ার ভেতর এই দৃশ্য সম্পৃক্ত হয়ে যায়। অসামান্য বধূস্বভাব সংস্থাপন। এই মহিলারা ত সকলেই বিধবা। তারা এটাকে ধরতেই চায়। তারা এই দৃশ্যে থাকতেও চায়।

নরেন এটা পছন্দ না করলেও, এরকমটা ঘটবেই। গাণিতিক নিয়মে এটা ঘটবে। পরে আসা শাড়িটা দেয়ালের দড়িতে ঝুলিয়ে দেবে। দরজার পাশে চটিজোড়া রাখবে। ব্যাগটা দেয়ালের পেরেকে ঝুলিয়ে রাখবে। পরে আসা টিপটা কখনো কখনো ক্যালেণ্ডারে এঁটে রাখে, যাবার সময় পরে যায়। চুলের কাঁটা গার্ডার এখানে ওখানে কোথাও রাখে। অদ্ভুত গৃহপরিবেশ পায় ঘরটা। দাম্পত্য গন্ধে ভরে থাকে। মেয়েদের চুলে তেলের গন্ধে যে গৃহগন্ধ থাকে, তার গুড়োগুড়িতে এই ছোট ঘরটা ভরে থাকবে। নিকটের মায়ায় তারা সব থাকে। এটাও ত একরকম যাপন।

মিতা কি গৃহবেশী হয়ে ওঠে না? মিতার সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়াড টাই জীবন, সংসার। আগে মাজদের ঘরে ছিল, আজ নরেনের ঘরে, কাল থেকে হয়তো অন্য ঘরে থাকবে। যেখানেই যাক, একটা এমন ঘরের ভেতর গৃহী স্বভাবে আচরণ করতে পারবে।

ঘরের এখান থেকে ওখানে যায়। গুন গুন করে গেয়ে ওঠে। 'যাও রে ভ্রমর, ফুলের বনে থাক ভ্রমর, ফুলের মধু খাও।…' এ গানটা গুন গুন করে শোনাতে পারে মিতা। 'আমার কথা কণ্ঠে লইয়া বন্ধুর দেশে যাও'· গানটা বুক থেকে মুখে উঠে আসে সেই আর্তিতে। স্নিগ্ধ বুক-জড়ানো গান। 'যাও রে ভ্রমর যাও'··কণ্ঠে কথটা বার বার ফিরে আসে। মনটাকে ফুরফুরে করে রাখে। একটু নাচতে যেন ইচ্ছে করে মিতার। হাতে মুদ্রা তুললে, কোমর বাঁকে। পায়েও এক ছন্দ আসে। হৃদয় দোলে। ছোট পরিসর, বেশি জায়গা পায় না। তাই নরেনের আয়না ক্যালেণ্ডার দড়ির জামা গামছা চোখে দ্রুত নিকট হয়ে আসে। কাটিংমেশিনেও নরেনের গন্ধ। নরেনেরই সম্পদ। 'যাও রে বন্ধু যাও।' আবার এখান থেকে ওখানে যায়। নাচের ভঙ্গি আসে শরীরের মুদ্রায়। নিজের বুকেই নিজের গানের গুঞ্জন।

দরজা কে নাড়াচ্ছে। এগিয়ে যায় দরজার কাছে মিতা। দরজা খুলে দেখল অচেনা একজন দাঁড়িয়ে আছে।

'নরেন নেই ?'

'না।' দরজার একটা পাল্লা বাঁ-হাতে খুলে, ডান পাল্লায় গাল ঠেকিয়ে দাঁড়ায় মিতা।

'খেতে গেছে ?'

'মার্কেটে যাবে। দেরি হবে।'

লোকটা ফিরে যেতে ইতঃস্তত করছে দেখে মিতা বোঝে নরেনের ঘনিষ্ঠ কোনো জন। এই ওয়ার্ডেই থাকে নিশ্চয়। চেহারায় সেরকমই ছাপ।

'নরেনদা এলে কী নাম বলব ? আপনার নাম কি ?'

'বলবেন, একজন এসেছিল—বুধ্ধু ওস্তাগরের তিরিশ নম্বর ঘরের। এটা বললেই বুঝতে পারবে। নাম আমার বিমলকুমার সাহা। আপনাকে ত এ-ঘরে কখনো দেখি নি!'

'তিনদিন হল কাজ করছি।'

'আপনি কোথা থেকে আসেন ?'

'বারাসাত।'

'আগে কার ঘরে করতেন ?'

'মজিদের ঘরে।'

'চোদ্দর তিন ?'

মাথা হেলায় মিতা।

'মজিদের ঘরে ত কাজ থাকে—কাজ গেল ?'

'ছাড়িয়ে দিয়েছে—এক সপ্তা আসি নি। জ্বর হয়েছিল।'

'ওহ্।'

'ঘরে আসুন না'—ডান পাল্লাটা খুলে ধরে মিতা।

'না, আর কিছুটা পরে আসব।' ফস করে একটা বিড়ি ধরিয়ে ফেলে বিমল। মাঝবয়সি লোকটা। সবে বিড়ি ধরাল, দু-একটা টান দিয়ে তবে ফিরবে। 'নরেনের ঘরে কাজও ত নেই।'

'না, আগে হলে হয়ে যাবে।'

'কাজ ধরতেই বোধ হয় গেছে। আমরা দুজনে খুব বন্ধু। ও যদি দাঁড়াতে পারে—যাদবপুরে থাকি। রুলিঙে কাজ করি। যাই—' পেছন ফিরে সহসা চলে যায় বিমল।

দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে ঘরের ভেতর চলে আসে মিতা। দেয়ালের পেরেক ঝোলানো ব্যাগটার কাছে যায় মিতা। ব্যাগ থেকে টিফিন বাক্সটা বের করতে গিয়েও বের করল না। খেতে মন যাচ্ছে না। খিদে নেই। পরে খাওয়া যাবে। বুক থেকে আঁচল খসিয়ে জামার ভেতর অন্তর্বাসটা ঠিকঠাক করতে যেতে দরজায় শব্দ পেল। বিমল বোধ হয় কাজের কথা বলতে ভুলে গেছে। আবার ফিরে এসেছে। আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে দু-হাতের চেটোয় মুখটা মুছে

নেয়। দরজা খুলেই দেখে মতির মুখ। মতিকে দেখে বুকের ভেতর অসম্ভব চলকানি অনুভব করে মিতা। 'কী রে তুই এখানে?'

ভার হয়ে আছে মতির মুখ। 'তুমি এখানে আছ জানাও নি কেন? তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?'

মিতা হাসে।

'কি হল, কোথায় ছিলে বললে না যে?'

আবার হাসে মিতা। 'তুই ঘরে আয় ত।'

মতি ঘরে ঢোকে। অস্থিরতায় ঘরে ঢুকতে গিয়ে দরজায় শব্দ তোলে মতি।

তাঁত ঠেলে দিয়ে অন্য তাঁতেতে বসে মিতা।

'মজিদের কারখানার চাকরি ত গেল, তুমি একা কাজ কর কি করে?'

'একাই কাজ ধরি, আজই কাজ শেষ এখানে। আর কাজ থাকলে ত করব। তুই এখন কোথায় কাজ করছিস?'

'নয়ের আটে মকবুলের ঘরে। আট টাকা রোজ দেয়—সিনেমা দেখবে আজ?'

'না।' দ্রুত নির্দয় রকম না করে ওঠে মিতা।

মতির অভিমান হয়। এই মুহূর্তের ফাঁকটাকে ভরাতে উঠে গিয়ে কাজে বসে যায় মিতা। ছুঁচ সুতো ফর্মা তুলে নেয়। 'হাতের কাজগুলো শেষ করতে হবে।'

'এতক্ষণ ত বসেছিলে!'

'তবে সব সময় বসে থাকব নাকি?'

'বেশ, কাজ কর।'

মিতা মুখ তোলে।' তুই এখানে বসে থাকবি নাকি?'

'কেন, তোমার অসুবিধে হয়?'

'না, আমার অসুবিধে কেন হবে? মালিক আসল বলে। চেনা জানা নেই তেমন মালিকের সঙ্গে।'

'তবে চলে যাব বলছ?'

'তা বলছি না, তোর কি এখন কোনো কাজ নেই!'

'কাজ থাকলেও তোমার কাছে বসতাম। সিনেমা যাবে কিনা বললে না?'

'যাব না ত বললাম।' ঝাঁঝিয়ে ওঠে মিতা।

'এত রেগে যাচ্ছ কেন? দুবার ত বললে, দশবার ত বল নি।' লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায় মতি। রাগ অভিমানে ফেটে পড়ে। 'তুমি আমাকে কষ্ট দিতে চাও। আমি তোমাকে দেখতে না পেলে বাঁচব না।'

মিতা চুপ হয়ে যায়। সে কোনো কথা বলতে পারে না। মতিকে নিয়ে তার সমস্যা হয়েছে। মতি তাকে প্রেমিকার মত পেতে চায়, অথচ মতির সে পরিণত মন নেই। মতি কি জানে না, তার সঙ্গে যেটুকু আচরণ করেছে, তা

মনের বিকার ছাড়া কিছু নয় ? মতি তুমি বোঝো, আরো বড় হও।

মতি দরজায় শব্দ করে বেরিয়ে গেল। তার ফিরে যাবার পথের ধারে হয়তো অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকবে। মিতার ঘুম ধরে। কাল সারারাত ঘুময় নি, চোখ ঢুলে আসে। চোখ কচলে নেয়। নিজের মনে একটু শান্ত হতে চায়। মন যেমন প্রেমার্ততায় আছে, তাতে মন ভাল থাকে। মনের গতি বাড়ে তাতে আরো। গুন গুন গান গেয়ে ওঠে। 'যাও রে বন্ধু যাও, ফুলের বনে থাকো ভ্রমর, ফুলের মধু খাও' গানটা আজ তাকে পেয়েছে। গানের সুর আর কথা তার মনকে নিয়ে খেলে। মুখে একটু জল দিতে হবে। জল খেতেও হবে। উঠে গিয়ে কলসির কাছে যায় মিতা। এক গেলাস জল নিয়ে দরজার বাইরে গলিতে বেরিয়ে আসে। মুখে জল দেবার মুখে থমকে যায় মিতা। নরেন গলির মুখটায় একটা রিকসা থেকে ফর্মা নামাচ্ছে। এক রিকসা ফর্মা। মন নেচে ওঠে। তার মানে নরেন কাজ ধরেছে। নরেনের ঘরে কাজ পাবে। নরেনের সঙ্গ পাবে। নরেনের সঙ্গে সম্পর্কের সম্ভাবনা খুঁজে পায় মিতা। মুখে জল দিয়ে ফিরে যায় ঘরে মিতা। এক গেলাস জল গড়িয়ে ঢোক দিয়ে দিয়ে খায়। অপূর্ব জলের স্বাদ পায় : শরীরের ভেতর তৃপ্তি সঞ্চারিত হয়। মনে মনে গোপনে হেসে ফেলে।

কোমরে আঁচল জড়িয়ে গলিতে বেরিয়ে আসে মিতা।

নরেন আঁকড় করে ফর্মা নিয়ে আসছে। নরেনের হাত থেকে ফর্মা নিয়ে নেয়। ঘরের ভেতর ফর্মা এনে ফেলে। তক্তি নড়ে যায়, কেঁপে যায়। ক্যালেন্ডার ওড়ে। ফর্মা নিয়ে এগিয়ে আসে নরেন। তার হাত থেকে ফর্মা তুলে নেবার অধিকার সে তৈরি করে, তার শরীরের ভঙ্গিতে, মানসিকতায়।

ফর্মায় ফর্মায় ঘর ভরে ওঠে। ফর্মার ওপর বসে পড়ে পা দোলাতে শুরু করে মিতা। তা হাজার বই, চোদ্দ ফর্মার। 'কাজ আনবেন, একবারও ত বললেন না।'

'কাজ যে পাব, আমি কি জানতাম ছাই ! পার্টির বাড়ি গেলাম, হাতে হাতে চালান দিল, প্রেসে গেলাম সেই গোয়াবাগানে।' নরেনের কথায় স্বতঃস্ফূর্ত এক আন্তরিকতা ফুটে উঠেছে। স্বভাবতই এতগুলো কাজ পাবার আনন্দের প্রতিক্রিয়া তার চোখে-মুখে ফুটে থাকবেই। আর শ্রমসঙ্গে একটা সংযোগ থাকেই। সেখানে কোনো বানানো চলে না। মনের ভাব যা, তা সত্যি হয়ে প্রকাশ হয়। তিনদিন একসঙ্গে কাজ করুক, আর তিনশো দিন করুক, শ্রম-সঙ্গের সম্পর্ক এক মুহূর্তেই যথেষ্ট আন্তরিক হয়ে উঠতে পারে। প্রেম ত অন্য জিনিশ। এ সম্পর্কে প্রেমের সম্ভাবনা থাকে না যে তা নয়।

'ভাবলাম আজকেই আপনার ঘরে শেষ।' পা দোলায় মিতা অদ্ভুত চটুল ভঙ্গিতে।

এই চটুলতা, কাজের নির্ভরতা প্রকাশ করে বলে, নরেন অন্য ভাবে নিতে

জানে না। আর নরেন কাজ পেয়ে কম খুশি নয়। এই খুশির সঙ্গী পেয়ে যেতে তার ভালও লাগছে। আবার মিতাকে কদিন কাজ দিতে পারবে, এই রোজগারের নিশ্চয়তার সে মালিক, আত্মপ্রসাদ পায় সে।

'আপনার খোঁজে কে একজন এসেছিল। রুলিঙের কাজ করে।'

'বিমল ?'

'হ্যাঁ, ওরকম নাম বলল।'

'আপনি খেয়েছেন ?'

'না। খিদে নেই। আমার টিফিন খাবেন ?'

'না। আমি খেয়েছি।'

'এখনই কাজে বসে যাবেন নাকি ?'

নরেন জামা খোলে। পাশ ফিরে মিতাকে দেখে।

'কাজে ত বসতেই হবে।'

'একটু জিরোবেন না ?'

'জিরোলে চলবে ? আমাদের জিরোবার জীবন ?' জামা প্যান্ট খোলে নরেন। লুঙ্গিটা পরে নেয়। মিতার কথা তার ভাল লাগে। বেশ আন্তরিক মেয়েটি। এই তিন দিন তার কাছে কাজ করছে। কথার ধরন মিতার ভালই। বয়সও বেশি নয়। বিধবা নাকি ? বেশি দিন বিধবা হয় নি, মনে হয়। তা যাক, তার কাজ থাকলে কাজ করবে। বিধবা সধবা এই ভেদ নিয়ে কী করবে সে ? বাঁধাইখানার উন্নতি তাকে তার মনকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রাখে। সকাল থেকে রাত আটটা-নটা পর্যন্ত কারখানাতেই সময় চলে যায়। অন্য কথা ভাববার সময় কোথায় ?

কাজে বসে যায় নরেন।

ফর্মা থেকে নেমে পড়ে মিতা। তক্তি ডিঙিয়ে নিজের জায়গায় যেতে গিয়ে সত্যি সত্যি টলে যেত, নরেনের পিঠ ধরে সামলে নেয়। এ-রকম ঘটনায়, প্রতিক্রিয়ায় উচ্ছল হতে পারল না মিতা। নরেনও তেমন মুখ গুঁজে কাজ করছে। মিতা বরং আরো নীরব হয়ে উঠল। সেলাইয়ে বসে। একটার পর একটা ফর্মা সেলাই করতে থাকে। এমন পাথর নীরবতা যেন তার অনেক কথা। নীরবতা তার অনেক কথাও নিয়ে যায়, সে নিয়ে যায় না, পরিস্থিতি নিয়ে যায়। এই নীরবতা অনেকক্ষণ পর্যন্ত ধরে রাখতে চায় মিতা। নরেন এই নীরবতার অর্থ তৈরি করুক। নরেন অনেক কথা জানে। পরিণত মন অনেক কথা জানে। কথার নানা অর্থ খুঁজতে পারে। মিতার মুখ নেমে আসে ফর্মার ওপর। চোখ দুটি গড়াগড়ি খায় ফর্মার ওপর। একটা ঘরে দুজন থাকলে, তাদের কোনো কথা না থাকলে, তারা কোনো কথাই বলতে পারে না। আবার বিস্তর কথা থাকলে, কথা বলে বলে শেষ করা যায় না। তাদের কথা বলায় কোনো বাধা আসে না। তাদের কথা নেই বলে তারা নীরবতা তৈরি করে।

নীরবতার ভেতর যদি কোনো বিনিময় নিহিত থাকে, তা হলেও এই নীরবতার একটা অর্থ হয়। সেই অর্থের রচয়িতা হতে চায় মিতা। নরেনকে মুখ তুলে অনেক দেখার ইচ্ছা নীরবতার বিনিময়ে মিশিয়ে দেয়। এই নীরবতার বিনিময়কে পরিপুষ্ট করতে চায়। মনে মনেই গান গায়, গুন গুন করে। শব্দ করে গেয়ে ওঠে না। নরেনের শোনাব কান থাকলে নীরবতার গানই শুনতে পারে। ছোট ঘব, নিশ্বাস, প্রশ্বাসের শব্দ পাওয়া যায়। শরীরের ভঙ্গিতে মনের গড়ন থাকে। নিশ্বাস-প্রশ্বাসেও থাকে। বেশ কাছাকাছিই তারা বসে থাকে। নরেন এত ছোট কারখানার মালিক যে আলাদা রকম দূরত্ব বোধ করা যায় না। সে দূরত্ব বরং খাপছাড়া লাগবে। নরেনকে তার ভাল লাগে। নরেনের আর কিছু জানে না। নরেনের স্বভাব মন ও চেহারা দেখেই নরেনকে তার ভাল লাগে। ভালবাসে। নরেনের দিকে তাকিয়ে দেখার লোভ হয়, দেখে না। মনের দেখা দিয়েই অবিরত নরেনকে দেখে। 'যাও রে, ভ্রমর যাও, ফুলের বনে থাকো ভ্রমর, ফুলের মধু খাও ·' গুন গুন করে গেয়ে ওঠে।

পুস্তানির কাগজ বইয়ের কভার বোর্ডের সঙ্গে সাঁটছে নরেন। পাতলা লেই হাতের চেটোয় নিয়ে পুস্তানির পিঠে মাখিয়ে কভার চেপে দিচ্ছে। একটার পর একটা বই সাজিয়েছে।

মুখ ফেরায় নরেন মিতার দিকে 'একটু দাঁড়িয়ে পা দিয়ে চাপ দেবেন দিদি ?'

মিতা মুখ ফেরায় একঝলক হাসিমুখে। 'দাঁড়াতে হবে বইয়ের ওপর ? পড়ে যাই যদি ?'

'পড়বেন কেন ? দেয়াল ধরে দাঁড়াবেন।'

'বেশ দাঁড়াচ্ছি, পড়ে গেলে কিছু বলতে পারবেন না।' উঠে দাঁড়ায় মিতা। লাফিয়ে এদিকে চলে আসে।

মিতার চলে আসাটা তাকিয়ে দেখে নরেন।

মিতা বইযের ওপর উঠে দাঁড়ায়। 'পড়লে কিন্তু আপনার ঘাড়ে পড়ব।'

নরেন হাসে।

'হাসছেন যে বড়, গাছে চড়িয়ে দিয়ে ?'

'আপনাকে গাছে চড়ালাম বুঝি ?

'তা নয় ত কি ? ছোটবেলায় আমি খুব গাছে চড়তাম। অভ্যাস আছে।'

'তা হলে পড়বেন কেন ?'

নরেনের মুখের কাছে মিতার আঁচল ঝোলে। আঁচলে মিতার গায়ের গন্ধ লেগে আছে। সে গন্ধ পায় নরেন। আজ বয়টা নেই, এ কাজটা বয়ই করে। বইয়ে দাঁড়াতে বলল, আর মিতা দাঁড়াল, এতে অবাকই হয় নরেন। সেলাইয়ের মেয়েরা কেউ এমন অন্য কাজে যোগ দেয় না খুব একটা। মিতার মনটা ভাল। দেখতেও বেশ। বেশি বয়সও নয়। উচ্ছল। এ মুহূর্তে মনে হয়, মিতার সঙ্গ তার ভাল লেগেছে। তারও ত ভাল লাগা বোধ আছে ? সে মুখচোরা

বলে কি তার ভাল লাগতে নেই? বরং সে এই ভাললাগাটা প্রকাশ করতে পারবে না। বরং সে চাইবে মিতা তার ঘরে কাজ করুক। মিতারও বোধ হয় দারিদ্র্যজীবন। তার কাছে কাজ পেয়ে বাঁচবে। বাড়িতে কে আছে কে জানে! অত জানাজানি নিয়ে কী করবে নরেন? কারখানাটাকে তুলে ধরার চেষ্টায় দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়ছে। সময় হারিয়ে যায়। মন একভাবেই কাটে। উন্নতি করতে হবে। তার বউ আর তিন বছরের মেয়ে আছে। সংসারে খুব যে খরচ করে তা নয়। বেশি খরচ করার উপায়ও নেই। ছ-মাস হল এই কারখানাটা নিয়েছে। একাই কাজ ধরে কাজ করত। মাঝে দরকার হলে সেলাইয়ের লোক নেয়। অনেক সময় কাজের অভাবে কারখানা বন্ধ রাখতে হয়। কারখানা খুলে রাখে, কিন্তু কাজ হয় না। ছ-মাস আগেও বাঁধাই কারখানার কারিগরের কাজ করতো। বিমল ঘরখানার সন্ধান দেয়। দু—হাজার টাকা সেলামি দিয়ে পঞ্চাশ টাকা ভাড়ায় ঘরটা পেয়ে যায়। ইলেকট্রিক লাগে আরো তিরিশ টাকা।

বাক্লেশে দিন কাটে। ভাল পার্টির কাজ ধরতে পারে না। ভাল পার্টির কাজ করার সঙ্গতিও নেই তার। মালিক হয়েছে, মালিকানার স্বাদ কিছুই বুঝল না।

'এবার নেমে পড়ুন, হয়েছে।'

নেমে পড়ে মিতা। নিজের কাজের কাছে চলে যায়।

লোকটা এক মনে কাজ করেই চলেছে। লোকটা নিশ্চয় পাগল! কাজ-পাগল। কত সময় হল খেয়াল নেই নরেনের। মিতা জানে, তার বেরিয়ে যাবার সময় হয়েছে। ঘণ্টাখানেক হল ছুটির সময় পেরিয়ে গেছে। মিতাও কাজ করছে বসে বসে। সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে নির্ধারিত সময়ের পরেও প্রায় সব শ্রমিকরাই কাজ করে আটটা পর্যন্ত। মেয়েরা করে না। কারণ মেয়েরা প্রধানত মেয়েমানুষ, তাকে বেশি রাত করে বাড়ি ফিরতে নেই। আর মেয়েমানুষরা প্রায় সকলেই বিধবা। আর যারা কাজ করে, পরিশ্রমের উপযুক্ত বলেই, এবং তাদের যৌবন আছে। তারা জোয়ান মেয়েমানুষ। তাদের দেওর শ্বশুর ভাসুর তাদের ফেরার দিকে তাকিয়ে থাকে! ফিরলে আশ্বস্ত হয়। ফিরতে হয়ই তাদের। না ফিরলে কেলেঙ্কারি হয়। কেলেঙ্কারি দৈনন্দিন নয়। প্রতিদিনের ফেরাটা তাই ঘটে যেতে হয়। একাকিত্বের রাতে তাদের ফিরে যেতে হয়। যে সংসারে তারা ফিরে যায়, ভাসুর দেওরের সংসার আছে। তাদের জীবনের যে ছন্দ, তাদের সংসার যথাস্থিত ছন্দে থাকে, তাদের দশ-বারো ঘণ্টা দূরে থাকায়। তবু তাদের একাকিত্বের রাত যাপন করার জন্যে ফিরে আসার আশ্বস্ততা তারা পায় কেন? ফিরে যেতেই হয়। ফিরে না গিয়ে উপায় থাকে না বলে।

কাজপাগল লোকটার কোনো দিশে নেই।

ওপরে হাত দুটো তুলে ধরে জোরে হাই তোলে মিতা।

চমকে ফিরে তাকায় নরেন। হাতের ঘড়ি দেখে।

'এখনো যান নি আপনি ?'

'কাল থেকে ত তাড়াচ্ছিলেন। আজ না-হয় একটু বেশি কাজ করলাম।'

'কটার ট্রেন ধরেন ?'

'সে এক-ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে।'

'আমারও খেয়াল হয় নি।'

'এত কাজ করলে শরীর টিকবে কদিন ?'

'টাকা নেবেন ত ?'

'পার্টির কাজ তুলুন ত, এখন আমাকে টাকা দিতে হবে না।'

'কাল কখন আসছেন ?' বাড়তি আগ্রহ প্রকাশ করে ফেলে নরেন।

'সকাল আটটায় এলে খুশি হবেন ?'

'আপনি পারলে আটটায় আসবেন। আমি আটটায় চলে আসি।'

'বেশ। আর কিন্তু বেশিক্ষণ থাকবেন না।'

মিতা উঠে দাঁড়িয়ে আঁচলটা খুলে কাটিং মেসিনে জড়িয়ে, আঁচলের আড়াল তৈরি করে শাড়ি বদলায়। গান গায় গুন গুন।

নরেন তাকাতে পারে না। তাকাবার লোভ হয় নরেনের। মিতা খুব ভাল মেয়ে। এমন ভাবে কেউ কথা বলে না। এমন ব্যবহার কেউ করে না। মনের ভেতর মৃদু কম্পন অনুভব করে নরেন। একটু ভাবতে চাইল নরেন। একটু ভাললাগা বোধ হল তার। নরেনের ঘর আছে, সংসার আছে। বউ মেয়ে।

বেরিয়ে আসে মিতা। ঘোর সন্ধ্যা নেমেছে সাইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে। গলিতে চলতে শুরু করে। সামনে তাকাতে চমকে ওঠে মিতা। গলির মুখটায় দাঁড়িয়ে আছে মতি।

মতির সামনে এসে শ্লথ থেমে যায় মিতা।' তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস ?'

'তুমি এতক্ষণ ওখানে ছিলে ?'

'কাজ করছিলাম।'

'তোমার জন্যে এক-ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছি।'

'কেন ?'

'তোমার জন্যে দাঁড়াব না ?'

মিতা এর উত্তর জানে না। কিছুক্ষণ নীরবে মতিকে দেখে মিতা। মতি ভাল, মতির এই স্বভাব তার ভাল লাগছে না।' তুই যে বললি, তুই সিনেমা যাবি ?'

'তুমি না সিনেমায় গেলে আমি কখনো সিনেমায় যাব না।'

'বেশ না যাস।'

'তুমি এত আমাকে রাগাচ্ছ কেন ?'

'রাগলাম কখন ?

'তুমি আমার সাথে ভালভাবে কথা বলছ না।'

'মতি, তুই আমাকে বকাস না, আমি বাড়ি যাব।'

মতি গুম মেরে যায়। মুখ নিচু করে রাখে।

'কি হল রাগ করেছিস?' কাঁধে হাত রাখে মিতা। 'আমার ওপর রাগ করতে নেই। আমি তোর কেউ নই। আমার জন্যে তোর কোনো দুঃখ হতে নেই। আমি একজন দুঃখী মানুষ। তুই ভাল থাক মতি।'

মতি কোনো কথা বলে না। রাগে ফোঁস ফোঁস করে। জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে। মতির পিঠে হাত বোলায় মিতা। তাতে মতির ফোঁসফোঁসানি আরো বাড়ে।

'তুমি আমার সাথে যেতে চাইছ না কেন?'

'সিনেমা দেখতে যদি আমার ভাল না লাগে, আমি যাব কেন?'

'সিনেমা ত আগে দেখতে, তখন ত খারাপ লাগত না!'

'আমার এসব কথা একদম ভাল লাগছে না মতি, আমাকে বাড়ি যেতে দে।'

'যাও না, তোমাকে কে ধরে রেখেছে!'

পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায় মিতা।

ঝটিতি মিতার দিকে ঘাড় ফেরায় মতি 'আমাকে ত তুমি কষ্ট দিতেই চাও আমি জানি, তুমি আমাকে কষ্ট দাও।'

মিতা নির্মমভাবে চলতে শুরু করে। একবারও পেছন ফেরে না।

সেই নিষ্ঠুরতার দিকে মতি তাকিয়ে থাকে। একবারও মিতাদি তার দিকে তাকাল না।

মতির বড় কষ্ট। ঘোষপাড়ার সতীমার মেলায় হারিয়ে যাবার পর, স্টেশনে রঙে রঙিন হওয়া মিতাকে দেখে মতির মনে হয়েছিল তার সঙ্গে কেমন দূরত্ব গড়ে তুলেছে মিতাদি। চাহনিতে সেই স্বভাব ছিল। কিন্তু যত অবহেলা পেয়েছে, ততই কষ্ট পেয়েছে মতি। মজিদের কারখানায় আর কাজ করে নি। কে জানে, মজিদের কারখানায় কেন কাজ করল না। মতি ভেবে নেয় তার সঙ্গ এড়াতেই বুঝি মিতাদি মজিদের কারখানা ছাড়ল। কারখানা ছাড়া অন্য কারখানা ধরা এখানে যারা কাজ করে তাদের জীবিকার এটা নিয়ম। সেও লক্ষ্মী সাহার কারখানা ছেড়ে মকবুলের কারখানায় কাজ করছে। তবু কেন জানি মনে হয়, তাকে এড়াবার জন্যেই মিতা কারখানা ছেড়েছে। কারখানা ছাড়াতে তার কিছু মনে হত না, এড়াচ্ছে বলেই এটা মনে হয় মতির।

মতি ঘুমের ভেতর যত স্বপ্ন দেখে, মিতাকে নিয়ে। মিতার সঙ্গে শুয়ে আছে এক বিছানায়। মিতাদি তার বউ হয়ে ওঠে। মিতাদি তাকে ভালবাসে স্বপ্নে। স্বপ্নের ভেতর ধরা দেয়। মতি মরে যায় এ ভাবনায়। আর সেই মিতাদি তাকে এড়িয়ে চলছে। এ সহ্য যায় না, অসহ্য।

বেলা দশটার সময় কাজ থেকে বেরিয়ে এসে নরেনের কারখানায় মুখ বাড়িয়ে দেখে মিতাদি হাসিমুখে নরেনের সঙ্গে কথা বলছে। মতির গা জ্বলে যায়। অথচ মিতাদি বলেছিল, কালই এ কারখানায় কাজ তার শেষ হয়ে যাচ্ছে। এড়াতে চেয়েছে। যাতে তাকে খুঁজে না পায় মতি। এ-রকম ব্যবহার করছে কেন মিতাদি ? মিতাদি কি জানে না, তাকে মতি কত ভালবাসে ? অসহ্য অসহ্য, মিতাদি লোকটার সঙ্গে হেসে কথা বলছে, অসহ্য লাগছে।

ফিরে যেতে থাকে মতি। সহসা বৃষ্টি আসে। মতি বৃষ্টিতে ভিজে যায়। বৃষ্টির আঘাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যেও কোনো ঘরে অথবা ছাউনির তলায় যায় না মতি। জামা প্যান্ট সারা শরীর তার ভিজে গেছে।

আরো একটু যাবার পর শীতে কাঁপে মতি। একটা দোকানে উঠে যায়। দোকানের আগুন ঘেঁষে দাঁড়ায়। গনগনে কয়লার উনুন। ধিকি ধিকি চারপাশ ব্যেপে আছে চকচকে আগুন। বড় দুঃখ মতির। আগুনের দিকে অপলক তাকিয়ে দুঃখ সহ্য করে মতি। মিতাদিকে হয়তো ভুল বুঝেছে। মিতাদি হয়তো পরীক্ষা করছে। মিতাদিকে কত ভালবাসে, এটা যেন সে পরীক্ষা নিচ্ছে। মিতাদির সঙ্গ ভুলতে পারছে না মতি। মিতাদির প্রেমে পড়েছে মতি। সে কষ্ট পাক পাক, কিন্তু মিতাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না সে। অসম্ভব। কান্না পায় মতির। মতি কাঁদে। উনুনের আগুনের সামনে অশ্রুপাত করে।

অশ্রুর কে হিসেব-নিকেশ করে ? এই সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডের ? বিধবা আর অনাথ শিশুর অশ্রু কত শত। মালিন্য ও দারিদ্র্যে অশ্রু নীরবে বয়। মতি মাতৃক্রোড়ের স্মৃতি ভুলে গেছে। ভাইবোনদের সঙ্গে থাকার কোনো সুখ পায় নি। শিশু অবস্থায় সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে এসেছে। এখানেই বেড়ে উঠেছে। মালিকের চোখ রাঙানিতে, বয়সের তুলনায়, শরীরের সহনীয়তার তুলনায় কঠোর পরিশ্রম করেছে, দুটি খেতে পেয়ে বেঁচে ওঠার জন্যে। দুটি খেয়ে বেঁচে উঠে কষ্ট ত যায় না !

দপ্তরিপাড়ায় বই হয়, খাতা হয়। বই সভ্যতার প্রয়োজনে লাগে। মানুষের মেধায় লাগে। চৈতন্যের সহায়ক হয়। জ্ঞান, শিক্ষা, বুদ্ধি-উপলব্ধিতে বই লাগে। খাতায় নতুন বুদ্ধি উপলব্ধির আখর থাকে। বুদ্ধি উপলব্ধি পরিপুষ্ট করতে লাগে। অথচ এখানে সত্তর শতাংশ মানুষ আখর চেনে না। অফিস আদালত শাসন প্রশাসন চলে এই খাতাপত্তরে।

আগুনের সামনে চেয়ে নীরব অশ্রুপাত করে মতি। চোখের জলে আগুন ঝাপসা হয়ে যায়। বড় আত্মঅভিমানী হতে হয় তাকে। আত্মহত্যার কথা ভাবতে হয় তাকে। বড় মরণের কথা মনে হয়।

নরেনের মুখে হাসি লেগেই ছিল।

মিতা মুখ গুঁজে ফর্মার ওপর হাসছিল।

কথায় কথায় হাসি। কথার কৌতুকের ভেতর হাসি উঠে এল। সেই হাসির ভেতর দরজার সামনে বিমল এসে দাঁড়াল। নরেন মুখ তুলে দেখতে পায়। 'আয় আয়, কী খবর?'

'খবর ভাল। আরেব্বাস অনেক কাজ পেয়েছিস যে।'

দরজা পেরিয়ে এসে দাঁড়াল বিমল।

'ফর্মার ওপর বোস দিকি।' নরেন কাজের ভেতর বন্দ হয়ে আছে।

বিমল ফর্মার পাঁজার ওপর বসে 'বৌদির খবর কি? তোর মেয়ে কেমন আছে?'

'ঐ রকমই। যেমন থাকে, তেমনই আছে। রাতে ফিরি যখন সকলেই ঘুমিয়ে থাকে। রাতে ফেরার পর শ্যামলী অবশ্য জেগে ওঠে।'

'দিদি হাসলেন?' বিমল মিতার দিকে তাকিয়ে বলে।

'দাদার কথা ভেবে হাসলাম। দাদা যখন বাড়ি ফেরেন বৌদি তখন ঘুমিয়ে থাকেন—ঘুম ভাঙার পর তারপর যে বৌদি কতক্ষণ জেগে থাকেন, সে কথা ত বললেন না দাদা!' গা দুলিয়ে দুলিয়ে কথাটা বলে মিতা।

নরেন একটু অবসর পেয়ে যায়। 'খেয়েই ত আমি নিজেই ঘুমিয়ে যাই।'

মিতা 'ও তাই নাকি, আপনার এত ঘুম? কই একবারও ত এখানে ঘুমাতে দেখলাম না!'

'এখানে ঘুমোবার সময় কোথা।' বিমলের দিকে তাকিয়ে 'চা খাবি ত?'

'না থাক, কাজ ছেড়ে উঠতে হবে না।' বিমল নরেনকে থামায়।

মিতা উঠে দাঁড়ায়। নরেনের দিকে হাত বাড়ায় 'গেলাসটা দিন ত?'

নরেন 'সে কি, আপনি চা আনতে যাবেন নাকি?'

'কেন গেলে দোষ হয়? মহাভারত অশুদ্ধ হয়?'

'কেন, আমার অতিথি এসেছে, আমিই যাব।'

'বাজে বাজে বকবেন না ত।' বিমলকে পাশ কাটিয়ে গলিতে বেরিয়ে আসে মিতা।

পিঠের দিকে আঁচলাটা খসে যাচ্ছিল, সেটা সামলে নেয় মিতা, এবং নিজেকেও। নরেনের বউ বাচ্চা আছে। থাকতেই পারে, দোষ কী? নরেনকে যে ভালবাসতে চায় মিতা। তাতে কি অসুবিধে হয় মিতার? তবে কেন দুলে ওঠে মন মিতার। সুবিধে অসুবিধে কিছু বুঝি না। নরেনকে তার ভাল লাগে, সে নরেনকে ভালবাসছে। তার বউ থাকুক, বাচ্চা থাকুক, ভালবাসতে বাধা নেই। নরেন সুন্দর, অপূর্ব। নরেন ভাল বলে তার বউ-বাচ্চা ভাল থাকে। নরেনের বউ-বাচ্চার ভাল থাকায় ত বাধ সাধছে না মিতা। সে বাধ সাধার কে? নরেন ঠিকা কর্মচারী ত বৈ কিছু নয়। নরেন তাকে ভালবাসুক, এতে অপরাধ কোথায় নরেনের? নরেন ত ভালমানুষ, ভালবাসলেই পারে। তাতে সে আর

ভালই থেকে যায়। তা হলে ভালবাসে না কেন? ভালবাসার ত সময় চলে যাচ্ছে না নরেনের।

নরেন ব্যবসা দাঁড় করাতে চায়। এতে নরেনকে সাহায্য করতে পারে মিতা। দশ-বারো ঘণ্টা খেটে ঠেকা দিলে, পরামর্শ দিলে নরেন তার ব্যবসা দাঁড় করাতে পারে। পার্টির কাছে প্রিয়পাত্র হতে হবে নরেনকে। পার্টির কাছে বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠতে হবে নরেনকে। নরেন একা কি পারে এই সব? কারখানা বন্ধ রেখে এক পার্টির বাড়ি গেলে, অন্য পার্টি কারখানা বন্ধ দেখে ফিরে যায়। বিশ্বাসযোগ্যতা হারায় পার্টির কাছে। মিতা থাকলে এদিকটা সামলাতে পারবে। মিতার মজুরির হিশেব কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিলে, নরেন টাকা পয়সার অভাবে ব্যবসায় মার খাবে। দরকার কী? কিছুদিন নরেনের কাছ থেকে পয়সা না-ই নিল।

নিশ্বাসে প্রশ্বাসে বাঁচতে চায় মিতা। মিতা খুশি থাকতে চায়, সুখী থাকতে চায়। মিতা নিশ্বাস প্রশ্বাসে বাঁচে না। খুশি থাকে না, সুখী থাকে না! রাস্তায় জনস্রোত কোলাহল, মন্থর যানবাহনের চলাফেরা। কদিন ধরে মেঘ গুমরে আছে। বৃষ্টির ভারে নেমে আসতে চায়। আর এই গভীর রাতে বিছানায় উঠে বসতে, ছোট চিমনির ঢেলা আলোয় নরম মেয়েমানুষ হয়ে ওঠা নিজেকে টের পায় মিতা। এবং কেমন শান্তমনা, ধীর, নীরব। একটু বেশি আলো চেয়েছিল। চিমনির কল ঘুরিয়ে আলো ডাগর করে নিজেকে দেখতে চেয়েছিল। বৃষ্টির শব্দ শুনেছিল। অনেকক্ষণ জেগে বসে তার ভাল লাগছিল। বাতাসে গাছে গাছে বৃষ্টির উন্মাদনা। একা ঘরে খিলবেড়ায় সে শব্দের প্রাণ সে ছুঁতে চেয়েছিল। প্রাণের আরামের কাছে তার অনেক কথা ছিল। অনেক! অনেক! শব্দ করে নিরবচ্ছিন্ন সে বৃষ্টিপাত পরিবেশ দেয়।

আঁচলে জড়িয়ে আনা গরম গেলাসটা মেঝেতে বসায় মিতা। সে ওদের দিকে তাকাল না। ওরা ওকে দেখুক, এটা সে তৈরি করে, সুযোগটাও দেয়। ঘন নিবিড়তায় ছোট ভাঁড়ে চা ঢেলে আগে বিমলকে বাড়িয়ে দেয়। তারপর নরেনকে দেয়।

তারপর তেমনই খাটো নিঃশব্দতায় তক্তি পেরিয়ে নিজের কাজের জায়গায় গিয়ে বসে পড়ে। কারো দিকে না তাকিয়ে নিজের মধ্যে নিজে নিবিড় আছে, এরকম দৃশ্য সে তৈরি করে। যেন সে একজন, উচ্চারণ না দিয়েই, একজন, প্রকাশ করতে চায়। যদি সে হাতের কাছে আয়না পেত, পেছনের দিকে মুখ আড়াল করে, ব্যক্তিগতের নিভৃত প্রকাশ দিয়ে নিজেকে প্রতীয় করতে পারত। এই নৈঃশব্দের প্রকাশ সে চাইছিল। নৈঃশব্দকে উচ্চকিত করতে চাইছিল। বরং সে খোপা ভেঙে খোপা বাঁধতে পারে। খোপা ভেঙে খোপা বাঁধতে তার ভালও লাগে। সে চায়ও খোপা ভেঙে ফেলে খোপা বাঁধতে। খোপা ভাঙলে পিঠে চুল ছড়িয়ে পড়ে। সেটা একটা দৃশ্য হয়। আর এই দৃশ্যের দৃষ্টি-

নন্দন এক সহসা আছে। আবার সেই নন্দিত দৃশ্যের ভেতর থেকে, দু হাত পেছনের দিকে নিয়ে গিয়ে খোপা বাঁধার আর-এক দৃষ্টিগ্রাহ্যতা।

'চলি।' উঠে দাঁড়ায় আর চলে যায় বিমল।

মিতা হাসল।

নরেন বলল 'হাসলেন যে?'

'হাসলাম।'

'কেন হাসলেন?'

'বাঃ, সব কথা বলা যায় নাকি! আপনার থেকে বয়সে বড উনি, এটা ভেবে হাসলাম।' তারপর কিছুক্ষণ নিচু হয়ে হাসামুখে থেকে বলে মিতা 'আমাকে আপনি বলবেন না আর। তুমি বলবেন, মিতা নাম ধরে ডাকবেন। আপনি আমার চেয়ে বয়সে বড়। কি, নাম ধরে ডাকতে পারবেন না?'

এ কথার উত্তর দিতে পারে না নরেন, কারণ মিতাকে নরেনের ভাল লাগে বলে। ধরা পড়ে যায় বলে।

'বুঝেছি, যান, আপনাকে তুমি বলতে হবে না আর, নাম ধরে ডাকতে হবো না।'

নরেন মুখ তুলে মিতার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে। এবং মিতাকে দেখে।

নরেন কি সহজ। 'এতদিন আপনার কেউ ছিলাম যে নাম ধরে ডাকবেন-তুমি বলবেন!'

মিতাকে খুব ভাল লাগে নরেনের। ঘরের ভেতর কেউ নেই, মিতা আর নরেন। স্বভাবতই নরেনের মন মিতাকে গ্রাহ্য করে। তার নিশ্বাস-প্রশ্বাসকে গ্রাহ্য করে। তার কথার পিঠে কথা বলার বিনিময়কে গ্রাহ্য করে। তার চাহনির সঙ্গে চাহনির বিনিময়কে গ্রাহ্য করে। তাকে গ্রাহ্য করতে হয়। যে-কেউ থাকলেও করতে হয়। শ্রমসঙ্গের বিনিময়ের গ্রাহ্যতা আরো প্রত্যক্ষভাবে থাকে সেখানে যে-কারো সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শিশু পুরুষ হলেও। আর মিতার মধ্যে যে নারীর স্নিগ্ধ কমনীয়তা আছে, তার একটা আলাদা ভাল লাগা আছে। আর মিতা নারী বলে, সে পুরুষ বলে, মিতার একটা আলাদা আকর্ষণ আছে। এই আকর্ষণ যে সর্বস্ব, তা নয়। আবার এই আকর্ষণকে তুচ্ছ করারও মানে হয় না। ভাল লাগছে, ভাল লাগে, এতে ত কারো কিছু এসে যায় না? নরেনের যে ভাল লাগে, নিজের মনের কাছে নরেনের এই স্পষ্টতা থাকবে না কেন? তা ছাড়া বারো-চোদ্দ ঘণ্টা এখানেই তার কেটে যায়। এখানেও তার একটা জীবনের বেঁচে থা-া আছে। মোহন আকর্ষণ কেই বা অনুভব করতে পারে না?

মিতা ধরা দিতে চায় বলে কি নরেনের মনে ধরা পড়ে মিতা? আরো কেউ কেউ নারী তার ঘরে কাজ করতে এসেছিল, তারা ধরা পড়তে চায় না বলে ধরা পড়ে নি? তা হলে কি নরেন যে কারো কাছে ধরা পড়তে চেয়েছে? তা নয়।

সে ধরা পড়বে কেন? সেও ধরা পড়তে চায় না বলে ধরা পড়বে না। ধরা পড়তে চাইলে ধরা পড়বে। সে চায় না, মিতার হাতে ধরা পড়ে। ভাল লাগাটা কৌতুকে সুন্দর করে রূপান্তরিত করা যায়। সেখানে অসম্ভব দায়হীন থাকা যায়। মিতাকে ভাল লাগাটা রক্ষা হয়ও তাতে। এই সম্পর্কে শান্ত স্নিগ্ধ হয় বলেই যে ধরা দিতে হবে, তার কোনো মানে নেই। সে সংসারী, অভাবী মানুষ তার অবস্থা ফেরাবার জন্যে তাকে পরিশ্রমী, উদ্যোগী হতে হবে। তার বেপথু-গামী হলে চলে না। শ্যামলী তার বউ। সপ্তাহান্তে হাতে কিছু টাকা দিলে, নিজেই সংসার চালিয়ে নেয়। ভাল শাড়ি জামা এটা ওটার জন্যে কোনো বায়-নাক্কা নেই। একটা গোটা সংসারে শ্যামলীর সযত্ন অভিনিবেশ। তার আকাঙ্ক্ষা ঘন সান্নিধ্যের দাবি থেকেই সরে থাকে নরেন। বারো-চোদ্দ ঘণ্টা এখানেই কাটিয়ে দেয়। শ্যামলীরও দাবি আছে। শ্যামলী নিরুচ্চার থাকে। সঘন নিরুচ্চারতা তার বড় সম্পদ।

তবে মিতাকে জানতে তার খুব ইচ্ছে করে। মিতাকে যদি প্রতিদিন কাজ দিতে পারে, তা হলে ভাল হয়। বাড়িতে মিতার কে কে আছে? কিছুই জানে না। কাজের ভেতর নিবিড় নিবিষ্ট হয়ে পড়ে নরেন।

মিতা নরেনকে দেখে। চোখ দুটি নরেনের স্থিরতায় আছে। কি সুন্দর। কাজল ভ্রু, ঘন। পাতলা ঠোঁট। গোরা রঙ। সরু নাক। মাথায় চুলভর্তি ছিপছিপে শরীর। খুদে খুদে দাঁত। টানা চোখ। চোখের কালো, আরো গাঢ় কালো। চুল নেমে আসে কপালে। হাত ও পায়ের গড়ন বেশ ভাল। হাতের আঙুলগুলো ছোট ছোট, বেশ মানানসই। হাতে পায়ে কালো লোম ভর্তি, বুকে বড় বড় লোমের জঙ্গল।

'দাদা, আপনি খুব ভাল, বুঝলেন?'

নরেন মুখ তোলে। 'কী ভেবে বললেন?'

'কিছু না।' নাক কোঁচকায় মিতা। 'ভাল বলেই বললাম, শুধু শুধু ভাল বলে আমার লাভ?'

'ওহ!'

'ওহ্ কি। আপনার কাছে কাজ পেয়ে বেঁচে গেছি।'

'কেন, কত জায়গায় কাজ পেতেন।'

'আমি পছন্দ জায়গায় কাজ করতে ভালবাসি। আপনার ঘর আমার পছন্দ।'

'কাজ থাকলে কাজ পাবেন?

'জানেন, আমার কেউ নেই।' মুখ নেমে আসে মিতার বুকের দিকে। বুকে থুতনি ছোঁয়।

মিতা কেঁদে ফেলতে পারে, নরেন কাজ থামিয়ে নীরবে মিতার দিকে তাকিয়ে থাকে।

এই কথা বলার পর মিতা কেঁদে ফেলতে পারে। তাই কোনো কথা নয়।

নীরব সঙ্গ দেয় নরেন। মিতার দিকে তাকিয়ে থাকে। আঁচলটা হাতে টেনে নিয়ে কপালের ওপর রাখে। মুখটা অল্প ঢেকে যায় আঁচলে। একটু কনুই, একটু পিঠ দৃশ্যমান হয়।

কাজ ফেলে মিতার দুঃখ বোধ দেখে নরেন। এবং তাকিয়ে থাকে। কোনো কথা বলে না। নরেনের মনটাও ঘন হয়ে ওঠে। একটা গুঞ্জন বেড়ে ওঠে নিজের শরীরের ভেতর। মিতার বয়স বেশ সুন্দর। চেহারা সুন্দর। নরেনকে আহত করার পক্ষে বেশিই। কোমর আর ব্লাউজের প্রান্তের ফাঁকে ফাঁকা পিঠটা চোখে লাগে। চুলভরা মাথা। কানের কাছে খুচরো চুল ছড়িয়ে থাকে। বুকের দিকে নেমে আসা থুতনি বিদ্ধ করে অন্তরকে নরেনের।

মিতা মুখ তুলে নিজের মনের দিকে তাকিয়ে রইল। তাকিয়ে রইল মেশিনটার দিকে।

নরেন নীরবে চেয়ে আছে মিতার দিকে। সে ভেতরে ভেতরে অস্থির, ভেতরের মন তাকে কাঁপাচ্ছে।

সহসা নরেনের দিকে মুখ ফেরায় মিতা। 'আমার কেউ নাই, আপনি আমারে রাখলে রাখবেন, তাড়ালে তাড়াবেন।' মিতা জানে না কী সব বলছে সে? হঠাৎ এমন হয়ে উঠছে কেন? নিজের মনের এই সত্যির হাতে সে চলে গেছে। ফেরাতে পারবে না। 'আমার কেউ নেই, কেউ নেই। স্বামী মরে গেছে ক্যান্সারে। একটা ছেলে আছে আমার সাড়ে সাত-বছরের। আমার কেউ নেই।' নিজের দিকে মুখ ফিরিয়ে, কোলের দিকে চোখ নত করে বলে 'আপনি ভাল মানুষ। ভাল মানুষ আমার দুঃখ বুঝবে।'

'আপনাকে তাড়িয়ে দিচ্ছি না ত দিদি? কাজ থাকলে কাজ করবেন।'

'কাজ না থাকলেও আমি অন্য ঘরে যাব না। কাজ একদিন দুদিন থাকবে না, তার পর ত আসবে? আপনার ঘর পছন্দ। মানুষটা আপনি ভাল।'

মনে তোলপাড় হয় নরেনের। নরেন যে ভাল হয়ে থাকতে চায়, তার মনের স্বভাবের সঙ্গে মিতার সমর্থন পেয়ে যায়। মিতাকে তার বড় ভাল লাগে। এই সব কথায়, এই সব ব্যবহারে মিতার প্রেমে পড়ে যাচ্ছে নরেন। একেবারে প্রথম প্রেমের মত। কিন্তু এটা কি মিতার প্রেম নিবেদনের আহ্বান না দুঃখ অবস্থার প্রকাশ? এটা মিতার প্রেমের আহ্বান যদি স্পষ্ট করে বুঝতে পারত, তা হলে দ্বিধা থাকত না, মুহূর্তে সে প্রেম নিবেদন করতে পারে। এই আকুলতায় মরে নরেন। মনের ভেতর প্রবল ঝড় বইতে থাকে। প্রবল, প্রবলতর হয়ে ওঠে ভেতরে ভেতরে। কিন্তু বাইরে একেবারে শান্ত, নির্জন। সে শুধু মিতার দিকে তাকিয়ে থাকে। এই তাকানোর ভাষায় যদি মিতা কিছু বুঝতে পারে! মিতা কি বুঝতে পারে না? তারও অস্পষ্টতা থাকলে, মিতা বুঝবে কী করে? একটা অসহায়তা বোধ হয় তার। কারখানার ছোট ঘরটা একটা শাস্তি হয়ে ওঠে। ঝড়ের খেয়ায় আছে সে। মেশিন বই ফর্মা নানা যন্ত্রপাতি

তাকে তুচ্ছ করে দেয়। তার অনুকূলে মিতার মন ধরে ফেলার, মূর্চ্ছার মত, মুহূর্ত মায়া খুঁজে বেড়ায়। এই মুহূর্তকে ধরতে পারলেই যেন নরেন বাঁচে, তার সংসার, পরিবার, কন্যা, স্ত্রী, এসব তাকে বাধা দিতে পারে না। মিতা সুন্দর। মিতার আকর্ষণ বড় মধুর।

'মিতা, আপনি খুব ভাল।'

মিতা তাকিয়ে মুখে লজ্জাতুর এক হাসি গড়িয়ে দেয় কোলের দিকে তড়িতে মুখ নামিয়ে। 'আমাকে তুমি বলছেন না?'

'তুমি—'

লজ্জায় ডগডগে হয়ে ওঠে মিতা। প্রবল আনন্দে অশান্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু তাকে আরো কথা বলতে হবে, আরো জাগাতে হবে নরেনকে। 'আপনার হাতেই আমার বাঁচা, আপনার হাতেই মরা। আপনাকে আমি ভালবাসি।' কথাটা বলে ফেলার আঘাতে তক্তি আঁকড়ে তক্তিতে মুখ নামিয়ে দেয় মিতা। খোপা ভেঙে গলে যায়। পিঠে গোছা চুল গড়িয়ে পড়ে। এলিয়ে পড়ে। পিঠ জুড়ে, পিঠ ছেয়ে যায় এলোচুলে। মুখের দু-পাশে মিতার হাত দুটি বেছানো। তক্তির প্রান্ত আঁকড়ে ধরে আছে করতল।

নরেন আর পারে না। মিতার ডান হাতের ওপর হাত নামায়। স্পর্শ করে। প্রবল উষ্ণতা দিয়ে উষ্ণতাকে ছোঁয়। মিতা যেন ঘুমিয়ে পড়তে চায়। মিতা এই স্পর্শে সম্মতি দিয়ে শান্ত থাকে। মিতার মন পেয়ে যায়। মিতাকে পেয়ে যায়। মিতার প্রেম পায়। প্রেম। একটা প্রেম বুঝি সে চেয়েছিল। মধুরতার আকাঙ্ক্ষা হয়তো সে লালন করে এসেছিল গোপনে। সেই আকাঙ্ক্ষা তাকে এই মুহূর্তে প্রবলভাবে নাড়া দিচ্ছে। সে যেন কিছুই জানে না, সংসার গৃহ, কিছুই নয়। একটু প্রেমে থাকতে চেয়েছে। মিতার হাত স্পর্শে রাখে নরেনের হাত। ঘরের ভেতর কি কোনো মাকড়সা, পোকামাকড় বুঝতে পারে? তাদের কি চৈতন্যচোখ আছে? দরজা দিয়ে ঘরে কেউ ঢুকলে, ছাতের ওপর থেকে স্পর্শ তুলে নেবে। কিন্তু গোপনে সে স্পর্শ রাখার অনুভব নিয়ে থাকবে, প্রবহ মনে করবে। আর এই এক চিলতে কারখানা, তার মধ্যে মালপত্রের ঠাসাঠাসিতে, একটু জায়গা থাকে, সেই জায়গার মধ্যে বসার ঘনিষ্ঠতা অচলায়তন দেয়। প্রেমসঙ্গের ঘনিষ্ঠতা দরকার হয়ে পড়ে। এই ঘনিষ্ঠ থাকাটা সকলের চোখে কিন্তু দোষের নয়, প্রেমসম্পর্কে থাকার দোষ দেখতে পারে। প্রেমটা ত একটা গোপন আর্তি, তাকে অন্যের কাছে প্রকাশ নাই বা করল।

তক্তির ওপর মুখ চেপে আছে মিতা। মিতা অনুভব করতে পারে, চুলগুলি তার পিঠ ছেয়ে গেছে। এবং তার লজ্জা তক্তির ওপর চেপে রেখেছে। নরেন তাকে ভালবেসে ফেলেছে। যেন এই শান্তিতে সে ঘুমিয়ে পড়তে চায়। উড়ে উড়ে আসে কেন স্মৃতির প্রেম? তার প্রেমসন্তাষ কি স্মৃতির সঞ্চয় ও স্বভাবে প্রকাশ হয়? উড়ে উড়ে আসে বাংলাদেশ, অন্য রাষ্ট্রের প্রকৃতি। মুখ

গোল হয়ে ফুটে ওঠে তার স্বামীর। এসব সে তাড়াতে পারে না। সেই প্রেমের ভাবই তার স্বভাবের সত্যি প্রকাশ। সেই প্রেম উত্তুঙ্গতার অভিজ্ঞতার সঞ্চয় দিয়েই নরেনের কাছে তার অভিব্যক্তি জানায়। এখনকার ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা তার কাজে লাগে। এবং অন্য পুরুষে ভালবাসায় তার প্রেম নিবেদন রূপান্তরিত হয়। অন্য পুরুষকে ভালবাসার অনুভূতি তাকে পেতে হয়, সঞ্চারিত করতে হয়। সে অনুভূতি আকাঙ্ক্ষা মিথ্যে নয়। সে অনুভূতি আকাঙ্ক্ষা সে পেতে চায়। সে অনুভূতি আকাঙ্ক্ষা সে পূরণ করতে চায়। সে নিদ্রায় আর থাকতে পারে না, প্রেম জাগরণে থাকতে চায়, নিদ্রাহীন। মিতা মরে যাবে না ত? আনন্দে? চোখে সেই দৃশ্য আসে। সেই নদী। পাখি উড়ে যায়। বাংলাদেশের মাটি, গাছপালা, নদী, প্রান্তর, ঘর-দোর, প্রতিবেশী, সংসারজীবন। ওসব কিছু ভাবতে চায় না। সে শুধু ভাবতে চায়, নরেনকে। নরেনের ভালবাসায় থাকতে চায়।

নরেন তাকে তার হাতের স্পর্শ দিয়ে, স্পর্শ করে রাখে। নরেন তাকে ছুঁয়েছে। নরেন তাকে তার মন দিয়ে ছুঁয়েছে। নরেনের দিকে তাকাতে তার লজ্জা হচ্ছে। তাই সে মুখ তুলে তাকাতে পারছে না। আবার চোখ তুলে তাকাতে গেলে স্পর্শ যদি তুলে নেয় নরেন? এই স্পর্শের আকুলতায় ত মুখ নামিয়ে ছিল তক্তির ওপর। তা হলে এই স্পর্শ আস্বাদন করবে না কেন? কিন্তু নরেনের মুখ দেখতে তার ইচ্ছা জাগে। নরেনের চোখের দিকে সে তাকিয়ে থাকবে। মুখ তুলে নরেনের চোখে তাকানো তার বড় কষ্ট। কষ্টের আকাঙ্ক্ষা। বার বার স্পর্শ নিরবিচ্ছিন্ন রাখতে চায়। বার বার নরেনকে দেখতে চাওয়ার ইচ্ছে লুকিয়ে রাখতে চায়। সহসা নিজের ডান হাত দিয়ে নরেনের হাতটা চেপে ধরে মুখ তুলে ধরে নরেনের দিকে তাকায় মিতা। 'আমাকে কোনোদিন তাড়াবেন না, কোনোদিন আমাকে ছেড়ে যাবেন না?'

নরেন কোনো কথা বলতে পারে না। শুধু তাকিয়ে থাকে।

'আপনি আমার মন বোঝেন। আপনি ভাল।'

'মিতা আমার হাত ছাড়, আমার কষ্ট হচ্ছে।'

'কেন?'

'আমি তোমাকে যে ভলেবেসে ফেলেছি।'

'আমিও আপনাকে—'

'হাত ছাড়।'

'আপনিও ত আমার হাত ধরে রেখেছেন।' হাত ছাড়িয়ে নেয় মিতা। মিতা চোখ মুছে, চোখে করতল ঘষে।

নরেন তাকিয়ে থাকে মিতার দিকে।

মিতা নরেনের দিকে না তাকিয়ে শান্ত স্বাভাবিক করতে চায় নিজেকে। ফর্মা তুলে নিয়ে ছুঁচ খোঁজে। ছুঁচে সুতো পরায় ঘন নিবিষ্টতায়। তারপর

সেলাই করতে লাগে। একটানা ভ্রমরের গুঞ্জনের মত মিতা সেলাই করতে থাকে নিজের মনে। শ্রমের একাগ্রতা এসে মেশে সে ভঙ্গিতে। দেয়ালের ক্যালেণ্ডার, পেরেকে ঝোলানো আয়না এই শ্রমসময়ের পারিপার্শ্বিকতায় ঘনবদ্ধ হয়। মেশিনটা সেরকম থাকে, তার অপেক্ষমানতার ভেতর। সে বাঁচে যেন, তাকে ছুঁয়ে দিলে। তাকে চালালে তার অপেক্ষা ঘোচে। মেশিনের এক অস্তিত্ব আছে, শ্রমের ভেতর যে মানুষ আছে, তার অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে যায়। বার বার মনে হয়, মেশিনটা আছে, মেশিনটা নড়ে উঠতে পারে। কারণ মেশিনটা অনেক মানুষের কাজ একা করে দিতে পারে। তার চলমানতা এবং শব্দ তারা জানে। ফলে মেশিনটার থাকার এক সচেতনতা থাকে। দেয়ালের ক্যালেণ্ডারে যে শিশুটি আছে, তার হাসিমুখ দেখে, মনে হয় না কি সেও আছে? ভ্রম হয়।

নরেন বলল 'এই এক হাজার বই তিন দিন সময় নিয়েছি। ঠিক সময়ে ডেলিভারি দিতে না পারলে কথা রাখা যাবে না!'

এই কথায় মিতা স্বাভাবিক হবার সূত্র খুঁজে পায়। স্বাভাবিক চোখে তাকাতে চায়, কিন্তু তাকাবার প্রথম আঘাতে মুখ ছেয়ে যায় হালকা এক ব্রীড়ায়। 'আমি ত আটটা পর্যন্ত আছি। আপনি ভাববেন না।'

মিতার এই কথায় প্রসন্ন হয়ে ওঠে নরেনের মুখ।

'ভাঁজতে হবে।'

'আপনার পরশু বই ডেলিভারি দেবার কথা ত? ভাববেন না।'

'নতুন পার্টি। বড় পাবলিশার। কাজটা করে দিলে আরো কাজ পাব।'

'আমাকে পয়সা দেবার কথা ভাববেন না, আপনি কাজ তোলেন। আরো কাজ ধরেন। দেখবেন ঠিক দাঁড়িয়ে যাবেন।'

মিতার এই কথায় আত্মবিশ্বাসের এক জোর পায় নরেন। সে ব্যবসায় দাঁড়াতে পারবে। তার দাঁড়াবার এক খুঁটি মিতা। প্রতিদিনের দীনতার ভেতর থেকে থেকে মনের জোর খুঁজে পাচ্ছিল না। পাশে এসে একজন দাঁড়ালে, অনেক জোর ও সাহায্য পায় নরেন। মিতা সহমর্মের সহযোগিতা দিতে চায়।

'ফর্মা বাড়ান ত দেখি।'

'হাতের কাজ শেষ?' নরেন মুখ বাড়িয়ে দেখে।

মিতা হাসে।

উঠে দাঁড়ায় মিতা। 'আপনার তক্তিটা কাত করে দেন। ওখানে ফর্মা রাখেন।'

নরেন উঠে দাঁড়িয়ে ফর্মা তুলে বাড়িয়ে দেয় মিতার দিকে। মিতা কোমরে আঁচল গুঁজে নিয়েছে। শ্রমের উত্তেজনা আসে উভয়ের মধ্যে। এবং শ্রমসময়ের সৌন্দর্যও। মিতার হাতে ফর্মা তুলে দেয় নরেন। ফর্মা নিয়ে রাখে মিতা। 'নতুন ফর্মা। নতুন বই।'

'নাম-করা লেখকের বই, পাবলিশারের ম্যানেজার বলল। কি সব পুরস্কার পেয়েছে ?'

'আকাডেমি পুরস্কার ? মজিদ মিয়ার ঘরে একটা পুরস্কারের বই হয়। এটা সেটা নয়। এটা নিশ্চয় নতুন পুরস্কার পেয়েছে।'

'তুমি এসব জানো ?'

'বলে বলে জানি। বড় পাবলিশারদেরই বই পুরস্কার পায়।"

'পুরস্কারে কী দেয় ?'

'নিশ্চয় সোনার মেডেল দেয়। কত সোনা থাকে বলেন ত ?'

'আট-দশ ভরি সোনা হবে নিশ্চয়।'

'বাব্বা এত ? — আপনি ওভারগুলো ওদিকে সরান ত। আমি দুশো মত বইয়ের সব ফর্মা ভেঁজে মিছেল চেনে সেলাই করে দেব, আপনি বাঁধতে শুরু করে দেবেন। আপনার কাজ চলতে চলতে আমি এদিকে কাজ এগিয়ে ফেলব — যোগান পেয়ে যাবেন।' কাজের উত্তেজনায় ছটফট করে মিতা।

'তুমি থাকলে কারখানা উন্নতি করতে পারব মিতা।'

'পারলে ভাল ?'

'পারব না ?'

'কেন পারবেন না ?'

শ্রমের আয়োজনে, অনেক কথা না বলেও বলা হয়ে যায় শ্রমসম্পর্কে। যেন তারা কাজই করতে চেয়েছিল, আর কাজে প্রেম চেয়েছিল। প্রেম তাদের মুখো মুখি বসে থাকায় ছিল না। বিন্দু বিন্দু সময় বইতে থাকে। সময়ের গতির মধ্যেই দিনের নানা রঙের পরিবর্তন হয়ে চলে।

গলির সামনে ঠায় দাঁড়িয়েছিল মতি। মতি অত দাঁড়াতে পারে না। আবার একটানা বাঁ দিকে অনেকক্ষণ দাঁড়ানো যায় না, ডান দিকেও না। বাঁ দিকে হেলে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ, পরে আবার ডানদিকের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায়। এক ঘণ্টার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। মিতাদি তার বেরল না। সে কারখানার মুখে গিয়ে দাঁড়াবে না। কারণ মালিকটাকে তার ভাল লাগে না। মিতাদির সঙ্গে হেসে কথা কী ? কথা হলে কথা হবে, হেসে কথা হবে কেন ? এতক্ষণ কাজ করে কেন ? ছুটি হয়ে গেল সকলের, আর মিতাদি এখনো কাজ করছে। মিতাদি ত কখনো ওভারটাইম করে না। মন কেমন করে মিতাদির জন্যে। মিতাদির স্পর্শ শরীরে লেগে আছে। সারাক্ষণ শরীরের ভেতর কেমন শিহরন খেলে বেড়ায়। একা একা থাকায় ছটফট করে। সময় কাটে না। মন থির মানে না। আর কেউ নয়, শুধু মিতাদিকে তার চাই।

সন্ধ্যার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে মতি। পাশের কোনো কারখানার হালকা আলো এসে পড়েছে পায়ের কাছে। মতির চুলগুলো বেড়ে গেছে, ছাঁটা আর

হয়নি। নিজের মনে ভাবে, সে কী আরো রোগা হয়েছে? সে রোগা হলে মিতার মনে কি কোন কষ্ট হয়? সে কথা বুঝবে কী করে?

বাড়ি যেতে ইচ্ছে করে না। বন্ধুদের সঙ্গে মিশতে ইচ্ছে করে না। সিনেমা দেখতে ইচ্ছে করে, কিন্তু একা সিনেমা দেখতে ইচ্ছে করে না। মকবুলের রুলিং কারখানায় মতি একাই থাকে, রাতে। ঘুমতে পারে না। চিন্তা যখন কাজ করে না তখন এলিয়ে পড়ে। ঘুমে ঘুমে স্বপ্ন দেখে প্রায়ই, সে একটা ঘরে শুয়ে আছে, পাশের ঘরে মিতা শুয়ে আছে, দুটি ঘরের মাঝখানে কোথা থেকে একটা দরজা এসে গেছে। সে দরজাটা খোলা। সে দরজা দিয়েই মিতার কাছে চলে যায়।

নীরবে অস্থির মনে মিতার অপেক্ষা করে মতি। সংকীর্ণ গলির অন্ধকারে সে দাঁড়িয়ে। অন্ধকার তাকে ছেয়ে দেয়। অন্ধকারে সে ডুবে যায়। অন্ধকার তাকে অধীর করে। অন্ধকার। অন্ধকার। অন্ধকার মিতা আর মতি। মিতাদি নয়। মিতার চৈতন্য নাই বা থাকল। অসুস্থ হলই বা। সময় কাটে না। প্রতিটি সেকেণ্ড সয় না। অসহ্য।

আর নয়। পা দুটোকে আর ধরে রাখতে পারে না মতি। সবুজ বনানীর ভেতর যেমন হরিয়াল ডুবে যায়, তেমন রকম গলিতে ডুবে যায় মতি। মতি অন্ধকারে যেমন ডুবে যেতে চায়। সে হোলির রঙ চেনে না। একটাই রঙ জানে, তমসাকীর্ণতা। সে কি নিজের অন্ধকার দেখতে পায়? নরম পাঁজরের ভেতর তার দ্রিম্ দ্রিম শব্দ উঠছে। মাতাল হবার শব্দ। মাতাল হবার নেশা। দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে নরেনের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে আছে মিতা। মতি এই হাসির অর্থ বোঝে। মতি পালিয়ে আসে, রাগে দুঃখে অভিমানে। মনে হয় যেন নরেনকে খুন করে সে।

সে খুন যদি করে? সে খুন করেই ফেলবে।

মকবুলের কারখানার কাছে চলে আসে সে গলি বেয়ে। চাবি ঘুরিয়ে তালা খোলে। ঘর অন্ধকার। সুইচ টিপে আলো জ্বালে। ঘর আলোয় আলোয় ভরে যায়। তার পাতলা শান দেয়া ছুরিটা সে খোঁজে। মেশিনের বাটামের ওপর ফেলে রেখেছিল। এখন এই মুহূর্তে তার মায়ের কথা মনে পড়ে না। এই মুহূর্তে এখন তার ভাই দিদির কথা মনে পড়ে না। পড়ে না। মনে পড়ে না কোনো শৈশবের স্মৃতি। মাতৃক্রোড়ে ফেরার বাসনা নেই আর। সে যৌবন চায়। যৌনতা চায়। মিতার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনে সে এতই উত্তেজিত যে নরেনকে খুন করার ঘটনা তার কাছে তেমন উত্তেজনা আনে না। ছুরিটাকে উল্টেপাল্টে দেখে। তারপর যেখানে ছিল, সেখানেই চালান করে দেয়।

তখন সে তার পুঁটুলির কাছে যায়। নিজের মনে হাসে। ভারি মিষ্টি হাসি তার ঠোঁটের কোনায় এসে মেশে। তার কাঁচা মুখের ওপর বসানো কলা-

পাতার মত নরম ঠোঁট। পুঁটুলিতে তার নতুন প্যান্ট শার্ট আছে। এটা তার এক সম্পদ। এটা পরলে তাকে ভাল দেখাবে। মিতা দেখলে তাকে পছন্দ করবে। মিতা ত তাকে পছন্দ করেই থাকে। এই নতুন পোশাকে আরো মানালে, আরো পছন্দ করবে তাকে। প্যান্টটা কোমর থেকে ঝুলিয়ে আলোয় দেখে মতি। আলোয় খুব সুন্দর দেখাচ্ছে প্যান্টটা। তার চেয়ে ভারি সুন্দর তার ঠোঁটের হাসি। জামাটা টেনে বার করে। একটা হলুদরঙা শার্ট। খুব সুন্দর। বেশ মানায় তাকে। মেশিনের বাটমের ওপর ফেলে প্যান্ট আর শার্টটাকে আলোয় দেখে মতি। তার নিজের পয়সায় তৈরি এই শার্ট প্যান্ট। এই দুটো পরে সে গলির মুখে দাঁড়াবে মিতার অপেক্ষায়। মিতা কখন বেরবে তখন তার সঙ্গে দেখা হবে। এবং এই পোশাকে তাকে ভাল দেখাবে বলে মিতার খুব পছন্দ হবে মতিকে।

দপ করে লোডশেডিং হয়ে গেল।

মতির চারপাশে অন্ধকার। সে অন্ধকারের ভেতর অন্ধকার হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মকবুলের কারখানায়।

একটা দেশলাইয়ের কাঠিও সে খুঁজে পায় না। একটুও আলো নেই তার কাছে। সে অন্ধকারেই জামাপ্যান্ট পরে। আলো থাকলে সে দেখতে পেত নতুন পোশাকে তাকে মানিয়েছে। অন্ধকারের শরীরের ভেতরই সে দেয়াল খোঁজে, দরজা খোঁজে, চাবিতালা দেয়, এবং অন্ধকারের গলিতেই সে বেরিয়ে আসে। গলি থেকে গলি যায় অন্ধকারের ভেতর। কুকুরের শরীর মাড়িয়ে যায়। এঁটো পেচ্ছাব কফ থুতু শিকনি মাড়িয়ে যায়। নরেনের কারখানার দরজায় মুখ বাড়িয়ে দেখে কুপির আলো। নরেন আর মিতা এখনো বসে বসে কাজ করে।

ফিরে আসে মতি। শান্ত হতে চায়। শান্ত হতে পারে না। লোডশেডিং হয়ে গেল, কখন আলো আসবে, তার কোনো ঠিক নেই। একা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে গলির মুখে। পায়ে অসংখ্য মশা কামড়ায়। নরেনের কারখানার দরজা একটু তফাতে। গলিটার সে জায়গাটা কুপির আলোর মৃদু আভা লেগে আছে। সেদিকে নীরবে তাকিয়ে থাকে মতি। অদ্ভুত চেয়ে চেয়ে থাকে। মিতার অপেক্ষায়। মিতা বেরিয়ে এসে তার হাত ধরবে। শরীরে শিহরন খেলে যাবে তার। কাঁধে হাত রাখবে। খুব ভাল লাগবে তার। কত কথা বলবে। নিজের নতুন পোশাকের গন্ধ নিজে পায় মতি। তার একখানা সানগ্লাস আছে। নীল রঙা। সেটা সে পরতে পারত। তার বিশ্বাস চশমাটা পরলে তাকে বেশ মানাত।

পায়ে মশা লাগে। ঘাড় ঝুঁকিয়ে স্থির তাকিয়ে থাকে মতি দরজার দিকে। তার পিঠে অন্ধকার, পাশে অন্ধকার, দূরে অন্ধকার। অস্থির মন অথচ তাকে শান্ত থাকতে হয়। সে শান্ত থাকে কেন! শান্ত হয়ে থাকতে পারা যায় না।

অসহ্য। ঘন ঘন নিশ্বাস বয়। অবহেলা পাচ্ছে বোধ করা মন আরো অস্থিরতা পায়। মিতা কি তাকে অবহেলা করছে? মিতা কি তাকে এড়াতে চায়? এসব তার মনে হয়। মিতা যদি অবহেলা সত্যি করে তা হলে মতি ছটফট করে মরে যাবে। মিতার চোখ যদি মতিকে অবহেলা করে, তা হলেও মতি অস্থির হবে, ছটফট করে নিরাশ হয়ে মরে যেতে পারবে না, কারণ মিতার মন হয়তো অবহেলা করে না। চোখের কথা সব নয়। মনের কথা-ই আসল। মন থেকে মতিকে মিতা অবহেলা করলে মতি ছটফট করে মরে যাবে। তার আর কোনো অবলম্বন নেই। মিতাহীন তার আর কোনো বাসনা নেই। বাসনা-পূরণের আর সব কিছু তার কাছে বহু সংকীর্ণ। এই বাসনা তাকে বরং বাঁচিয়ে রাখে। মিতার শরীর পেলেই মতির অনেক কিছু পাওয়া হয়ে যাবে। এবং সে কেমন ? কেমন রকম ভাবে সে শরীরের ঘনিষ্ঠতর হতে পারবে? এই ভাবনা নিয়ে যেমন সে বাঁচতে পারে, তেমনই এই বাসনা আহত হলে সে ছটফট করে মরে যেতে পারে। বসন্তদিন চলে যাবার মত চকিতে, অথবা ভিজে করতল হাওয়ায় শুকিয়ে যাবার সহসায়। গ্রামে তার কোনো শৈশব কৈশোর ছিল না। এই যুবকটির গ্রামের শরীর, গ্রামের মন, প্রকৃতির স্বভাবে। শহরে আসা খাদ্য আহরণের জন্যেই। শুধু এইটুকুর জন্যেই তার শৈশব কৈশোর দিয়ে দিয়েছে শহরে। অথচ শহরের কেউ নয়। তার একটা গ্রাম আছে, একটা ডাকঘর আছে, একটা কাঁচা ঘর আছে। আর খুব ছোটবেলার আবছা স্মৃতি আছে।

বেরিয়ে এসেছে মিতা।

মতি নড়ে ওঠে।

মিতার সঙ্গে বেরল নরেন। নরেন দরজায় তালাচাবি মারছে। এবং তাদের কাছাকাছি কোনো আলো নেই। খুব দূরের হালকা আলোয় কিছুটা তারা অবয়বের ছায়ায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে দেখা যায়।

ওরা একসঙ্গে এদিকে আসছে দেখে মতি গলির মুখ থেকে ছিটকে একটা অন্য গলির ভেতর ঢুকে যায়, যেটা দিয়ে তারা যাবে না। দুজনে একসঙ্গে যাবে নাকি? তা হলে মতি কীভাবে কথা বলবে? নিশ্চয় ওরা কিছুক্ষণ এক-সঙ্গে হেঁটে পরে আলাদা আলাদা হাঁটবে। তা যদি এ পি সি রোডে, বড় রাস্তায় গিয়েও হয়, তা হলেও মতি ধরতে পারবে মিতাকে। মতি আর মিতার সম্পর্কের কথাই তাদের হবে। কিন্তু তারও আগে ওদের ছাড়াছাড়ি চাইছিল মতি। হতেও পারে। মিতা যদি একটা পান-দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পান খায়, আর নরেন যদি এগিয়ে ট্রেন ধরতে চলে যায়। তা হলে ত মিতাকে একা একা পেয়ে যাবে মতি।

একটু দূরত্ব রেখে হাঁটে মতি। সামনে মিতা আর নরেন হাঁটছে। ওরা দুজনে কথা বলতে বলতে হাঁটছে। এবং পাশ ফিরে মিতা দেখছে নরেনকে। নরেনও দেখছে। মিতার মুখে হাসি। কী কথায় হাসে? নরেন এমন কি

হাসির কথা জানে? মিতার যত হাসিমুখ দেখে, তত মিতার প্রতি আকর্ষণ বাড়ে মতির। ছটফট করে। শরীরের ভেতর এক জ্বরতপ্ত হল্কা বয়ে যাচ্ছে। এ হাসি নরেনের প্রতি হিংসা বাড়ায়। মিতার প্রতি আকর্ষণ বাড়ায়। নিজের কষ্ট বাড়ায়।

বড় রাস্তায় পড়ে, তবুও ওরা বিচ্ছিন্ন হয় না। নরেন একটু এগিয়ে গেলে, দাঁড়িয়ে গিয়ে মিতার জন্যে অপেক্ষা করে। তারপর পাশাপাশি ওরা হাঁটে। মতি পঞ্চাশ হাত দূরে দূরে হাঁটছে। কখনো কিছু মানুষের ভিড়ের মধ্যে চোখ থেকে হারিয়ে ফেলে মতি। তখন প্রায় দৌড়েই কাছাকাছি চলে এসে ওদের খুঁজে পেয়ে আবার শ্লথ দূরত্ব রেখে হাঁটে। স্টেশনের পথ। ডান দিকে ফ্লাইওভার উঠে গেছে। অসংখ্য মানুষ হেঁটে যাচ্ছে স্টেশনের দিকে। দশ হাত দূরত্বে হাঁটছে এবার। জনস্রোতের মধ্যে এইটুকু দূরত্বেই হারিয়ে ফেলে মিতাকে মতি। তখন এর গায়ে হুমড়ি খেয়ে, ওর গায়ে হুমড়ি খেয়ে, ঠেলেঠুলে ভিড়ের মধ্যে এগিয়ে যায় মতি। প্রায় মিতার কাছাকাছি চলে যায়. কিন্তু মিতা জানতে পারে না। এই ভিড়ের মধ্যে মিতাকে যদি মতি ছোঁয়, মতি শান্তি পায়, কিন্তু মিতার মন কি জানল, মতি তাকে ছুঁয়েছে? কিন্তু ছুঁতে পারে না।

জনস্রোতে স্টেশনের ভেতর ঢুকে যায় মতি। আর মিতাকে হারিয়ে ফেলে মতি। অনেক লোক একটা ভিড় ট্রেনের ওপর উঠেছে। ভিড়, দাপাদাপি। সেদিকে নরেনকে ছুটে যেতে দেখল, কিন্তু মিতাদিকে দেখতে পেল না। ট্রেনের দিকে ছুটে যায় মতি। ঠাসা ভিড় ট্রেনের। ভোঁ দিল গাড়ি। গাড়িটা ছেড়ে দিয়েছে। গাড়িটা চলে যাচ্ছে। মিতা কি তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে?

'কি রে, তুই এখানে?' পেছন থেকে মতির কাঁধে হাত দেয় মিতা।

মতি সহসা চমকে ওঠে স্পর্শ ও চেনা স্বরে। দ্রুত ঘাড় ফেরায়। 'তুমি ঐ ট্রেনটায় চলে যাচ্ছ না?'

'কই আমি ত যাই নি! ওটা ত আমার লাইনের ট্রেন নয়। এর পরের ট্রেনটা।'

মতির সত্যিই বিশ্বাস হয় না মিতা তার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। মিতা চলমান ট্রেনটায় উঠে চলে গেছে মনে হয়।

হাত ধরে মিতা মতির, 'তুই কোথায় ছিলি?'

'আমি ত তোমার পেছু পেছু এলাম।'

'তাই!' নরম হাসে মিতা। 'তোকে ত দেখতে পাই নি। নরেনদা মজার সব গল্প বলছিল, শুনতে শুনতে চলে এলাম।'

'তুমি একা আসতে পারলে না কেন? তা হলে ত তুমি আমার সাথে আসতে।'

'নরেনদা বলল একসাথে চল, আমি কি পারি বলতে, আপনি চলে যান! মালিক বলে কথা।'

'ছাই মালিক ! কারখানার কর্মচারী কোথা ! লোকটাকে আমার ভাল লাগে না। পান খাবে ?' মিতার হাত ধরে টানে মতি।

মিতা মতিকে দেখে। কেন মিতা মতির সঙ্গে বিরক্তহীন মনে কথা বলতে পারে ? মতিকে কষ্ট দেয়া যায় না। আর মতিকে তার ভালও লাগে। মতি কষ্ট পাক, সেটা চায় না মিতা।

মতি তাকে পান দোকানে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, এই অনিচ্ছায় মতির গায়ের জোরে যাওয়ায় মিতার মন ব্যথিত হয়। এই মুহূর্তে মতিকে তার অসহ্য লাগে। মতির প্রতি বিরক্ত হতে সে পারে না। মতি ভাল থাকুক। মনে কষ্ট নিয়ে না থাকে। মতি কষ্ট পায় না, এটা চায় মিতা। কিন্তু মতি কি কখনো কষ্ট পাবে না ? মতিকে কষ্ট পেতে হতেই পারে। মতি কি জানতে পারবে, নরেনের সঙ্গে তার যে এই প্রেম হওয়াটা ? মতি কি সহ্য করতে পারবে ? হয়, সে প্রেমে আছে নরেনের এটা জানতে দেবে না মতিকে, তা হলে মতি কষ্ট পায় না, আর এক হয় নরেনের সঙ্গে তার প্রেমবিচ্ছেদ চেয়ে নিয়ে মতিকে কষ্ট থেকে বাঁচানো। সেটা সম্ভব নয়। নরেনের প্রেম সে হারাতে পারে না। নরেনের প্রেম তার সর্বস্ব হয়ে উঠেছে। এটা সে কিছুতেই হারাতে চায় না। মতিকে শান্ত থাকতে হবে। মতিকে কষ্ট না পেয়ে থাকতে হবে। মতির প্রতি স্নেহ মমতা আছে মতি কি এটা বোঝার বিনিময় চায় না ? সেই বিনিময়টা, নরেনের প্রেম, মতি মেনে নিক মিতার জীবনে।

মিতার হাতে একটা পান গুঁজে দেয় মতি। মতিকে মিতার চোখ দেখে। মতি একটা সিগারেট ধরিয়েছে। কী জোরে জোরে টান দিচ্ছে সিগারেটে। নাক মুখ দিয়ে গল গল করে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। কি বিশ্রী দেখায় মতিকে সিগারেট খেলে। কিন্তু মতির সৌন্দর্য মানে মিতা। তাই ত মতিকে কষ্ট দিতে চায় না। কি ক্লান্ত লাগে মিতার। ট্রেনটা এলেই ভিড়ের মধ্যে মুখগুঁজে দেবে। মতি চলে গেলে, সে শান্তি পায়। নরেনের সঙ্গে থাকার ঘটনা সংলাপ মুহূর্তগুলি মনে ফিরিয়ে এনে ভাল থাকতে চাইবে মিতা। নরেনকে একান্তে ভাববে মিতা। তার আর কিছু ভাল লাগে না এই মুহূর্তে। মতিকেও না। মতিকে ভাল লাগাতে হয়, মতির প্রতি কৃতজ্ঞতায়। পানের স্বাদ পায় না মিতা সর্বক্ষণ নরেনের কথাই মনে পড়ে। নরেনের চোখ মুখ, নরেনের কথা বলা, ব্যবহার…এসব মুহূর্তের কথা। মিতা অভিসারের গোপনতায়, মতির প্রতি ভাল ব্যবহার করে, নরেনের কাছে পৌঁছবার এ অভিসারের ক্লেশ। তাতে ত মন ভারী হয়, বাথায় টনটন করে, তা ত মিথ্যে নয় ? অথচ মতির খারাপ চাইতে পারে না।

'আমার বড় অসুখ রে মতি, খুব অসুখ, কষ্ট। তুই জানবি না।'

'আমাকে বলতে হবে।' মতি মিতার হাত ধরে টানে।

'আহ্ ছাড় মতি। আমাকে বিরক্ত করিস না। আমি মরে যাব।'

'ওরকম কথা আর বলবে না !'

'মতি !'

'তুমি খুব ভাল। তোমার কথা শুধু আমি ভাবি।'

'মতি এত ভাবিস কেন ? এত ভাবিস না।'

'ভাবনা আসে বলেই ভাবি।'

'তোর কি আমাকে নিয়েই সব ভাবনা ?'

'সব !'

মতি আর কিছু বলতে পারে না। মতির ভাষা ব্যাখ্যা করতে পারে না, মুখের কথা ব্যাখ্যা করতে পারে না। শুধু এক অস্থিরতা। এই অস্থিরতাটা সে শুধু নিশ্বাসে প্রশ্বাসে প্রকাশ করতে পারে। সেই শব্দ ও গতির ভেতরই মতি নিজেকে শুধু প্রকাশ করতে পারে।

সহসা ট্রেন এসে গেলে মিতা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে ট্রেন ধরে। মতি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস পতনের দ্রুত শব্দ, অস্থিরতা নিজেই অনুভব করে।

নরেন কাজকর্ম টুকটাক পেয়ে যাচ্ছে। কারখানার উন্নতির সম্ভাবনা উঁকি দেয়। এবং তার মনে হয়, এই উন্নতির সম্ভাবনা মিতার ভাগ্য ধরে এসেছে। মিতা তার আদর্শ সঙ্গী হয়ে উঠেছে। দু-সপ্তাহ মিতা টানা কাজ করছে, তার সঙ্গে চার ঘণ্টা ওভারটাইমও। দু সপ্তার মজুরি নেয় নি মিতা। দিতে গেছে, নেয় নি। এবং সেই না নেয়া টাকা নরেনের খুব উপকারে এসেছে। আরো কাজ ধরতে পেরেছে। বোর্ড পুস্তানি কাপড় লেই সুতো কিনে পার্টির কাজ করে দিতে পেরেছে। পার্টির কাজ করে দিলে ত সঙ্গে সঙ্গে পেমেণ্ট হয় না, কিছু দিন অপেক্ষা করতে হয়। আর একটা পেমেণ্ট হলে, একটার পেমেণ্ট সব সময় হাতে রাখে পাবলিশার। বাঁধাইখানায় বইয়ের ফর্মা যাচ্ছে, তারও এক নিরাপত্তা কিছু একটাতে ত চায় পাবলিশার। তাতে ত নরেন মরে যেতে পারে। নরেনের এমন প্রেমসঙ্গিনী ছিল বলে, পারে নরেন। না হলে নরেন কিছুতেই পারত না। যাকে দিয়ে কাজ করাত, তার দারিদ্র্য, প্রতিদিনই তাকে ক্ষুধানিবৃত্তির জন্যে কাজ করতে হয়—তাকে মজুরি দিতে হত। তা হলে পেরে উঠত না নরেন। মিতার হয়ত দারিদ্র্য আছে, মিতা প্রেম দিয়ে সেটাকে আশ্চর্য আড়ালে রাখতে পারছে। মিতাকে কি নরেন ভুলতে পারবে ! প্রতি মুহূর্তে কাজের ভেতর চোখ চলেযায় মিতার দিকে। এবং গভীর দৃষ্টিবিনিময় হয়, কথা হয়। কথা যেন অনন্তকাল বলা যায়। কিন্তু কথা বলার চেয়ে কথা শোনার বাসনা এত নাড়ায় যে, নিজের কথা থামাতে হয়, আর মিতাও কথা শোনার বাসনায় নিজের কথা থামায়, ফলে দীর্ঘক্ষণ তারা নীরব থাকে। এই নীরবতা তার বহু কথার বীজ বোনে। মনে মনে যেন বহু কথা হয়। আর শ্রমের

ভেতর এই প্রেমসম্ভোগ অতি মধুর। নরেনের বউ জানে না, কেউ জানে না। নরেন তার বউকে বলতেও পারবে না।

উটকো একটা হাওয়া এসে লেগেছে বাঁধাই কারখানায়। ইউনিয়নের হাওয়া। সামনে বৈশাখের সিজিন। বৈশাখের কাজ শুরু হতে হতেই ইউনিয়নের দাবি দাওয়ার হাওয়া প্রবলতর হয়ে উঠছে। ছোট কারখানায় এই ইউনিয়ন কত মিথ্যে জানে নরেন। কারণ নরেন ত নিজেই মালিক, নিজেই কর্মচারী। নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের টুকুর জন্যেই পরিশ্রম করে। আর একজন কর্মচারী মিতা। এখানে মালিক শ্রমিকের সম্পর্ক কোথায়? আর মিতার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে ইউনিয়ন লাগবে না। মিতা নিজেই পারবে বোঝাপড়া করতে। এমনিতে, মিতাদের কাজের অনিশ্চয়তা। যে কারখানায় প্রতিদিনের কাজ থাকে, সে কারখানায় প্রতিদিন কাজ করা যায়। যারা প্রতিদিন কাজ পায়, তাদের সংখ্যা কম। বাকিরা এ-ঘরে একদিন ও-ঘরে দুদিন, এমন ঘুরে ঘুরে কাজ করে। তাদের কাছে ইউনিয়ন কিছু কাজে আসে না। মালিক কাজ না পেয়ে ধুঁকছে। যে কাজ পাচ্ছে তা হয়তো খুব কম রেটে। অতি ছোট কারখানার মালিক মাসে আটশো টাকা রোজগার করতে হিমশিম খায়। তার আবার মালিকানার কী? এই ছোট কারখানায় ইউনিয়নের হাওয়া ঢুকতে পারে না। ইউনিয়ন যদি বলে দেয়, শ্রমিকদের এত বাড়াতে হবে মজুরি, তা হলে নরেন সে শ্রমিককে চলে যেতে বলতে বাধ্য হবে। কম রেটে কাজ করার জন্যে কত শ্রমিক ঘুরে বেড়ায়। রাস্তায়, ফুটপাথে, কারখানার দোরে দোরে বয়ে বেড়ানো শ্রমিকদের কাছে কোথায় ইউনিয়ন? প্রতিদিনের খাদ্য সংগ্রহের তাড়নায় ইউনিয়ন পৌঁছতে পারে না সেই ব শিকড়ছিন্নদের কাছে।

ইউনিয়নটা বড় কারখানাতেই হতে পারে। যেখানে উনিশ জনের ঊর্ধ্বে শ্রমিক কাজ করে। কিন্তু সাঁইত্রিশ নম্বর য়ার্ডে বড় কারখানা কোথায়? যারা ফ্যাক্টরি অ্যাক্টের মধ্যে পড়ে? আট দশটি কারখানায় এই শ্রমিকসংখ্যা দেখা যাবে। একটি-দুটি কারখানা ফ্যাক্টরি অ্যাক্টের মধ্যে মাত্র ধরা দিয়েছে। বাকি কারখানা ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট এড়িয়ে ঠিকা শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করান। সেই-সব শ্রমিক প্রতিদিন কাজ করেন, অথচ তারা স্থায়ী নয়। শ্রমিক নিয়োগ ও শ্রমিক-দের সঙ্গে মজুরি সংক্রান্ত বোঝাপড়া ঠিকাদারকে দিয়েই করানো হয়। শ্রমিকরা মজুরি পান পিস রেটে। শ্রমিকরা, সেই বড কারখানার ভেতর কাজ করেন সেই কারখানার মালিকের মেশিন যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করেন, অথচ সেই মালিক তাঁদের মালিক নয়। শ্রমিকরা যদি দাবি করে বসেন, তা হলে ঠিকাদার অন্য শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করাবেন। কারণ কাজের লোকের অভাব নেই। কম কাজ, বেশি লোক। বড় কারখানার মালিক এই কৌশলটুকু শুধু নেন নি, তার সঙ্গে আরো একটি মোক্ষম কৌশলও নিয়েছেন। মাঝারি ও ছোট কার-খানার থেকে মজুরি দু-আড়াই টাকা বাড়িয়ে রাখেন। মাঝারি ও ছোট কার-

খানাই বেশি। মাঝারি কারখানার শ্রমিকরাই এই ইউনিয়ন করে থাকে। মাঝারি কারখানা ইউনিয়নের আন্দোলনে মালিকের কাছে যা দাবি করে বসেন, সে দাবি বড় কারখানা আগেই পূরণ করে রেখেছে। সেহেতু বড় কারখানার শ্রমিকরা অসংগঠিত হয়ে পড়ে স্বাভাবিক ভাবে। এ-কারণেও বড় কারখানায় ইউনিয়ন জোরদার হতে পারে না। অথচ শ্রমিক গঠনের দিক থেকে বড় কারখানার ইউনিয়ন সম্ভাবনাপূর্ণ ছিল। মাঝারি কারখানায় ইউনিয়ন ইউনিয়নের উপযুক্ততা পায় নি, ওখানেই ইউনিয়ন জোরদার। মাঝারি কারখানার গড় শ্রমিক সংখ্যা দশ জন। মাঝারি আয়তনের কারখানা। প্রতিদিন কাজ হয়, কিন্তু রেট বেশি পান না বড় কারখানার তুলনায়। বড় কারখানা আধুনিক যন্ত্রপাতি ও বড় প্রেসের বড় পাবলিশারদের কাজ করেন, তাঁদের রেট অনেক বেশি। মাঝারি কারখানায় কাজ আসে মাঝারি সব পাবলিশারদের। যে পাবলিশাররা বই নিয়ে প্রতিযোগী ব্যবসা করেন। কত কম পয়সায় বই ছাপা যায়, কত কম পয়সায় বাঁধাই করা যায়—বেশি টাকার বিজ্ঞাপন কাগজে ছাপাবার বাজেট করতে, এদিকের খরচ কম করতে তাঁরা মাঝারি কারখানায় কাজ দিয়ে থাকেন। মাঝারি কারখানায়ও কাজ পাবার প্রতিযোগিতা। ফলে পাবলিশারদের কাজ কম রেটে তাঁরা করতে বাধ্য হন। মাঝারি কারখানায় চাপ সৃষ্টি ইউনিয়ন করলে, মালিকের ব্যবসা-ই মার খাবে। ইউনিয়নের চাপে, মজুরি বাড়াতে পারবে না মালিক।

সত্যিই বাঁধাই শ্রমিকদের যা মজুরি তা বাড়াবার প্রয়োজন আছে। এত কম মজুরি আর কোনো কাজে নেই। মাঝারি কারখানার শ্রমিকরা মোট মাইনের সঙ্গে একশো টাকা বাড়াবার দাবি করেছে। আর ন দিন পরে তিন দিন ধর্মঘট করবে তারা। সিজিনের মুখে ধর্মঘট। পয়লা বৈশাখের বই ঠিক ঠিক বেরবে না। পাবলিশারদের ব্যবসার ক্ষতি হবে। শ্রমিক ইউনিয়ন সময়টা ভাল বেছে নিয়েছে। যে একটি বইয়ে বোর্ড পুস্তানি লেই সুতো মজুরিসহ একটাকা চল্লিশ পয়সা বাঁধাই মালিক পায়, সে বই তিরিশ টাকায় বিক্রি হয়। ঐ বইয়ের ব্যবসা ষাট-সত্তর হাজার টাকার। বই না বেরলে ষাট-সত্তর হাজার টাকার ব্যবসা মার খায়। এ-রকম পঞ্চাশ-ষাটটি পাবলিশারের এক একজন পাবলিশারের তিরিশ-চল্লিশটা শিরোনামের বই, কোটি কোটি টাকার ব্যবসা মার খাবে।

হঠাৎই মাঝারি কারখানার শ্রমিকরা এ-রকম একটি আন্দোলনে নেমে পড়েছেন। তিনদিনের ধর্মঘট। এ রকমটাতে বোধ হয় মাঝারি কারখানার মালিকদের, শ্রমিকদের প্রতি নীরব সমর্থন গড়ে উঠেছে। এই শিল্পে আসল মজুরি বাড়াবার যিনি মালিক, তিনি ত পাবলিশার। তাঁর কাছে ধাক্কাটা লাগুক, তিনিও চাইলেন। এবং শ্রমিকদের বন্ধ ডাকার সঙ্গে সঙ্গে, চতুর্থদিনে ব্যবসায়ী সমিতিও বন্ধ ডেকে দিয়েছে। সুতরাং পাবলিশাররা পুরোপুরি চোটটা পাবেন। পাবলিশারদের ব্যবসার মূলে বাঁধাইখানার মালিক শ্রমিক যে

কেউ, এটা তাঁরা বোঝাতে চেয়েছেন। সিজিনটা ত ছ-মাসের। এই ছ-মাস ধরে ইউনিয়ন একটি কাজ করে চলেছে, পাবলিশাররা যাতে দ্রুত বই বাঁধিয়ে নিতে না পারে, তার জন্যে সন্ধ্যা পাঁচটার পর ওভারটাইম বন্ধ করেছে ইউনিয়ন। পাবলিশার যে টাকা বইয়ে লগ্নী করেন, তা বাজারে দ্রুত ছেড়ে তুলে নেবার জন্যে বাঁধাই মালিকদের কাছে অল্প সময়ে, বেশি কাজ করিয়ে নেন। এই দ্রুত ডেলিভারি শিথিল করতে চাইল ইউনিয়ন। যতদিন না দাবিদাওয়া মেটে, ততদিন ওভারটাইম বন্ধ। ওভারটাইম না হলে দ্রুত কাজ ওঠে না। শ্রমিকরা যা দৈনিক মজুরি পান, তা গড়ে চারশো টাকা, আরো দুশো টাকা প্রতিদিন চার ঘণ্টা ওভারটাইম করে তুলতে হয়। সিজিনের সময়ে ওভারটাইম মহার্ঘ। শ্রমিকরা ওভারটাইম ত্যাগ করল। তাঁরা আন্দোলনের ভেতর এমনভাবে ত্যাগের ভূমিকা নিয়েছেন। বাঁধাই মালিকরাও চাইছেন পাবলিশাররা বেকায়দায় পড়ুক। যাতে রেটটা তাঁরা বেশি পেতে পারেন।

পাঁচটার পর কোথাও কাজ হচ্ছে কি না, এসব শ্রমিকদল দেখে বেড়ায়। পাবলিশারদের কাজ দ্রুত করে দেবার জন্যে কোনো বাঁধাই মালিক স্থানীয় গরিব পরিবারদের দিয়ে সেলাই ভাঁজাই করতে ফর্মা বাইরে পাঠাচ্ছেন কিনা, এসবও পাহারা দিচ্ছেন। এলাকায় দরিদ্র পরিবার সেলাই বাঁধাই করে তাঁদের দারিদ্র্য মোচন করেন, তাঁরা আবার খুবই দরিদ্র, বাঁধাই শ্রমিকদের থেকেও। দরিদ্র শ্রমিকরা অতি দরিদ্র শ্রমিকদের বিরুদ্ধে চলে যান। ইউনিয়নের বক্তব্য, পাবলিশারদের আঘাত হানতে হলে, অতি দরিদ্রদেরও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। দাবি মিটে গেলে, আবার যেমন চলছিল, সে রকমই চলবে।

পাবলিশাররা ধীরে ধীরে ক্ষুব্ধতা প্রকাশ করছেন। বাঁধাই মালিক বলছেন, তিনি কী করবেন, ইউনিয়নের চাপ। পাবলিশাররা সত্যি সত্যি ঘা খেতে শুরু করেছে। এই মাসের শেষে শ্রমিকদের তিন দিন ধর্মঘট আর মালিকদের তিন দিন কাজ বন্ধে আরো কটা পাবলিশার ঘা খাবে, সেটা তখনই বোঝা যাবে।

সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে মাঝারি কারখানার ইউনিয়নের শ্রমিকরা এরকম একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছেন। মালিক বাইরে কাজ করিয়ে নিচ্ছেন কিনা এটা দেখার জন্যে পাঁচ ছ জনের একটা দল থাকে। শ্রমিকরা এক এক দিন কামাই করে এই দলটাকে সারাক্ষণ তৈরি রাখেন। বাঁধাইখানায় উল্টোপাল্টা একটু হাওয়া লেগেছে। খাতা বাঁধাই, পাঞ্চিং, বাক্স, লেবেল, খাম, ফাইল এসব কারখানায় ইউনিয়ন নেই। রুলিং কারখানায় আছে, কিন্তু তা পৃথক ইউনিয়ন।

এক দুজন শ্রমিক নিয়ে যে সব বই বাঁধাই কারখানার মালিক কাজ করেন, সেখানের শ্রমিক কোনো ইউনিয়নের নয়। শ্রমিকটির কোনো স্থায়িত্ব নেই। আজ আছে, কাল নেই। এ-সব কারখানার মালিকরা নিজের শ্রমের ওপরই প্রধানত নির্ভরশীল।

সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডের বই বাঁধাই কারখানা বিকেল পাঁচটায় বন্ধ হয়ে যায়।

ছোট কারখানাগুলি শুধু খোলা থাকে। ছোট কারখানার কোনো ভয় নেই, কিন্তু দরজা খুলে রেখে কাজ করার সাহসও নেই। অথচ নরেনকে রাত আটটা পর্যন্ত কাজ করতে হয়। তাই দরজাটা বন্ধ করে ভেতরে কাজ করে, বিকেল পাঁচটার পর থেকে রাত আটটা পর্যন্ত। ঘরে যে খিল দিয়ে দেয় তা নয়। দরজা আবজে দিয়ে বেশ আড়াল হয়ে ওঠে ঘরের ভেতরটা।

আর এই একা ঘরের ভেতর, শুধু মিতা আর নরেন থাকে। কাছাকাছি। হাতের ছোঁয়ায়। তারা প্রেমে আছে। মিতা যখন কাজের ফাঁকে অল্প যতির ভেতর নিজের বুকের দিকে একবার তাকিয়ে নেয়, সেই দৃষ্টি-নৈকট্যের নাড়ায় নরেন একবার মিতার দিকে তাকিয়ে নিতে পারে। মিতা এই দৃষ্টি-নৈকট্যের গ্রাহ্যতা তৈরি করে না যে তা নয়। মিতার মন সেই মুহূর্তে হযতো চেয়েছিল, নরেন তাকে একটু দেখুক। সেজন্যে সে নিজের বুকের দিকে তাকিয়ে নিয়ে ছল করে। সবই কি ছল? নরেন কি দেখে না অন্য ভাবে? একা দৃষ্টি তুলে? দেখে। এতে দেখাটা সংখ্যায় বাড়ে। আর-একবার দেখার অনুষ্ঠান তৈরি হয়।

এমন ভাবেই মিতা নরেনকে আকর্ষণ করতে চায়। একটু নড়ে চড়ে বসা, একটু কোলের দিকে কিছু খোঁজার ভান, একটু পাশ ফিরে আনমনা হওয়া, পোকা তাড়ানো, খোপা ভাঙা, খোপা বাঁধা, আঁচল বুকে জড়িয়ে নেয়া, বুকের দিকে চকিতে তাকানো। ঘরে তৃতীয় ব্যক্তি নেই, দরজা আবজানো, যেন এই পরিস্থিতির আঘাতে মুখ নত করে থাকার ভেতর নরেনের মুগ্ধদৃষ্টি তুলে নিতে চায়। অথবা এই দরজা আবজানো ঘরের কেউ একজন, যার নিভৃতির নিরাপত্তার ধারক আর-একজন, সেটা বোঝানো। অথবা প্রেমের সম্ভোগপুরুষও।

প্রেম নিবেদন একটা দুর্ঘটনার মত ঘটে। এই দুর্ঘটনার পর প্রেমে তাকানো, প্রেমের বিনিময় গড়া আরো কঠিন। প্রেমের বিনিময়ের অনুষ্ঠান রচার চাপও মনের ভেতর কঠিনতর হয়। প্রেম নিবেদন একটা কথার পিঠে কথা বলাতে ঠেকে যেতে পারে। তার গতিময়তা ভয়ংকর জিনিশ। একবার গতি পেলে সে গতি ঊর্ধ্বশ্বাসে এগোয়। না পেলে স্থির বদ্ধতায় পাথর হয়ে থাকে। তেমন যেন বদ্ধতায় আছে তারা। কথা এগোয় না, বলা এগোয় না, তাকানো দীর্ঘতর হয় না। কথায় বলায় তাকানোয় স্বচ্ছন্দ গতি আসে নি। অথচ প্রেম নিবেদন হয়ে গেছে। প্রেম নিবেদন হয়ে যাবার পরেই যে প্রেম গাঢ় হয়ে ওঠে তা নয়।

সত্যি, প্রেমের জন্যে বক্তব্য বলা হয়ে ওঠে না কেন? সত্যি, প্রেমের তাকানো গড়ে ওঠে না কেন?

নরেন হাতের কাজ শব্দ করে সরিয়ে রেখে সহসা নীরব বন্ধ মুহূর্তকে সরায় যেন শরীর জুড়ে নড়ে ওঠায়। 'ছাড়ো, একটু জিরোও। হয়েছে, হয়েছে, কতক্ষণ একটানা কাজ করছ! এস, দুজনেই জিরোই।'

মিতা হেসে ফেলে, বেমক্কা, প্রস্তুতিহীন। তার হাত থেকে ছুঁচ দূর্বার মত ঝরে পড়ে। কুসুমচয়নের মত মুখে তার হাসি আসে, চোখে হাসি আসে, হাতে হাতে, আঙুলে আঙুলে হাসি আসে। যেন সে এই কাজের কেউ নয়। যেন কোনো মেশিন থেকে একটা বল্টু খুলে নিয়ে আলাদা রাখলে, মেশিনের কেউ নয় বল্টুটা, তেমন রকম, শ্রমের সংযোগ ছিঁড়ে ফেললে মিতা নারীত্বের এক নিজস্বতা দীপ্তিময়তা পায়। প্রেমিকা, গৃহিণী, নারীর কমনীয়তা, সুখসংযোগের সম্পূর্ণতা পায়। তার শরীরের নরম ভাঙ্গ, হাতের স্নিগ্ধ লাবণ্য, চোখের সুশীতল ভিজে দৃষ্টি ফুটিয়ে তোলে আর এক নারীত্বের ভঙ্গিতে।

মিতা বলল, 'আপনার নিজের কাজ, আপনি নিজেই বাগড়া দিচ্ছেন।'

'মানুষ ত না কি? কত কাজ করবে? কাল করবে। আর আধ ঘণ্টা বাকি আটটা বাজতে। এস জিরিয়ে, কথা বলে কাটিয়ে দিই।'

'তা হলে ট্রেন ধরতে যাই?'

'সে কি?'

হেসে ফেলে মিতা। সে যে ট্রেন ধরতে চায় নি, কথা বলতে চেয়েছে, এই হাসিতে ধরা পড়ে যায় মিতা।

নরেন কথা বলতে চেয়েছে, কিন্তু কী কথা বলবে, একটা সমস্যায় পড়ে যায়। অনেক কথা বলবার আছে, কিন্তু কোনো কথাই খুঁজে পায় না। মিতা আঁচলটা সামনের দিকে একটু টেনে নিল। মিতাকে শুধু দেখল। কথা খুঁজে পেল না। মিতা তাঁতটাকে পাশে সরিয়ে দিয়ে পা দুটি সামনের দিকে মেলে ধরল। মিতার পা দুটি দেখল। কথা খুঁজে পেল না। মিতা চোখ তুলে নরেনকে দেখল। নরেন মিতাকে দেখল। কথা খুঁজে পেল না।

মিতা বলল 'কী দেখছেন?'

'তোমাকে।'

'কেন?'

'কেন বলতে পারব না।'

'আমাকে সত্যি আপনি ভালবাসেন?' এক লোভের বশবর্তী হয়ে কথাটা বলে বসে মিতা।

নরেন বলল 'আমাকে তোমার কেমন লাগে মিতা?'

'সে আপনিই জানেন।'

'বলই না।'

'সে কি আপনি বুঝতে পারেন না?'

নরেনের ভীষণ ইচ্ছে হয় মিতাকে ছোঁবার। মিতার পিঠে হাত রাখার ইচ্ছে হয়। মিতার মাথায় হাত রাখার ইচ্ছে হয়। মিতার কোলে মাথা দিয়ে শোয়ার ইচ্ছে হয়। মিতা যদি তার চুলগুলিতে তার নরম আঙুল দিয়ে বিলি কাটে, তা হলে তার ভাল লাগবে। মিতার গ্রীবা দু-হাতে ধরে যদি মিতার সারা মুখটা

নরেন বুকে গুঁজে নেয়, তা হলে তার ভাল লাগবে। মিতার নাক চোখ ছোঁবে নরেনের বুক। মিতার ভিজে ঠোঁট ছোঁবে নরেনের বুক।

নরেন বলল 'আমি কী বুঝি !'

'আমাকে কখনো দুঃখ দেবেন না ত !'

'কক্ষোনো না।' ঘষটে মিতার নিকটে চলে যায় নরেন। বাঁ হাত দিয়ে মিতার পিঠ ছোঁয় আবেগে। মুহূর্তের আবেগ। বড় সুন্দর। ডান হাত দিয়ে মিতার মাথা স্পর্শ করে নরেন। মিতার মুখ এমনিতেই সামনের দিকে নুয়ে আসে। নরেনের বুকের দিকে নেমে যায়। মিতার মুখ নিজের বুকের ওপর চেপে ধরে নরেন। মিতা নরেনের বুকে চোখ ঘষে, নাক ঘষে, ঠোঁট ঘষে. 'আপনি ভুলে যাবেন না আমারে ? আমার কেউ নাই।'

নরেন কোনো কথা বলে না।

তাদের চারপাশে ফর্মা বই মেশিন তত্তি, টুকিটাকি ইত্যাদি।

নরেনের বুকে মুখ গুঁজে সহসা বলে ওঠে মিতা 'আমারে ছাইড়া দেন, ছাইড়া দেন।' অথচ ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে না।

এই কথার আঘাতে মিতার মুখটা নরেন তার বুকে আরো জোরে চেপে ধরে। 'তোমাকে ছাড়ব না।'

নরেনের বুক থেকে সহসা মুখ তোলে মিতা। তারপর করতল দুটি ওপরে তুলে, করতলে নরেনের সারা মুখটা ধরে নরেনকে অপলক দেখে। দেখে। শুধুই দেখে। বিস্ময়ে। নরেনের এই ভালবাসার বিনিময়ে মিতার কত বড় মন লাগবে, এ ভাবনা তার আসে। প্রেমের পুরুষকে সে চোখ ভরে দেখে। তার দৃষ্টির পতন হতে দেয় না। ঝরে ঝরে পড়ে সময়ের কণাগুলি, দেখা ফুরোয় না। দেখে দেখে চেনার অতীত হয়ে যায়, তবুও দেখা ফুরোয় না।

সারা রাত ছটফট করে মিতা। পুলকে। নরেন তাকে ভালবেসে ফেলেছে। সেও নরেনের প্রেমে তলিয়ে যাচ্ছে। এই ভালবাসা তারা কী ভাবে রাখবে ? নরেন কি তাকে বিয়ে করবে ? নরেনের বউ আছে, মেয়ে আছে। নরেনের সংসারে বউ হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। নরেনের কারখানাতেই নরেন আর একটা সংসার পাতল। কিন্তু এটা কি হবার ? এরকমটা সে এখন আকাঙ্ক্ষা করে। প্রথমে চেয়েছিল, শুধু ভালবাসা। ভালবাসা ধরে রাখার আধার বোধ করে এখন। সে আকাঙ্ক্ষা ঘুনপোকার মত কুরে কুরে খেতে শুরু করে মিতার মনকে। সে আকাঙ্ক্ষার ভয়-অনিশ্চয়তার টানাপোড়েনের বুনুনিতে থাকে সে। নরেনের ভালবাসার তীব্রতার কথাটা কি সত্যি ? সত্যি তাকে এত ভালবাসে ? তা হলে ত তাকে কাছে ধরে রাখতে চাইবে। সেই কাছে রাখার ঘটনাটা ঘটবে কী রকম যুক্তিতে ? যে-কোনো অনুকূলতার জন্যে মনের যুক্তির অভাব হয় না, বাস্তবের ঘটনার অভাব হয়। বাস্তবেরও একটা যুক্তি আছে। তার কাছে অনেক সময় অসহায় হয়ে পড়তে হয়।

অসহায় কি নয় মিতা? তার শ্বশুর দেওর জা ছেলে আছে। তার জীবন ঘিরে একটা প্রাচীর আছে। তার মন মানুক আর নাই মানুক আছেই। আর মন ত এই বাস্তবের চাপেই দ্বন্দ্বমথিত হয়, তাকে একেবারেই সরিয়ে রাখতে পারে না। পারে না সমাজ সংস্কারকে। নরেনকে যে সমাজ সংসার বাধা দিচ্ছে, তার কী দরকার ঠেলে বেরিয়ে আসার? তার নিজস্ব সংসার গৃহ বউ সন্তান আছে। প্রেমটা তার বাড়তি পাওনা। সে কেন এই অশান্তি মেনে নেবে?

মিতা নিজে কি পারবে নরেনের সঙ্গে সংসার গড়ে তুলতে? তার জন্যে তাকে কি অনেক বাধার পাহাড় ভাঙতে হবে না? রাতের অন্ধকারই তার কাছে বাধা হয়ে ওঠে। নিজের সত্তার অবরোধ করে এই অন্ধকার। নিকটের আবেষ্টনীতেই ছটফট করে। অত বড় অবরোধ ভাঙবে কী করে? তার দিপু, তারই দিপু। স্মৃতি ভাঙছে, স্মৃতির ভবিষ্যতের পূর্বনির্দিষ্টতা ভাঙবে কী ভাবে? অধুনার গতানুগতিকতার অবিকল্প জীবন? জীবনের স্বাভাবিকতা প্রত্যাশা, সমাজ সংসারে অন্য রূপ। নিজের মনে, দেহের কাছে অন্য রূপ। সে না হয় নিজের বাইরের অবরোধ ভাঙল, ভাঙতেই চায়, নরেন কি ভাঙবে? এই সংশয়ে মন প্রাণ এই আকুলতার বিন্দুকে কেন্দ্র করবে? মিতা কিছুই জানে না। জানে না। কিছুই না। না। নরেনের মন বোঝে নি। নরেনের মনের রহস্যের কাছে সে পৌঁছয় নি। অথচ মন পেয়েছে। মানুষের মনের কত রকম আছে? নরেনের মন জানতে পাবে, সম্পূর্ণ করে জানতে পারে না। নরেনের মনের ওপর অধিকার বসায়, কিন্তু সবখানি মনের জায়গা দখল করতে পারে না।

তারা বিয়ে করবে কিনা, সংসার করবে কিনা এটা নিয়ে অস্পষ্টতার এক জায়গা এসে গেছে। প্রেমে ত অনেকটা রহস্যই থাকে। এই রহস্যের ভেতরেই সমর্পিত হতে হবে তাদের। ভবিষ্যতের নির্দিষ্টতা তৈরি না করতে পারলেও, ভবিষ্যত তাদের কাছে এগিয়ে আসবে। প্রেমের ভেতর ভবিষ্যত তাদের সঙ্গে সঙ্গে যাবে। ভবিষ্যতের অন্য বাস্তবতা তৈরি হবে তাদের সম্পর্কে।

কিন্তু মন যে মানে না। মন যে বড় সংশয়সঙ্কুল। এই সময়ের অনিশ্চয়তার ভাবনার ব্যথা প্রেমের ভয়ানক আর্তির অস্থিরতা, একা অন্ধকারের নিঃসঙ্গতা তাকে সইতেই হবে। তার কোনো বিকল্প হয় না। যখন শরীরের ভেতর মন শিথিল হয়ে শরীরকে ধরে রাখতে পারবে না, তখনই ঘুমিয়ে পড়বে মিতা। তার আগে কখনো নয়। তার আগে কখনোই ঘুমতে পারছে না মিতা। তার ঘুম আসে না। বিছানায় জেগে শুয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ছটফট করে ভাবনায়। প্রেমিকার হৃস্ব মন নিয়ে বৃহৎ প্রেমকে ধরবার যেন সে এই বেদনা তৈরি করে, মনের অনুদীর্ঘতা নিজেই বানায়। মানুষের মনই ত নিজের দুঃখ নিজে বানায়। নিজের আনন্দিতে থাকা নিজে বানায়। মিতাও দুঃখ-বিরহে থাকার ভাব নিজের মনে বানায়। একা একা একা। বিন্দু বিন্দু সময় বিঁধতে থাকে রাতের গায়ে।

আচম্বিতে উঠে বসে বিছানায়। পা দুটো সে বিছানায় বিছিয়ে রাখে। দেয়ালের অন্ধকারের দিকে তাকায়। সয় না। অসহ্য। মন উচাটন। পারবে না নরেনকে ছেড়ে থাকতে। নরেনের জীবনের ভেতর থাককে চায়। নরেনের বাহুদুটির মধ্যে ধরা পড়তে চায়। নরেনের বুকের মধ্যে ধরা পড়তে চায়। নরেনের বুকে মুখ ঘষতে চায়। নরেনের বুকে ঠোঁট ঘষতে চায়। নরেনের বুকে চোখ ঘষতে চায়। নরেনকে ছাড়তে পারবে না। নরেন ছাড়া থাকতে পারবে না। নরেন ছাড়া সে থাকবে কী করে ?

রাত ঝম ঝম করে তার গায়ে বাজে। পাথরের মত তার আঘাত। সারা শরীরে অসহ্য মোচড় দিচ্ছে। অতীতে কি এত প্রেম অনুভব করেছিল ? তার স্বামীকে কি এত ভালবেসেছিল ? সে ত দাম্পত্যের প্রেম। তার মধ্যে এক শান্ত ভাব থাকে। এ প্রেম, প্রেম, এর প্রচন্ডতা অসহনীয়, উদ্দাম। শরীর পুড়ে যাচ্ছে মিতার। বুকে দ্রিম দ্রিম বাজছে। নিজের বুককেই নিজে শান্ত করাতে পারে না। জল। পিপাসায় গলা শুকিয়ে আছে। ঝটিতি নীচে নামে মিত। আলোটার শিখা বাড়াল না। অন্ধকারেই কলসি গেলাস হাতড়ায়। কলসি গেলাস ইত্যাদি জিনিশে পা লেগে অদ্ভুত এক বিশৃঙ্খলতা তৈরি হয়। রাতের নীরবতার ভেতর শব্দ ওঠে। দেয়ালে লাগে সে শব্দ। এক দেয়াল থেকে আর-এক দেয়ালে ফিরে যায় সে শব্দ। সে শব্দমালা কানে অনেকক্ষণ ধরে বাজে।

জল খায়। কিন্তু তবুও তৃষ্ণা মেটে না। তবুও সে শান্ত হতে পারে না। মনের থেকে শরীর খুলে খুলে পড়ে। কোমর থেকে আঁচল মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। আচলটা তুলে দু হাতে ধরে রাখে। শরীরের তাপ সইতে না পেরে আঁচল স্খলিত হয়েছে। এক চোরের মত জেগে উঠেছে মিতা। গা পুড়ে যায়। চৈতন্য পুড়ে যায়। মিষ্টি শব্দে মনের পোকা গোল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে মাথার ভেতর।

রাত কত হল ? জানে না মিতা। বিছানার মাথার দিকে যায়। বালিশের তলা থেকে ছোট হাতঘড়িটা বের করে আনে। দেয়ালের পেরেকে আটকানো চিমনির কমা আলো বাড়িয়ে সময় দেখে মিতা। তিনটে দশ। তার মানে আর কিছুক্ষণ পরেই সকাল হয়ে যাবে। কিন্তু আর কিছুক্ষণ কাটবে কী করে ? এই এক ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা ? শরীরে বড় আগুন। মনে বড় অস্থিরতা। সময় কাটে না। কখন নরেনকে দেখবে ? কখন নরেনের কাছে থাকবে ? এই সময়টুকু কাটবে কী ভাবে ?

বন্ধ দরজায় এসে মুখ চেপে ধরে মিতা। সে খিল না খুলে দরজাটাকে ঠেলা দিয়ে ভাঙতে চাইছে। দরজায় মুখ ঠেকিয়ে যেন সে কেঁদে ফেলতে চায়। মনে মনে কাঁদে। গোঙায়। প্রেমবিধুরতায়। প্রেম অপূরণের সংশয়ে। সংশয়ের বাধা ভাঙবার সংকল্পের প্রতিক্রিয়ায়। লুটিয়ে পড়তে পারে না মাটিতে।

স্বামী বিয়োগের সময় যেমন কেঁদেছিল, তেমন করে কাঁদতে পারে না। সে কান্না ছিল হারিয়ে ফেলার বেদনার অথচ। এ কান্না, পেয়ে ধরে রাখবার কান্না, এতে অনেক বেশি আবেগও সত্য থাকে, কিন্তু ভীষণ কেঁদে উঠতে পারে না। শরীরের চাপে পুড়ে পুড়ে যাচ্ছে। খোলা স্তনদুটি তার দরজার পাল্লায় ভেঙে পড়ে। চেপে রেখে বুক থেকে স্তন দুটির ভেঙে যাওয়া ঠেকায়। স্ক্রু, পেরেকের ওপর সে দুটিকে রাখে। বড় তাপ। শরীর থেকে যৌবন কেন ছিঁড়ে রাখা যায় না? মন থেকে শরীর যৌবন কেন ছিঁড়ে ফেলা যায় না?

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে মিতা অন্ধকার রাতের নীল নরম ম্লান আলোয়। নারকেল গাছটা বাঁকা হয়ে ওপরের দিকে উঠে গেছে। পেঁপে গাছটা বুকে ফল নিয়ে নীরব জায়মান হয়ে আছে। অল্প আলোর আকাশে দু-চারটি তারারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিন্দু বিন্দু হয়ে আছে। এসবের মধ্যে এসে দাঁড়ায় মিতা। কেউ কোথাও নেই। শুধু রাত সঙ্গে আছে। হালকা বাতাস গায়ে লাগে, কিন্তু শরীরের তাপ নামে না। স্নিগ্ধ হাওয়া লেগে আরো বেড়ে যায়। আরো মুচড়ে ওঠে মন। আকাশ তারাদের কাছে এই বিশালতায় এলে নিজস্ব ছোটটুকু জীবনাকাঙ্ক্ষা তার অস্তিত্বে আরো বেশি জেগে ওঠে। সে কিছু আর চায় না, নরেনকে চায়। কিন্তু নরেনকে পাবে কী করে? নরেন কি তাকে এত ভাবে? নরেন কি তার জন্যে এত ব্যাকুল হয়? সে জানে না। কিছুই জানে না। শরীরের তাপ তার থামে না। ভাবনার আঘাতে আরো বেড়ে যায়। সে কি ভাববে না? পাথরের মত ঘুমিয়ে থাকতে পারত যদি? সে ঘুমিয়ে পড়ে না কেন? সে জেগে উঠতে চায় বলে।

পথ নেমে এসেছে সে পুকুরের কাছে। আহা, শীতল জলের কাছে। তৃষ্ণার্তের মত। গাঢ় সবুজ রঙের কাছে। যার ভেতর আকাশটা ছবি হয়ে নীচে নেমে যায়। চাঁদ থাকলে, নীচের থেকে চাঁদ উঁকি দেয়। তারারা ক্রমশ তলিয়ে যেতে থাকবে। প্রখর রোদ্দুর সে আলোর বিন্দুর নরম স্বাদ জানে না। চোখ দেখে দেখে মরে যায় সে দৃশ্যের মায়ায়।

জলের কাছে যায় মিতা। পাথরের একটা বড় টুকরো আর কিছু ইট দিয়ে বাঁধা একটু ঘাট। পায়ের চাপে পাথর নড়লে জলে তরঙ্গ ছড়ায়, জলের নীরবতা ভাঙে তাতে।

জলে নেমে পড়ে মিতা একেবারে। কোমর পর্যন্ত নেমে যায়। সহসাই নেমে পড়েছে। কোনো প্রস্তুতি ছিল না। আরো একটু নামলে বুক পর্যন্ত ডুবে যায় মিতার। পায়ে কাদা নয়, ছাইয়ের স্পর্শ। জলে আকাশের ছবি হারিয়ে গেছে। সেই আকাশ নক্ষত্র ছায়াপথ যেন সে গায়ে মেখে নিয়েছে মিতা। তারপর গলা পর্যন্ত ডোবায় শরীর। কিন্তু তবুও দাহ কমে না যে। মাথার ভেতর অসংখ্য দপদপানি থামে না যে। চুল এলিয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে জল কেটে কেটে নীচে নামতে থাকে। আঁচল নেমে জলের তলায় ডুবতে থাকে।

নিঃশব্দে জলের ভেতর ডোবে মিতা। জল থেকে মুখ তুলে আবার ডোবে। জলের ভেতর শ্বাস আটকে একটু মৃত্যু ও জীবনের তফাৎ নেয়। জলে ডোবে ওঠে। আহ্! শান্তি। শীতলতায় ভরে ভরে উঠছে। একটু একটু করে শরীর ঠান্ডা হয়। মাথার ভেতর স্নিগ্ধতা এসে জমে। মন যেন শান্তির ভেতর শায়িত হতে চায়। জল থেকে উঠতে ইচ্ছে করছে না।

এক সময় কাঁপুনি পেতে শুরু করে মিতা। ঠান্ডায় কাঁপছে। এই দাহের পর বিপরীত এক অনুভূতি। চিতায় জল দিলে যেমন শীতল হয়ে ওঠে চিতাকাঠ, তেমন, তেমন রকম শীতলতায় ভরে ওরে মিতা। ঘাট থেকে উঠে আসে মিতা।

পেঁপে গাছের তলায় এসে দাঁড়ালে, চোখে পড়ে আলো। বিন্দুর ঘরের একটা দরজার পাল্লা ফাঁক হয়ে আছে। তার ফাঁক দিয়ে ঘরের আলো উঠোন-তলায় পড়েছে। সেটাকে সন্তর্পণে মাড়িয়ে সে যায়। উঠোনে উঠে জল নিঙড়োতে নিঙড়োতে আরো কাঁপতে থাকে মিতা। এই কাঁপুনিও পারে বিপরীত দাহের ব্যথা দিতে। উঠোনে শাড়িটা শুকোতে দেয় তারের ওপর। এবার ঘরের ভেতর এসে, আলোয় ঘড়ি দেখে। সাড়ে চারটে বাজে। একটু সকালের আভা এবার ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। একটু পরেই বেরিয়ে যাবে সে। আরো এক ঘণ্টা বাকি। পাঁচটা পঞ্চাশের লোকাল ধরবে। আটটার মধ্যে তাকে পৌঁছতে হবে। তা পৌঁছে যায়। শীতলতা পেয়ে মনটা একটু শান্তি পায় মিতার।

ওদিকে বিন্দু সাংসারিকতার শব্দ তুলেছে। সারাটা দিনকে নিজের অস্তিত্ব দিয়ে ধরবে, তার পূর্বপ্রস্তুতিতে যাচ্ছে বিন্দু।

মিতার ঘুম আসে। একটু যদি ঘুমোয়, ঘুমবে। শান্তি পাবে। ঘুম জড়িয়ে আসে চোখ জুড়ে। চোখ দুটি পাথরের মত ভারী হয়ে উঠেছে। বিন্দুর ঘটি-বাটির শব্দ ছত্রখান বিপুল হয়ে ঘুমের ভেতর এলেও, একটু কুসুমদলের মত নরেনের 'প্রিয়স্য সন্নিকর্শোহপি' নরেন নিকটতর হয়ে থাকে। তার হাস্য, ঘুমের শরীর মনের হাস্যতায় আছে, শয়নের বাইরে নেই। আনন্দিতের মধুরতা, শয়নে দৃশ্যমান ওষ্ঠে নেই, ঘুমের ভেতর, চৈতন্যের ওষ্ঠে আছে। এই ঘুমের ভেতর সে ভাল থাকে। আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন তৈরি করতে পারে। স্বপ্নের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে। চঞ্চল প্রজাপতি হাতে ধরা না দিয়ে চলে গেলে, সেই প্রজাপতিই স্বপ্নে হাতে এসে বসে। তার রঙ গলিয়ে বুকের ওপর ঢেলে দেয়।

শ্রমিক ইউনিয়নের তিনদিনের বন্ধের আজ প্রথম দিন। সময় দুপুর। বই বাঁধাই কারখানা সব বন্ধ। শ্রমিকরা জটলা করছে এদিকে ওদিকে। কখনো তারা দলবদ্ধ হয়ে কারখানা কারখানা টহল দিচ্ছে। কোথাও কোনো কারখানায়

গোপনে কাজ হচ্ছে কিনা ? এ গলি থেকে ও গলি দুপদাপ তারা হেঁটে যায়। ইউনিয়নের নেতারা তাঁদের নিয়ে মিটিংও করেন। তাঁদের ইউনিয়ন অফিসও আছে। কালী সোম স্ট্রিটে, কাটিং মেশিনের ছুরিতে শান দেবার ঘরটার পাশে, দোতলায়। বিপজ্জনক সিঁড়ি। অভ্যাস না থাকলে ও সিঁড়ি দিয়ে সোজা ওঠা যায় না।

বড় ও মাঝারি কারখানাগুলো সব বন্ধ হয়েছে। সিজিনের সময়, সব কাজ বন্ধ। এই বন্ধে বাঁধাই মালিক ব্যবসায়ী সমিতিরও মনে মনে সহযোগিতা আছে। পাবলিশারদের বোঝানো, এই রেটে কাজ করা সম্ভব নয়। আর শ্রমিকদের দলবদ্ধতার পাশাপাশি, বাঁধাই মালিকরাও অদ্ভুতভাবে সংগঠিত হচ্ছেন। শ্রমিকদের সংগঠিত হবার স্বভাবের সঙ্গে মিশে যায় অদ্ভুত। তাঁরাও এক জায়গায় দলবদ্ধভাবে আলাপ-আলোচনা করছেন।

ছোট কারখানার তেমন অস্তিত্বই নেই। দু-চার জন যে ছোট কারখানায় কাজ করেন, সে কারখানাও বন্ধ। শুধু মালিক একাই যে কারখানায় কাজ করেন, সে কথা আলাদা. তিনি কাজ করবেন কিনা, না বসে থাকবেন, তাঁকে নিজের সঙ্গেই বোঝাপড়া করতে হয়। তিনি কাজ করতেই চাইবেন। সিজিনের সময়। খাটলে খেতে পান, তাঁর না কাজ করলে চলেই না। তিনি কারখানায় খিল এঁটে কাজ করেন। তিনি ঘুমিয়ে আছেন না কাজ করছেন, বাইরে থেকে বোঝা যায় না। আর এটা ত একটা গৃহ। এ-রকম ছোট ঘরের মালিক বউ বাচ্চা হাঁড়িকুঁড়ি থালাবাসন নিয়ে সংসার-সহ কারখানা যথাস্থিত রাখেন। তাঁরা কাজ করবেন কি করবেন না, দাম্পত্যের রাগ-অনুরাগের স্বভাব জড়িত হয়ে পড়ে। বাইরের বাধা, বাধা হয়ে আসে না। কারখানায়, গৃহে থালাটা ঝন ঝন করে পড়ে গেলে, বাইরের কেউ এসে তুলে রাখে না ঠিক জায়গায়। এই রকম, তাদের কারখানা আর দাম্পত্যগৃহ মেশামেশি।

সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে যা কাজ হয়, তার চেয়ে অনুপাতে বেশি শ্রমিক। সিজিনে বেশি কাজ হয়। সিজিনে প্রত্যেকে কাজ পেয়ে যান। সারাক্ষণই ভাসমান শ্রমিকরা ঘুরে বেড়ান। সিজিনে তাঁদের কাজ হয়। এঁদের মধ্যে ষাট শতাংশ মহিলা শ্রমিক আছেন। দশ-শতাংশ শিশু শ্রমিক, যারা ভাসমান। কুড়ি শতাংশ পুরুষ শ্রমিক। তাঁরা আরো দরিদ্র শ্রমিক। এই ধর্মঘটে তাঁদের অবস্থা আরো করুণ হয়। শুকনো মুখে ঘুরে বেড়ায়। কাজহীন। ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহ হয় না। তাঁদের কোনো দাবি নেই, পূরণেরও কোনো পথ নেই।

শ্রমিক ইউনিয়নের বন্ধের প্রথম দিন। বাঁধাই মালিকরা মাইক নিয়ে দপ্তরিপাড়ায় মোড়ে মোড়ে পথসভা করতে থাকেন। সকালে একবার পথসভা করে এসেছেন পাবলিশার পাড়ায়, কফি হাউসের সামনে।

এখন আঠার নম্বর পাটোয়ার বাগানের গলির সামনে পথসভা করছেন। মালিকরাই বলছেন। একজন বক্তৃতা শেস করলে আর একজন বক্তৃতা ধরলে

একই কথা বলেন। একই কথা তাঁরা বলেন। একই কথা মালিকরা সংগঠিত হয়ে বলছেন কিনা, এই বলিয়ে নেয়া যেন। শপথবাক্য পাঠ করাবার মত।

'বন্ধুগণ, এটা একটা আন্দোলন। শ্রমিকভাইরা আপনারা যাঁরা কাজ করেন, আমাদের আন্দোলনের সঙ্গে আপনাদেরও সামিল হতে হবে। পাবলিশাররা বেট বাড়াচ্ছেন না, এই আন্দোলন চালাতে হলে শ্রমিক মালিক হাতে হাত দিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আন্দোলনটা শুধু পাবলিশারদের বিরুদ্ধেই নয়, সরকারের বিরুদ্ধেও। আপনারা হয়তো জানেন না, আমরা সরকারের যে-সব বইয়ের কাজ পেতাম, তার আশি শতাংশ কাজ সরকার তুলে নিয়েছে। আপনারা হেড কারিগর থেকে বয় পর্যন্ত একশো টাকা মাইনের দাবি করেছেন, আমরা পঞ্চাশ টাকা মাইনে বাড়াতে পারি, তার বেশি পারি না। আপনারা পনের দিনের গ্র্যাচুইটি চেয়েছেন, আমরা দশ দিনের দিই। বাধাই শিল্প এখন একটা রুগ্ন শিল্প। যতদিন না পর্যন্ত সরকার আর পাবলিশাররা দয়া না করছেন, ততদিন পর্যন্ত আমরা ধুঁকতে থাকব। আন্দোলন আমরা করছি, শ্রমিকভাইরা, আপনারা পাশে আসুন।'

আর এক মালিক মাইকের সামনে যান। তিনিও এই কথাগুলিই বলেন। ২৩, ২৪, ২৫ এপ্রিল এই তিন দিন মালিকরা বাঁধাই কারখানায় ধর্মঘট ডাকছেন।

নরেনের এসবে কিছু এসে যায় না। সে এসব আন্দোলনের কেউ নয়। তার বসলে চলে না। কাজ করলে তবে সে খেতে পায়! আর তারই কারখানা, সে নিজেই শ্রমিক। তাকে কাজের ভেতরে থাকতেই হয়। আর তার থাকাটা আরো সুতীব্র হয়, কারখানায় কাজের মধ্যে থাকার ভেতর, মিতার সঙ্গে প্রেম-সম্পর্কে থাকবে। এই তীব্রতাকে বাঁধ দিয়ে আটকানো যায় না। খিল দিয়ে ওরা ঘরের ভেতর কাজ করছে। একা ঘরে দুজন। এমন নিরাপদ সম্পর্ক সময় আর কখনো হতে পারে না। দুপুর গুন গুন করছে বাইরে।

নরেন হাই তোলে।

নরেনকে চোখ তুলে দেখে মিতা। 'একটু শুয়ে পড়েন না কেন?'

'কোথায় শোব?'

একটু মেশিনের দিকে সরে যায় মিতা। 'এই ত আমার ডান দিকে মাথা রেখে শুয়ে পড়ুন।'

নরেন মিতার ডান পাশে, ডান কোমরের পাশে মাথা রেখে চিৎ হয়ে শোয়। পা দুটি সম্পূর্ণ মেলতে পারে না। চোখ তুলে মিতাকে দেখে।

মিতা কাজ করে চলে জলের গতির মত স্বাভাবিকতায়। মিতার কোমর ছোঁয় নরেনের মাথা।

ঝড় বইছে মিতার শরীরে। 'মাথায় ত কিছুই দিলেন না।' বলে ভয়ংকর ভাবে নরেনের মাথাটা ধরে নিজের কোলের ওপর তুলে নেয় মিতা। এই কাজ

সে কোনো সম্মতি না নিয়েই করে। আত্মপক্ষ সমর্থনও করে না। নরেন ঘুমতে পারে না। মিতার কোলে মাথা দিয়ে মিতার মুখ দেখে। চিবুক কণ্ঠা বুক দেখে।

আর ঐ অবস্থায় মিতা তেমন কাজও করে যায়।

বিন্দু বিন্দু সময় পতন হয়ে যাচ্ছে। নীরবতায়।

মিতার হাতের ছুঁচ শিথিল হয়ে পড়ে। তীব্র সহসায় নরেনের মুখের দিকে তাকায়। আরো তীব্র সহসায় নরেনের মুখের ওপর নিজের মুখ নামিয়ে দেয় মিতা। নরেনের মুখে মুখ ঘষতে থাকে ব্যাকুল বিধুরতায়। ঠোঁটের ওপর ঠোঁট চেপে ধরে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ায়। চোখের ওপর ঠোঁট ঘষে। এই উদ্যোগের ঘায়ে নরেন এলিয়ে পড়ে থাকে, মিতার উদ্যোগের হাতেই ধরা পড়ে, নিজে স্থির থাকে। মিতা নরেনের মুখের ওপর মুখ নিয়ে স্পর্শিত হয়। দাঁতে সূক্ষ্ম আঘাত ও আঁচড় বয়ে বেড়ায়। 'আমার সোনাকে পেয়েছি, সোনাকে পেয়েছি।' অনুচ্চ কণ্ঠে শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে মিশিয়ে কথা কটি বলে মিতা। দরজায় শব্দ। মিতার মুখ উঠে যায়। লাফিয়ে মাথা তোলে নরেন মিতার কোল থেকে।

মিতা আঁচল তুলে নেয় বুকের ওপর। ছুঁচটা খুঁজেও পায় না। অস্থিরতায় ছুঁচ খুঁজতে থাকে। কঠিন সংকটের মুখে পড়ে যেন।

ততক্ষণে নরেন উঠে গেছে দরজার কাছে।

মিতা ছুঁচ পায়। যেন বাঁচে। ফর্দা সেলাই করে। কিন্তু মুখের ওপর রক্ত আভা মুছতে পারে না।

নরেন দরজা একটু ফাঁক করে দেখে বিমল। দরজা সম্পূর্ণ খুলে বলে 'আয়, আয়, হামলা হতে পারে। ঢুকে পড়।'

বিমল ঘরের ভেতর ঢুকে একটা এলোমেলো গন্ধ পায়। একটা গোপনতার হাতছানি পায়, কিন্তু তাকে যথার্থ সত্য করে তুলতে পারে না। কারণ মিতা সেলাই করছে, সেলাই করার মতই। নরেন কাজ ফেলেই উঠে গেছে।

এই কাজ করতে করতে প্রেমমিলনে যাবার একটা বাস্তবতা পায় তারা। কাজের বাস্তবতাই ধারণ করে প্রেমমিলনে যাবার।

বিমল এসে বসে।

নরেন যেন গভীর মনে এতক্ষণ কাজ করছিল। যেন কাজের গভীরতা শরীরেই সারাক্ষণ বয়, লুকিয়ে থাকে, যে কোনো মুহূর্তেই তার কাছে চলে যেতে পারে, বের করে আনতে পারে সেই শ্রমমগ্নতা।

বিমল একটা বিড়ি ধরায়।

মিতার মুখে রক্ত আভা কি নেই? আছে। সারাক্ষণই একবিন্দু হলেও ত থাকে। বাঁধাই পাড়ায় বিমল কাজ করে, এই যৌবনবতী স্বামীহীন মেয়েদের মুখে একটু হলেও রক্তরঙ ছড়িয়ে পড়া নিয়ে তারা থাকে। আর দু-চারজন

পুরুষের পাশাপাশি থাকার সংশ্লেষে এমন রঙ তার মুখে পেয়ে থাকে। এবং তাদের ভাল লাগে। এবং তারা চায় না। না পেলেও তৈরি করে। তৈরি করারও ত তারা সুখ পায়। কোনো পুরুষ যে তার মুখে মুখ ডুবিয়ে দেবার সম্পর্ক দিচ্ছে সেই প্রতিক্রিয়ার সে রঙ, তা নয়। এমনিতে পাশাপাশি থাকার ভেতর তারা এই রঙ পায়। তার মুখে মুখ ঘষার নিকট ঘটনার আড়ালটা অতিদূর গোপনই থেকে যায়, নিকট রক্ত-আভা প্রতিদিনের সাধারণের স্বাভাবিকতা এবং স্বভাবধর্মের বাস্তবতায় এসে মিশে গেলে, মিতার আর কোনো গাঢ় কলঙ্কবোধের ইঙ্গিতময়তা থাকবে না এই রঙ প্রকাশে। এ নিয়ে বিমল গভীর কিছু ভাববে না।

'ঝামেলা হয়েছিল নাকি যে খিল এঁটেছিলি?' বিমল তাকায় নরেনের দিকে।

হাতের কাজ রাখে নরেন। 'না ঝামেলা হয় নি। করলে কি বাধা দিতে পারব?'

'হুম।'

'চা খাবি ত?'

মিতা উঠে দাঁড়ায়। গেলাসটা পাশ থেকে তুলে নিয়ে দরজা খুলে তুমুল শব্দে বেরিয়ে গেল বাইরে। চা আনতে।

'কার কাজ করছিস?'

'ঐ সেই বাবুর।'

'মেয়েটা সারাক্ষণই তোর সাথে কাজ করে নাকি?'

'করেই ত। একজন সাথে না থাকলে কী করে সামলাব বল? বাচ্চাটাও সটকেসে। আর আসে নি। মেয়েটা খুবই ইয়ে আর কি।'

'ওভারটাইম করছিস পেমেন্ট ত পড়ে যাচ্ছে অনেক।'

'তেমন মাল বেরচ্ছে তাড়াতাড়ি।'

'এত রাতে বাড়ি যায় মেয়েটা—ঘরে কে আছে ওর? দেখে ত মনে হয় বিধবা।'

'না, এমনিতে স্বভাবচরিত্তির ভাল। খুবই ভাল।'

'এত ভাল ভাল করিস না —কে কেমন আট দশ দিনে কি বোঝা যায়?'

নরেন কাঁচিটা তুলে নেয় হাতে। 'তা যায় না।'

'তুই একা ছেলে, মেয়ে নিয়ে কাজ করা ঠিক নয়। সাবধানের মার নেই। আর একজন ছেলে কর্মচারী থাকলে, এ-কথা উঠত না।'

কাঁচি দিয়ে ফালতু কাগজ কাটে নরেন ঘ্যাঁচ করে। 'ভাল বলেছিস।'

'ভালর জন্যেই বলা।'

বিমলের একরোখা স্বভাব। খুবই তার বন্ধু। কিছুটা বিমল কঠিন স্বভাবের। বিষয়ী, এবং সংসারী। সাত পাঁচ চিন্তা ভাবনা করে। 'ঘরে কাজ আছে ত দেখছি।'

'তা আছে।' কাজের কথায় স্বস্তি পায় নরেন।

'তা হলে আর একটা ছোট ঘর ভাড়া কর না—গোডাউন করতে পারবি। কাজ পাচ্ছিস যখন সামাল দিবি কি করে? এ কারখানায় ত আর জায়গা নেই।'

ভাল কথা বলেছে ত বিমল। আর একখানা ঘর হলে ভাল হয়। বড় বড় পাবলিশারদের কাজ ধরেছে। আরো দু-চারজন কর্মচারীও রাখা যায়। মিতা মজুরি না নিয়ে সাহায্য করছে বলে মাল ডেলিভারি দিতে পারছে। বোর্ড কিনতেই বেশি পয়সা লাগে। ডেলিভারি দিলেই যে পার্টি সঙ্গে সঙ্গে পয়সা দেয় এমন নয়। একটা রাখে একটা দেয়। এ রকম দুটো কাজের পয়সা পেয়ে গেছে। হাতে হাজার বারো শো টাকা জমেছে। এটা মিতা না সাহায্য করলে হত না। একটা কাজ শেষ করতে পাঁচ দিন লাগত, সেখানে দু-তিন দিনে শেষ করতে পেরেছে, আটটা পর্যন্ত ওভারটাইম করে। একটা মাল পেমেণ্ট না নিয়ে পরেরটা করতে পারার ধাক্কা সামলাতে পেরেছে মিতার জন্যেই। মিতাকে দশ-বিশ টাকা দিতে গেলেও কাজে ঘাটা পড়ে যেত। মিতার পাওনা হয়ে গেছে দুশো দশ টাকা। মিতাকে চেনে না বিমল। বিমল কিছুই জানে না। বিমলের কিছুই জানার দরকারও নেই।

'দেখিস ত একখানা ছোট ঘর।' নরেন বন্ধুত্বের সম্পর্কের স্পর্শ আবেগ দিয়ে বিমলের হাঁটু ছোঁয়। 'তুই ভাল মনে করিয়ে দিয়েছিস।'

'দেখচি।'

বিমলের হাত চেপে ধরে নরেন।

গরম গেলাসে আঁচল জড়িয়ে চা নিয়ে ঢোকে মিতা। হাতে দুটো ছোট ভাঁড়।

বিমল বলল 'হটপ্রেসের কাজ কোথায় করছিস?'

'পাঁচুদার কাছ থেকে করিয়ে নিচ্ছি।'

'একটা হটপ্রেস লাগবে, প্যাচেমেশিন লাগবে। এখন পাঁচু দিচ্ছে পরে নাও দিতে পারে, ব্যবসায় রেষারেষি বলে কথা আছে।'

মিতা চা বাড়িয়ে দেয়।

নরেন এক পলক তাকায় মিতার দিকে। মিতা কেমন নিষ্প্রভ। কিন্তু গোপন প্রভায় জেগে আছে, এটা বুঝতে পারে। কেমন নীরব হয়ে আছে। কেমন কর্মচারী কর্মচারী নির্জনতা এসেছে মিতার স্বভাবে। এবং সেই মালিন্যের স্তব্ধতার ভেতর গভীর উচ্ছলতা দেখতে পায় নরেন। দেখতে পায় স্বর্ণঔজ্জ্বল্যে মুখর। গেলাসের তলায় একটু চা দু-চুমুক দিয়ে শেষ করে আবার কাজে বসে গেছে। কাজের ব্যাপারে মিতার যত্ন অপরিসীম। এই মেয়েটির আঁচলে কোনো সংসারের ঘ্রাণ লেগে নেই। ভ্রম হতে পারে। মনে হতেই পারে ঘাট থেকে ফিরে আঁচলে ভিজে হাত মুছেছে। শিশুকে স্নান

করিয়ে ভিজে মাথা মুছেছে আঁচলে। তরকারি-কোটা হাত আঁচলে ঘষে গেছে। শিলনোড়ায় উপুড় হয়ে মসলা বাটতে গিয়ে আঁচলটা শরীরে বেড় দিয়ে কোমরে খুসেছিল, সেটা খুলে রেখেছে একটু আগে। নরেন তার বউয়ের সাংসারিকতার স্বভাবের সঙ্গে ভ্রম মিলিয়ে ফেলে। সেই ভ্রমকে সত্যের ক্রম ভেবে ভেবে মিতাকে সংসারে নিত্যমুহূর্তে সংস্থাপিত করে ফেলে। সেই ভাবনার ভেতর অবয়বকল্প মিতা অতি সুন্দর হয়ে ওঠে। তার আঁচল সংসারের ঘ্রাণে ঘ্রাণে ভরে ওঠে।

নরেন কাজে বসে যায়।

'না চললাম।' বিমল উঠে দাঁড়ায়। মিতার মুখ গুঁজে কাজ করার ভঙ্গির দিকে তাকায় একবার। বিমল দরজার খিল খুললে, উঠে দাড়ায় নরেন। বিমল বেরিয়ে যায়, একটু অপেক্ষা করে নরেন দরজায় খিল আঁটে।

আর দরজায় খিল আঁটার পর ঘরের ভেতরটা অসম্ভব গাঢ় হয়ে ওঠে। মিতার উজ্জ্বলতা প্রকাশ পায়। মিতা যে কাজের মধ্যে কর্মসম্পদের ভারে নমিত হয়ে আছে, এই ভঙ্গির আর-এক সত্য নরেনকে বড় প্রেমদান করে। মিতা কাজের মধ্যে কম সুন্দর হয় নাকি? শ্রমসঙ্গের এই বিনিময়ের প্রেম-সংযোগ বড় মধুর, বড় প্রীতিপূর্ণ সম্পর্কের আস্বাদন। না বসে, একটু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিতাকে দেখে নরেন। নত আনন। চোখ নামানো। ছবির নরমে চোখের নত কমনীয়তা। মিতাকে বড় ভাল লাগে তার। এতদিন যেন মরে ছিল। প্রেমে যেন এক বাঁচার জাগরণ তৈরি হয়েছে তার। সুখের এক উপলব্ধি অনুভব করে সে। একটু ভাল রোজগারের মুখ দেখতে পাবে। খাওয়াপরার সুখের হাতছানির সঙ্গে যুক্ত হয় জীবনের আকাঙ্ক্ষা, যা কুঁড়িকলির মত গোপনে মরেছিল বুকের ভেতর। দিন যাপনের কষ্টে ও গ্লানিতে এক-ঘেয়েমিতে যা সে মলিন করেছিল, নিশ্চিহ্ন করেছিল। সে কি মিতাকে বিয়ে করতে চায়? কী ভাবে? তা হয় না। সে কি সংসারের সুখের সঙ্গে জীবনের আকাঙ্ক্ষায় পেতে চায় মিতাকে? তা হয় না। সে শুধু ভালবাসতে চায় মিতাকে। ভালবাসা পেতে চায় মিতার। এই ভালবাসা তার জীবনের বড় পাওনা নয় কেন? বড়ই ত? তা হলে কি সে তার বউ শ্যামলীকে ভালবাসে না? বাসে। কিন্তু এমন প্রেমে ভালবাসে না কেন? এমন প্রেম অনুভব করে না কেন? এমন প্রেম বোধহয় জীবনে চেয়েছিল নরেন। আজ পাওয়ার জাগরণ তার। আজ প্রেমের উজ্জীবন তার। এমন একজন ভালবাসার নারী বাসনা করেছিল বুঝি। শ্যামলীর সঙ্গে তার প্রেম-সন্তাপের যাপন। মিতা তার প্রেমযাপনের জাগরণ এনে দেয়। মিতাকে কিছুতেই মন প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। মন প্রত্যাখ্যান করার ভাবনা ভাবে, কিন্তু প্রত্যাখ্যান করতে পারে না।

কাজে বসে নরেন।

এই বন্ধ কেন দিল? কারখানায় খিল এঁটে মিতার এত কাছাকাছি থাকার ভেতর সে অতটা প্রেমানুভূতি পেত না। আর মিতার মুখে মুখ ডুবিয়ে দিতে

পারত না। একটা ঘটনা, সম্পর্কের বড় বাঁক নেয়ায়। মুহূর্তের একটা সংলাপ, জীবনের অনেক ঘটনাকে নির্দেশ করতে পারে। যদি না ঘর বন্ধ থাকত, এই ঘটনা ও সংলাপ এত দ্রুততায় তাদের ঠেলে দিতে পারত? নরেন ভুল করলে বলতে পারবে না কেন ভুল করছে। নরেন নিজেকে নিরস্ত করার ভাবনা করলেও নিজে কেন নিরস্ত হতে পারবে না বলতে পারবে না। সে যেন কোনো যাদুকরের হাতে চলে গেছে। তার নিবুদ্ধিতা বুদ্ধির খোঁজে যুক্তির। তার সব বুদ্ধি অযৌক্তিক করে দিতে চায়। সে প্রেমে থাকতে চেয়েছে, সে কি দোষের? তা হলে, তার সংসারে প্রেম ছিল না? ছিল, হয়তো এমন করে নাগালে পায় নি নরেন। এমন করে খুঁজে পায় নি। এই খুঁজে পাবার নাগালের প্রেম তার জীবন চেয়েছে। তার জীবন প্রেমিক হতে চেয়েছে আয়নার মুখ দেখার মত স্পষ্টতায়। শরীরের প্রতিটি বিন্দুতে তার অনুভূতি জাগ্রত থাকে।

'একটা নতুন জামা বানান না কেন? পার্টির বাড়ি যেতে হয়।' কাজ করতে করতে নিচু হয়েই কথাটা বলে মিতা।

নত রাখা মুখ দেখে নরেন। 'চলে যাচ্ছে ত।'

'ভাল জামাকাপড় পড়লে কত ভাল দেখায় আপনাকে।' মিতার মুখে সেই রক্তরঙ।

'তোমাকে দেখতে বুঝি খারাপ?'

এবার হেসে ফেলে মিতা। 'ধ্যাৎ। আমাকে দেখতে মোটেই ভাল না।'

'তুমি কি নিজেকে দেখতে পাও?'

মিতার হাত থেকে কাজ স্খলিত হয়। স্থির চোখে নরেনকে দেখে মিতা। অপলক। জীবনে প্রতিটি মুহূর্তের বিন্দুতে বিন্দুতে পাবার জীবনাকাঙ্ক্ষায় তোলপাড় হয় মিতা। মিতা, নরেনের জীবনে বধূ হয়ে থাকতে চায়, কাজের সঙ্গী হয়ে থাকতে চায়। এই আলোড়ন তার ইচ্ছায় এসে তার হৃদয়কে তোলপাড় করে। এই সত্যকে খুঁজে পায়, এই সত্যের সম্ভাবনাকে পায় না। কেঁপে কেঁপে যায়, তার ভাবনা। নরেনের প্রতি তার প্রেমবোধ তীব্র হয়। ভয়ানক রকম তার আবেগ তাকে কাঁপায়।

আরিচা ঘাটে পদ্মার বুকে হাওয়ায় আঁচল লেগে মুখে আঁচল চেপে কান্নার আকুলতায়, দৈন্যের আকীর্ণতার ঘায়ে একেবারে নিষ্প্রেম, নির্জীব, ভঙ্গুর এক দুঃখী নারী বৈ কিছু আর নিজেকে ভাবতে পেরেছিল না। ভবিষ্যতের সাধ ও জীবনকে ঘিরে আকাঙ্ক্ষা, ভবিষ্যতের জন্যে এক ফোঁটা রাখে নি তখন। তখন মন ছিল নিঃশোষিত। এখনের মুহূর্ত দিয়ে আরিচা ঘাটের স্টিমারে, পদ্মার বুকের উদ্বেলিত নিঃস্বতার কান্নার জীবন সত্য হয় না। তা হলে এটা প্রেম না হয়ে অন্য কিছু হত। পদ্মার বুকে উদ্দাম হাওয়ায় আঁচল জুড়ে কান্না আকুল মুখ ছোঁয়ার ঘটনা দুঃস্বপ্নের মত। দুঃস্বপ্ন স্বামী ঘর সংসার, দাম্পত্য। ফেলে-আসা দেশ রাষ্ট্র ও জীবন স্বপ্নে শান্তি দেয় না বলে ওসব দুঃস্বপ্ন। হাজারটা

পদ্মা থাকলে, স্টিমারে ঐ সময়ে পদ্মার বুকে প্রবল হাওয়ায় আঁচল উড়ে কান্নার মুখ ঢেকে যাবে, প্রতিটা হাজার যাবে। একটা পদ্মার বুকে কান্না হলেও যা, হাজারটা পদ্মার বুকের কান্নাও, এখন তা, দুঃস্বপ্ন। এখনের প্রেমের কাছে অসত্য। এখনকার প্রেমের জীবন তার স্মৃতিহীন, দুঃস্বপ্নহীন। জীবনে থাকার জাগরণে প্রতিটি মুহূর্তে রক্তে মনে বেঁচে ওঠা। স্মৃতির পাথর নিঃস্বতাকে ভরিয়ে তোলার জন্যে দরকার হয়। এখন মিতা নিঃস্ব নয়।

সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে কখন গোধূলি হয়েছে, তারা জানে না। তাদের জানার কথাও নয়। কারণ তাদের জীবন এই গহ্বরপ্রতিম অন্ধকারতায় জীবিকার উদয়াস্ত শ্রমনিবিড়তায় নির্দিষ্ট। না দেখা থাকে, কখন সন্ধ্যা ম্লান হয়, কখন অন্ধকার গাঢ় হয়ে ওঠে,—না জানাটা অসত্য নয়।

শ্যামলী রাত থেকেই বায়না ধরেছিল একখানা শাড়ি কেনার। আটপৌরে শাড়ি। আটপৌরে শাড়ি যে ছিঁড়ে গেছে, এটা ঠিক। আর চলছিল না। আর কদিন ধরে কিনে নিয়ে যাই যাই করে কিনে নিয়ে যাওয়া আর হয় নি নরেনের, শেষ পর্যন্ত। শ্যামলীকে এ-ব্যাপারে যে দুঃখ দিতে চেয়েছে, তা নয়, সহসা এমন উদ্দেশ্যবিহীন শ্যামলীকে আঘাত দিতে চায় নি নরেন। অথচ শ্যামলী আহত হবার মত যথেষ্ট কারণ রয়েছে। যে শাড়ি সংসারের চাল আটা নুন তেলের মত দৈনন্দিন, তাকে ভুলে যাওয়া নরেনের পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত কাজ। শ্যামলীর শাড়ি কেনার যে টাকা নেই তা নয়। কাজের ঝামেলায় ভুলে যায়। এই ভুলে যাওয়াটা ঠিক নয়। যখন মনে পড়ে, ফেরার সময়। রাতে শাড়ি কিনতে চায় না নরেন। সংসারী মানুষ, কিছু কিছু ব্যাপারে ঠকে যাওয়ায়, সে সে ব্যাপারে হিশেবিও। রাতে, আলোয় শাড়ির রঙ চেনা মুশকিল। ঠকে যাওয়ার ভয়ে ফেরার পথে কেনে না। পরের দিন কিনবে বলে ন-দিন পেরিয়ে যায়। শ্যামলীকে আর রোখা যায় না। ভোরে শ্যামলীকে টাকা দিতে যায়, শ্যামলী নেয় নি। বারাসাতের দোকান গলা কাটবে। মেয়ে রীণাকে মালতীদের কাছে রেখে এসে নরেনের সঙ্গে একরোখা স্বভাবে বেরিয়ে আসে শ্যামলী। সে নিজে সঙ্গে যাবে। নরেন তাকে শেয়ালদা বাজারের দোকান থেকে কিনে দেবে, শ্যামলী শাড়ি নিয়ে তবে বাড়ি ফিরবে।

শ্যামলীর এই জোরের স্বভাবটা প্রতিদিন একই রকম নয়। হঠাৎই এমনটা একরোখা হয়ে উঠেছে শ্যামলী। শ্যামলীকে তার পেছু পেছু বেরিয়ে আসতে দেখে মনে মনে হেসেছিল নরেন। তার নিজের গাফিলতি বুঝতে পেরেছিল। শ্যামলীর এই পেছু পেছু শাড়ি কিনতে আসাটাকে কৌতুকের সঙ্গে সমর্থন করে নরেন, এবং দিন দিন গাফিলতির গ্লানির হাত থেকে বাঁচার স্বস্তিও পাচ্ছিল। শেয়ালদায়, শাড়ি কিনে, ট্রেনে চড়িয়ে দিলে, নরেন দায়মুক্ত হবে। শাড়ি না হলে একদম চলছে না শ্যামলীর।

সংসার থেকে শ্যামলী করে আর বেরতে পায় ? পেয়েছে কি কখনো ? কম পয়সার রোজগারে সে সাধ আহ্লাদ শ্যামলীর কখনো পূরণ করে নি নরেন। আর শ্যামলীও চেয়ে বসে নি। এখন নরেন একটু ভাল রোজগার করছে, শ্যামলীর এই নরেনের সঙ্গে চলে আসাটা যুক্তিসংগত মনে হয়, নরেনের।

আজও নির্ঘাৎ ভুলে যেত, শ্যামলীর শাড়ি কেনা হত না। শেয়ালদা স্টেশনে নেমেই ঘোরের মধ্যে ছুটত। কারণ একটা ছোট ঘর যাট টাকায় ভাড়া নিয়েছে নরেন। সে ঘরটায় ফর্মা রেখে গোডাউন করবে। কারখানা থেকে ঘরটা একটু তফাতে। বেশ তফাতে। তা হোক, ফর্মা রাখার জায়গা বাড়লে মন্দ কি ? ঘরটাতে ফর্মা ভরার উত্তেজনায়, আজও ভুলে যেত শ্যামলীর শাড়ি কেনার কথা। শ্যামলী সঙ্গে এসেছে, বেশ হয়েছে।

ট্রেন থেকে নেমে ভিড় কেটে এগিয়ে যায় নরেন, শ্যামলীও কেমন তার পেছু পেছু গায়ের কাছে এঁটে থাকে এক ঘনিষ্ঠতায়। স্ত্রীত্বের এক নিবিড়তা তৈরি হয় শ্যামলীর মনে, স্বভাবে। প্রতিদিনের ঘরের চেনার সঙ্গে, বহু মানুষের ভিড়ের মুখে শ্যামলীকে চেনা ও তার ঘনিষ্ঠতার সম্পর্কবোধ নতুনতর হয়ে ওঠে তার চোখে। তার বউ কি না। এটা শ্যামলীর অধিকারের প্রশ্ন। শ্যামলীর অধিকারের জোরটা যে আগে দেখতে পেয়েছে তা নয়। নিহিতে ছিল বোঝা যায়। আর ভিড়ের মধ্যে পড়ে ভীষণ রকম স্বভাবগুণ প্রকাশ হয়ে পড়ছে। ভিড়ের মধ্যে নরেন শ্যামলীর কাছ থেকে হারিয়ে যেতে পারে, হারিয়ে না যায়, শ্যামলীর এতই ঘনিষ্ঠতা বাড়ে, এবং শ্যামলী নিজেই তৈরি করে, নরেনকে চমকে দেবার মত। নরেন ত শ্যামলীকে নিয়ে তেমন কোথাও বেরয় নি। নরেন ত কলকাতায় কখনো নিয়ে আসে নি। শ্যামলী যে কলকাতায় আসে নি, তা নয়। পাড়ার বউদের সঙ্গে ঠাকুর দেখতে, এটা-ওটা কেনা-কাটা করতে এসেছে। এই প্রথম শ্যামলী শেয়ালদা স্টেশনে, কলকাতার পথে প্রথম নরেনের সঙ্গে। শ্যামলীর চোখে-মুখে কি সুখের একটা আভা এসে পড়েছে। নরেন ব্যবসায়ে উন্নতি করছে, দুটো বেশি পয়সার মুখ দেখছে সেই আভার চমক বোধ হয় শ্যামলীর মুখে ও মনে পড়েছে। শ্যামলীকে দেখে নরেন। ফিরে ফিরে দেখে। এবং নতুন রকম মনে হয়।

পেছন থেকে বাঁ-হাতটা চেপে ধরে শ্যামলী। যেন জীবন দিয়ে নরেনকে আঁকড়াতে চায়, এই আকুলতার স্পর্শ পায় নরেন, শ্যামলীর। শ্যামলী যেন তাকে নতুন করে ভালবেসে ফেলছে। এই ভালবাসার স্বর ও গন্ধ শ্যামলীর নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে। যত ভিড়ের মধ্যে তারা হাঁটে, ততই শ্যামলী ঘনিষ্ঠ হয়। কখনো চিবুক গেঁথে যায় নরেনের পিঠে, শ্যামলীর। শ্যামলী শুধু হাত দিয়ে তাকে যেন ধরে না, জীবন দিয়ে ধরে। অপ্রত্যাশিত পাওয়ার চমকে চমকে ভরে ওঠে নরেন। নরেনের বউ ত সে। তাদের দাম্পত্যে যে প্রেম নেই, তা নয়। তা অপ্রকাশই থাকে। তা লুকিয়ে থাকে।

এই দাম্পত্যপ্রেম ছিঁড়ে নেব বললে ছিঁড়ে নেয়া যায় না।

ফ্লাইওভারের তলায়, শাড়ির দোকানে শাড়ি পছন্দ করে শ্যামলী। নরেনও শ্যামলীকে পছন্দ করাতে সাহায্য করে। শ্যামলীর পছন্দের এত রকম, এত বৈচিত্র্য আছে, শ্যামলীর সঙ্গে শাড়ি কিনতে না এলে জানতেই পারত না। শ্যামলীর ঠোঁটের ওপর হালকা একটা তৃপ্তি এবং অনুরাগ উঠে এসেছে। শ্যামলী যে শাড়িটা পরে এসেছে, এমন কিছু বাহারিও নয়। শ্যামলীর কোনো বাহারি শাড়িও নেই। একটা তোলা শাড়িই সম্বল, সেটাই পরে এসেছে। সেটাও বহুদিনে একবার পরে বলে, তাতেই তাকে মানায়, তাতেই সে যথেষ্ট নতুনতর হয়ে উঠতে পারে। বাইরে বেরবার ফলে, শ্যামলী চুলটা একটু গুছিয়েছে। মুখটা একটু তকতকে করেছে। হয়তো মুখে কিছু একটা মেখেছে নিশ্চয়। একদিন, কখন, দুর্ঘটনার মত বাইরে বেরবার সম্ভাব্যতা জেনে রেখে, একটু ক্রিম সযত্নে রেখে দিয়েছিল শ্যামলী। মিষ্টি একটা গন্ধ পায় শ্যামলীর গা থেকে।

ষাট টাকা দিয়ে একটা শাড়ি কিনল শ্যামলী। বাইরে বেরিয়ে এসে শ্যামলীকে নিয়ে সিঙ্গাড়া চা খায় ফুটের দোকানের বেঞ্চে পাশাপাশি বসে। শ্যামলী এমন রকম খাবার ইচ্ছেতে ছিল, তার বসা ও খাওয়ার তৃপ্তির মধ্যে খুঁজে পায় নরেন। নরেন ঘড়ি দেখে, আটটা কুড়ি বেজে গেছে। মিতার কাছে চাবি আছে, মিতা কাজে বসে গেছে, অপেক্ষা করে আছে নরেনের, মিতা। নরেনের জন্যে কাজও অপেক্ষা করে আছে। কম চঞ্চল মুখর কলকাতা।

চা খাওয়া হয়ে যেতে, শ্যামলীর কোমরে খুঁসে রাখা একটা ছোট্ট রুমাল বের করে মুখ মোছে শ্যামলী।

নরেন বলল 'চল, তোমার টিকিট কেটে, তোমাকে ট্রেনে বসিয়ে দিয়ে আসি।'

'বা, এত কাছে এসে, কারখানা না দেখে তোমার চলে যাব?' শ্যামলীর মুখে লোভের এক অদ্ভুত হাসি।

'যাবে? আজকেই? অন্য দিন না-হয় সময় করে এসে সারাদিন থাকবে। আজ গোডাউন নিচ্ছি, মেলা কাজ।'

'তোমার কাজে কি বাগড়া দেব? আমি একাই ফিরে যেতে পারব। আর আমি ত হাতে সময় নিয়েই এসেছি।'

'হাতে সময় নিয়ে এসেছ?'

'হ্যাঁ, বীণাকে সারাদিনের জন্যে মালতীর কাছে রেখে এসেছি।'

'আসার সময় ত বললে না?'

'তখন বলি নি, এখন বলছি।'

এখন এই বলাটা কতখানি শ্যামলী নরেনকে বিপাকে ফেলতে পারে, সে নরেনই বুঝতে পারে। এক মহিলা তার কারখানায় কাজ করছে, এটা শ্যামলীকে জানানো হয় নি। শ্যামলী এখন গিয়ে দেখলে, নরেনকে সন্দেহ করতে পারে।

শ্যামলী যে এই সন্দেহটা করবে, এটা স্থির নয়, কিন্তু মিতার সঙ্গে গোপন ঘন সম্পর্কের অপরাধ নরেনকে দুর্বল করে তুলেছে। শ্যামলীকে নিরস্ত করতে চায়, কিন্তু শ্যামলীকে ঠেকানো নরেনের কর্ম নয়, নরেন বোঝে। নরেন বোঝে শ্যামলীর দাম্পত্য-ভালবাসার তীব্রতা অনেকখানি। সেখানে শ্যামলীকে নিরস্ত করাও মূর্খামি।

দর্জিপাড়ায় শ্যামলীকে নিয়ে ঢুকতে, কেমন স্খলিত হয়ে পড়ে নরেন শরীরে ও মনে। এই স্খলন হয়তো মানসিকভাবে টের পায় শ্যামলী। নিজের অপরাধ ও দুর্বলতার ভেতর নরেন যেন ভেঙে-চুরে খান খান হয়ে যাচ্ছে। এখানে, অপ্রস্তুত না এলেই পারত শ্যামলী। কিন্তু শ্যামলীকে ঠেকানোর ভাষা নেই নরেনের, সম্পর্ক নেই নরেনের, যুক্তিও নেই নরেনের।

কারখানার দরজা দিয়ে ঢুকে যায় নরেন। মিতা কাজ করছিল, মুখ তুলে দেখল নরেনকে। শ্যামলা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। নরেন পেছন ফেরে 'কি হল, ঢোকো।'

'এটা তোমার কারখানা নাকি?'

নারীকণ্ঠ ও ঘনিষ্ঠ-সম্পর্কের স্বর শুনে মিতা কেঁপে উঠল মনে মনে, এবং মনের ওপর এক সতর্কতা আনল।

'এটাই ত।'

'কারখানা খোলা যে—' ঘরে ঢুকে মিতার দিকে চোখ যায় শ্যামলীর।

'মিতাদি আগে আগে এসে কাজ করবে বলে মিতাদির কাছে চাবি ছিল।'

'তোমার কাছে ত একজন বয় ছিল?'

'সে ভেগেছে।'

'ইনি কি তোমার কারখানায় কাজ করেন?'

মুখ নাড়িয়ে হ্যাঁ জানায় নরেন, যেন অনেক কিছুই শ্যামলীকে জানানো বাকি আছে, সে-রকম এটাও।

'আমাকে ত বল নি ইনি কাজ করেন তোমার কাছে?'

'বলার সময় আর পেলাম কোথা?' নরেন জামা খুলছে।

শ্যামলী কারখানার ভেতর অনভ্যস্ত স্বভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। তার নিজেকে কারখানার অভ্যন্তরটা অপর লাগে। তক্তি টেনে যে তার ওপর বসতে হয়, এটা জানে না। তাই দাঁড়িয়ে থাকে। আর মিতাকে দেখে। মিতার চোখে কাজল, কপালে টিপ। চুল সাজগোজ করে বাঁধা। পরিচ্ছন্ন সুন্দর শাড়ি। মাথায় কাঁটা। নখে নখপালিশ। এই দেখে শ্যামলীর এমন হিংসে হয়, এবং কষ্ট হয়। তড়িতাহত হয়। কিছুটা নীরব হয়ে পড়ে। যতটা উচ্ছল ছিল, ততটাই নীরব হয়ে পড়ে শ্যামলী। শ্যামলী কারখানার কী জানে? নরেনের কর্মক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ তার ঘটেছে। সে এইটুকু বুঝেছে, নরেনের কারখানায় মিতা যে কাজ করে, পাশাপাশি বসে, তৃতীয় ব্যক্তি কেউ থাকে না,

এটা তার মনে পীড়া দেবার পক্ষে যথেষ্ট, এবং মন নিয়ে যথেষ্ট টানাটুনি চলতে পারে।

নরেন একটা তক্তি বাড়িয়ে দেয় শ্যামলীকে। 'বোস।'

শ্যামলী সন্ধ্যা নামার মত নীরবে বসে পড়ে। অনধিকার প্রবেশের চাপ এসে লেগেছে শ্যামলার মনে। মিতা যেন খাড়ার মত অন্তরের ওপর ঝুলতে থাকে।

'মিতাদি, আমি যাচ্ছি গোডাউনে। ওখানে সব ফর্মা চালান করব।' পাশ ফেরে, শ্যামলীর দিকে তাকিয়ে 'তুমি বোস।' শ্যামলীর সঙ্গে আর কী কথা বলবে ভেবে পায় না নরেন। সেই থমকে থাকা অবস্থায় দ্রুত বেরিয়ে পড়ে নরেন। বিমলকে এখানে পাঠিয়ে দেবার দরকার।

শ্যামলীর কোলের ওপর শাড়ির প্যাকেট। নিজেকে যেন দেখল শ্যামলী, কোলের দিকে তাকিয়ে থেকে মিতাকে দেখে।

মিতা যেন ঝড়ের মুখে পড়েছে। নরেনের বউ একেবারে হেলাফেলা দেখতে নয়। নরেনের বউয়ের জিজ্ঞাসা ও বিস্ময়ে অতি দীন হয়ে পড়ে মিতা। মিতা ছোট হয়ে পড়ে। আঘাতে ছিঁড়ে-খুঁড়ে যায়। কিন্তু তাকে শান্ত অবিচল থাকতে হবে, এই কসরৎ সে করে যায়। সে ত সব হারিয়েছে, এখন ত সব নতুন করে পাবে। তার অশান্ত হলে চলে না।

'আপনি কদ্দিন কাজ করছেন?'

'এই ত কিছুদিন।' মিতা কাজ ফেলে সখ্য হতে চায় নরেনের বউয়ের।

'বাড়িতে কে কে আছে?'

'স্বামী ছাড়া সকলেই আছে।' নরেনকে বলতে চেয়েছিল তার কেউ নেই। নরেনের বউকে বলছে, স্বামী নেই, তা ছাড়া সকলেই আছে।

'আপনার স্বামী'—

'ক্যান্সারে মরে গেছে।'

বুকটা কেমন নরম হয়ে ওঠে শ্যামলীর। আহা বিধবা। ভেবেছিল কোনো সধবা মেয়ে তার স্বামীর ঘরে কাজ করে। বিধবা বলে একটা মমতা গড়ে ওঠে শ্যামলীর মনে। কিন্তু তবুও, মেয়েমানুষ তার স্বামীর ঘরে কাজ করে, এই বেদনা মুছে যায় না শ্যামলীর মন থেকে।

'ছেলে-মেয়ে আছে?'

'একটা ছেলে আছে।' কাজের ভঙ্গি থেকে সরে বসে, আলাপচারিতার ভঙ্গিতে বসে মিতা।

'আপনার কপাল দুঃখে ভরেছে দিদি।' এক করুণা ঝরে পড়ে শ্যামলীর নারী অন্তর থেকে।

এই করুণার স্বরকে মিতা ভয় পায় অথচ। এই করুণাকে বাধা দিতে চায় মিতার অন্তর। কিন্তু নরেনের বউয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা পাবার জন্যে এটা সে মেনে নেয়। নরেনের বউ তাকে সান্তনা দেয় ভাগ্য দেখিয়ে। এই ভাগ্য সে

মানে না। মানে না পূর্বজীবন, ভবিষ্যতের পূর্ব নির্দেশকে। সে ভালবাসে নরেনকে। নরেনকে ভালবাসায় আঁকড়ে ধরতে চায় প্রাণপণ।

বিমল ঘরে ঢোকে। 'এই যে বৌদি আপনি এসেছেন?' সারামুখ হেসে ওঠে শ্যামলীর। 'দাদা!'

বিমলের হাতে শালপাতায় গোটা কয়েক কচুরি। বাড়িয়ে দেয় শ্যামলীর দিকে 'খান।'

'একটু আগেই ত খেয়েছি।'

'আরে খান খান।'

এই ফাঁকে মিতা কাজে বসে যায়। কাজে ঢুকে যাবার উপযুক্ততা পায় মিতা। এখানে তার কিছু করার নেই, অংশগ্রহণও নেই।

ঠোঙাটা হাতে ধরে প্রসন্ন মুখে শ্যামলী তাকিয়ে থাকে বিমলের দিকে। 'আপনার ভাই কোথা?'

'গোডাউনে।'

'আপনিই ত ঘর খুঁজে দিয়েছেন।'

'ঐ আর কি।'

'খেটে খেটে শরীরও করেছে যা,—রাতে ফিরে খেতেও পারে না তেমন।'

'ব্যবসা দাঁড় করাতে গেলে এখনো অনেক পরিশ্রম করতে হবে।'

'দিদি কেমন আছে?'

'ঐ রকম।'

'আপনি সেই কবে গিয়েছিলেন, অনেকদিন যান নি, দিদিকে নিয়ে একদিন আসতে হবে।'

'যাব।'

'কালীপুজোর সময় যাবেন?'

'সে যাওয়া যাবে।'

'না, কথা দিতে হবে।'

নরেন ঢোকে। ফর্মার স্তূপের দিকে যায়।

বিমল উঠে নরেনের পাশে দাঁড়ায়। নরেনের মাথায় তিনটে ফর্মা তুলে দেয়। নরেন মাথায় ফর্মা নিয়ে নীরবে বেরিয়ে যায়।

গোডাউনে যাচ্ছে মাল। জায়গা বাড়বে। দু-চারজন কাজের লোকও বসাতে পারবে নরেন। ব্যবসায় নরেন উন্নতি করবে, এই ভাবনায়, এই সম্ভাবনার কথা ভেবে মিতার খুব ভাল লাগে। এই ভাললাগা মিতার মনের ভেতরই গোপন হয়ে থাকে। অপ্রকাশ রাখে। অথচ এই নিরুচ্চার অপ্রকাশ নিজের এই অপাঙ্‌ক্তেয় পরিচয়ে থাকার সময়গুলো বর্শার মত বিঁধতে থাকে মিতাকে। বিন্দু বিন্দু অসহ্য সময় বয়। কেন এত ভাল বেসেছিল? ভালবাসা তার জীবন। না বেসে পারবে না। নরেনকে হারাতে পারবে না। নরেনের দিকে

তাকাতেও পারছে না। এদের কাছে সে অধিকার পায় না মিতা। নরেনের কাছে ত পায়? পায়। সেই ভাবনায় ভাল থাকে। নরেন ফর্মা নিতে ঘরে ঢোকে, মিতা মুখ না তুলে দেবার ইচ্ছে পিষতে থাকে নিজের মনে। বিমল আর নরেনের বউ গল্প করে যায়। ওদের আলাপচারিতায় যাওয়ার তার অধিকার নেই। এরা সত্য, কিন্তু মিতার বেঁচে থাকার কাছে বাস্তব নয়। নরেনের কাছে কাজ করার, পাশাপাশি ঘনসম্পর্কে থাকার বিনিময়েই মিতার জীবনের বাস্তবতা। সেখানে এক অধিকার জন্মে গেছে মিতার। সেখানে বিমল আর নরেনের বউ নেই।

কত কথা বলে বিমল আর নরেনের বউ। তাদের পারিবারিক বন্ধুতার সূত্রে তারা কত সহজ করে কথা বলতে পারে।

ফর্মা সব চলে গেছে। নরেন এসে বালতি থেকে মগ ডুবিয়ে জল নিয়ে দরজার বাইরে হাত ধোয়। হাত ধুয়ে এসে দড়ি থেকে গামছা পেড়ে নেয়।

বিমল নরেনের দিকে তাকায়। 'গোডাউনে চাবি দিয়ে এলি?'

পাশ ফিরে তাকায় নরেন। 'হ্যাঁ।'

'দিদিকে, ওখানে কাজে বসাতে দিবি ত।'

'ওখানে?' হাত দুটিতে এক অস্বস্তি আসে নরেনের। ভাবে নি কখনো।

'হ্যাঁ। সেলাই ভাঁজাইটা ওখানেই করাবি।'

'সেটা কি ঠিক হবে?'

'সেটাই ঠিক হবে।' শ্যামলী বলে।

শ্যামলীকে পাশ ফিরে দেখে নরেন। এরা কি কিছু সন্দেহ করেছে? তা না করুক, ঘর নেবার যৌক্তিকতায় এটা স্বাভাবিক ভাবেই বলতে পারে।

মিতা পাথর হয়ে যায়। শরীরের ভেতর হাতুড়ি পেটায় কে যেন গা ঝম ঝম করে ওঠে। তার কি যাওয়া সম্ভব হবে অন্য ঘরে কাজ করতে? প্রাণ থাকতে সইতে পারবে, নরেনকে ছেড়ে অন্য ঘরে কাজ করতে! ওরা এমন নিষ্ঠুর ব্যবস্থার কথা বলছে কেন? বেদনায় সারা শরীর হু হু করে ওঠে মিতার। সে পারবে না। নরেনকে ছেড়ে অন্য ঘরে কাজ করতে পারবে না। নরেনের ঘরে কি সে শুধু কাজ করে? নরেনের সঙ্গে থাকার আনন্দে কাজ করে।

বিমল 'আপনি ও ঘরে বসবেন।'

'যেখানে বসতে বলবেন, সেখানেই বসব।' নিজের ইচ্ছেকে লুকোয় মিতা। নিষ্ঠুর ব্যবস্থার হাতে কব্জা হয়ে নীরবে ছটফট করে।

'সেটা আপনারও ভাল হবে।' বিমল বলল।

মিতার নিন্দে-মন্দ হতে পারে, এই ভেবে কথাটা বলল বিমল।

বিমল কী জানে? ভেতরে ভেতরে হু হু করে মিতা। 'আমার অন্য ঘরে যেতে কি আর অসুবিধে।'

নিজের ব্যাগটা টেনে হাতে তুলে নেয় মিতা। ছুঁচ নেয়, সুতো নেয়।

শাড়িটা নেয়। তার এই নেবার ভঙ্গির মধ্যে যথেষ্ট প্রতিবাদ আছে, কিন্তু সতর্কতাও আছে। যেটুকু চুঁইয়ে পড়ে, তা কম প্রতিবাদ নয়। এটা সে ইচ্ছে ক'রে করে না। প্রকাশ হয়ে পড়ে স্বতই। কেন সে যাবে? তার যাওয়া কি উচিত? সে যেতে পারবে না, তবু তাকে যেতে হবে। সে যদি না যায়? না গিয়েও তার কোনো উপায় নেই। মিতার সমস্ত অস্তিত্ব ভেঙে পড়তে চায়। বিমল ও নরেনের বউ এসে যেন তাকে উচ্ছেদ দিচ্ছে। বিমল আর নরেনের বউয়ের যে সামাজিক অধিকার আছে, তা নেই মিতার। এই উচ্ছেদে কি নরেনের সমর্থন আছে? এই উচ্ছেদ ঠেকাবার অধিকারী নাও নরেন। নরেন এই ব্যবস্থা মেনে নেবার কেউ। ব্যবস্থাপকও একজন। নরেনকে দিয়েই এই উচ্ছেদ করায়। মিতা সেটা নীরবে মেনে নিচ্ছে। মুহূর্তে কত অসহায় হয়ে পড়ে মিতা। নরেন ও তার সম্পর্কের মধুরতার ভেতর এক সন্ত্রাস। যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা যায় না, মেনে নেয়া যায়। সে যদি কোনো পাড়াপড়শী পেত, যাকে মনের কথা বলা যায়, তার কাছে শোক জানাত সে। বলত, তার ছেলে মরে যেত, তা হলে এত শোক অনুভব করত না। মানুষের মনে দুঃখ শোক এলে এমন কথাই তার মনে হয়।

দরজার বাইরে জিনিশপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মিতা। হয়তো টলে পড়ে যেতে পারে। নিজেকে সামলায়। নিজের শরীর সামলায়। কিন্তু মন গুছোতে পারে না। বিস্রস্ত হয়ে যায়। এলোমেলো। সেখানে প্রবল ঝড় ঝাপটা মারছে। মন যে বড় ভাঙাচোরা, ভেঙে পড়তে চায়। মন যে বড় অসহায়, সম্বলটুকু আঁকড়ে ধরতে চায়। এমনটা হল কেন? এমন নির্বাসিন সে পেতে পারে না। নরেনকে ছেড়ে থাকবে কী করে সে? থাকা যায় না, এটা কাকে বোঝাবে? নরেন কি কিছু একটা করতে পারে না? করলে ত নরেন সেখানে প্রকাশ হয়ে পড়বে। নরেনের সঙ্গে তার গোপন সম্পর্কের কথা লোকে ভাববে। ভাববে বিমল। নরেনের বউ জানতে পারলে ঝাঁটা মেরে তাড়াবে। নরেনের বউয়ের ঝাঁটার ঘা দু-হাত বাড়িয়ে আঘাত সামলাবে, কিন্তু ভেতরের আঘাত কিসে সামলাবে? তার কোনো প্রতিরোধ নেই।

নরেন, মিতার কাজের তক্তি কাঁচি এটা ওটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে আসে দরজার বাইরে। মিতাকে রাখতে যাবে ও ঘরে। আজ থেকে মিতার নির্বাসিন। এই ব্যবস্থাটা হঠাৎই ঘটে গেল অঘটনের মত। তাকেই এই ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। অথচ সে ত চায় নি মিতা অন্য ঘরে থাকুক। কোনো কিছু দিয়েই রুখতে পারছে না এ-ব্যবস্থাকে।

ব্যবস্থা এমনই হয়ে থাকে। বিধবারা সেলাই করে। তারা সাধারণত মূল কাজ থেকে আলাদা ব্যবস্থায় থাকে। হয় মাচার ওপর কাজ করে, নয়তো ফর্মা ঘরে। আলাদা ব্যবস্থার ব্যতিরেকে বিশেষ ব্যবস্থার অধিকারী নয় মিতা। যারা স্বামী-স্ত্রী কাজ করে, তারা একসঙ্গে কাজ করে। নরেনের কারখানা একেবারে

অতি ছোট হলে নিয়মিত কাজ না পাবার অনিশ্চয়তার এক বিরহ, কারখানা বড় হয়ে, কাজের নিশ্চয়তা পেলে আর-এক বিরহ।

নরেন আগে আগে যায়, পেছন্ পেছন্ যায় মিতা। গলি থেকে বেরিয়ে আরো একটা গলিতে ঢোকে নরেন। নরেনকে পেছন থেকে দেখতে দেখতে যায় মিতা। নরেন পেছন ফিরে মিতাকে দেখলে, মিতা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে একেবারে গলির গভীরে। নরেনও দাঁড়ায়।

মিতা 'আমি যাব না, আমি ওখানেই কাজ করব।'

'তোমার সঙ্গে দেখা হবে না কে বলল? এ ঘর ও ঘর যাওয়া-আসা আমাকে করতেই হবে।' গলিতে কেউ নেই দেখে নিয়ে নরেন মিতার হাত চেপে ধরে 'তোমাকে ছেড়ে থাকতে কি আমার কষ্ট হয় না?'

'তবে ছেড়ে থাকছেন কেন?' অনুনয় বিনয়ে ভেজা আকুল কণ্ঠস্বর মিতার।

'উপায় নেই।'

'উপায় আপনাকে একটা কিছু করতে হবে।'

'চল যাই।'

'চলুন। আপনি বড় নিষ্ঠুর।' নরেনের পেছন্ পেছন্ যায় মিতা।

মিতার এই কথায় কোনো কথা বসাতে পারে না নরেন।

আবিচা ঘাটে, পদ্মার বুকে চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠা, সারা শরীর কান্নায় ভরে যাবার বিরহযাত্রার বেদনা অনুভব করে মিতা। কান্নাটা বড় একার হয়ে উঠেছিল। এবারও একার হয়ে উঠতে চায়।

নরেন চাবি ঘুরিয়ে তালা খোলে নতুন ঘরের।

মিতা পাশে ছায়ার মত নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। নরেনকে পাশ থেকে দেখে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে নরেনের মুখ। নরেনের মুখ থেকে তার চোখ সরে যায় না। অপলক। কত লোভ ঐ মুখের ওপর। কত জীবনাকাঙ্ক্ষা গড়ে উঠেছে ঐ মানুষটাকে নিয়ে। কত বেঁচে থাকার আনন্দ উপলব্ধি করেছে ঐ মানুষটাকে নিয়ে। চোখ ফেরাতে পারে না। বড় প্রেম। প্রেমের জ্বালা। বড় পোড়ায়। ধিকি ধিকি করে জ্বলে বুকের ভেতর।

নরেন ঘরের ভেতর ঢোকে, ফর্মার স্তূপ ঘরে।

মিতা ঘরের ভেতর ঢুকে, নরেনের পেছনে দাঁড়িয়ে ডাকে 'শুনুন' কিছু প্রস্তাব যেন দিতে চায়। কথাটা সম্পর্কের গভীরতার থেকে উঠে আসায়, স্বর অনুচ্চ হয়। নরেন তার নতুন ঘর দেখার আনন্দের ভেতর থেকে এই স্বরের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিঁড়ে ফেলে। ঐ ডাক নরেনকে পেছন ফেরাল না। মিতার কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে। আর ডাকতে পারে না।

পেছন ফিরে মিতা দেখে, বিমল দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মিতা নিজেকে শান্ত করাতে চায়। গুছিয়ে তুলতে চায়।

'নরেন শোন।' বিমল ডাকে নরেনকে।

নরেন সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফেরে, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে বিমলের কাছে। মিতার দিকে আবার পেছন ফেরে। 'দিদি, তা হলে আপনি কাজ করুন।'

বিমল এগিয়ে যাচ্ছে, তার পেছু পেছু গলির অভ্যন্তরে এগিয়ে গেল নরেন। পেছন ফিরে মিতাকে সেই মুহূর্তে দেখলও না।

মিতা ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে স্থির। এতক্ষণ নরেন গলিতে অনেকটা চলে গেছে। এখনো গলি ছেড়ে যেতে পারে নি। মিতা অস্থির মনে বেরিয়ে এসে নরেনের চলে যাওয়া দেখে। নরেনকে চোখে চোখে রাখার আকাঙ্ক্ষায় দেখে। প্রেমে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মৃত্যু

গত কয়েকদিন এখানে তুমুল ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল।

আজ আর বৃষ্টি নেই। তবুও সাবধানে গলিতে ঢুকতে হয় মিতাকে। রাস্তা থেকে গলিতে ঢোকা মানে সহসা মিতাকে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়। গলির সামনে বাঁ-হাতি যে ছাঁট বোর্ডের দোকানটি ছিল, তার টিনের চালা, গত কয়েকদিনের ঝড়বৃষ্টির ঘায়ে নেমে এসেছে গলির মুখে। ডাইনে মাথার কাছে ঝুলছে করোগেট টিনের কোনা। টিনের কোনাটা গলির দেয়ালের দিকে সেঁটে দেয় মিতাকে। মিতার সাবধানতা যদি না থাকতো, তাহলে টিনের বিপজ্জনক কোনার আঘাত মাথায় পেত, টিনের কোনা ঢুকে যেত মাথার ভেতর। লুটিয়ে পড়ত সে এই গলির ভেতর, রক্তমাখা হয়ে। আর বার মরা তার হয় না। আর বার মৃত্যু হয়ে উঠতে সে চায়নিও। ধরে রাখতে চায় তার জীবনের সাধ-স্বপ্নকে। সে টিনের কোনার বিপজ্জনকতায় সাবধান হয় এই কথা মনে পড়ে গিয়ে, যে নরেন তাকে ভালবাসে। নরেনের সঙ্গে তার প্রেম। নরেনের সঙ্গে তার বিরহ-ও। ওদের দেখা হয় কত কম। দেখা হওয়ার বিরোধিতা অনেক বেশি।

মিতা থাকে নরেনের ফর্মা ঘরে। কারখানা থেকে দূরে। নরেনেরই ফর্মা সেলাই করে। নরেন থাকে কারখানায়। হাঁটাপথে, দু-মিনিটের দূরত্ব। অথচ কতদিন না দেখায় কাতর থাকতে হয় মিতাকে। কতদিন! কারখানা থেকে ফর্মাঘর, বয় মণ্টু যাতায়াত করে। যাতায়াত করে ঐ কারখানার কর্মচারী সাগরেদ জয়নাল। নরেন আসে না। অথচ মিতা ভাবে, নরেনের কারখানা ঘরে তারা দুজনে কত নিভৃতিতে কাটিয়েছে। উভয়ে উভয়কে প্রেম নিবেদন করেছে। প্রেমালাপ করেছে, নরেনের কাছাকাছি থেকেছে। মিতা ভাবে, নরেন তার কোলে

মাথা দিয়ে শুতো ভাবতে ভাল লাগে। নরেনের মুখের ওপর মুখ নেমে আসতো তার এবং নরেনের মুখে মুখ ঘষেছে, চোখে চোখ ঘষেছে, নাকে নাক ঘষেছে। একথা তার ভাবতে ভাল লাগে। এসব ঘটনা স্পর্শানুভূতি শরীরের প্রতিটি বিন্দুতে লেগে আছে মিতার। এই অনুভূতিই মিতাকে কাতর করে আরো। ভাবে, কেন নরেনের মুখে মুখ ডুবিয়ে দিতে পাবেনা মিতা? এই সম্পর্ককে সর্বস্ব করেছিল মিতা। বাঁচার নতুন সচেতনতা পেয়েছিল। আর সব বাঁচা ছিল বিভ্রমে বাঁচা। তার আট বছরের শিশু দিপুও বিভ্রমে বাঁচার উপকরণ ছিল। ছিল তার মেজ দেওর, দেওরের বউ বিন্দু, অবিবাহিত দেওর শ্যামল, শ্বশুর, সকলের সম্পর্কের মধ্যে বেঁচে থাকার এক বিভ্রমে বাঁচতো মিতা। নরেনের সঙ্গে কয়েক মাসের সম্পর্কে বাঁচার সচেতনতা খুঁজে পেয়েছিল।

পেয়েছিল। কিন্তু এখন না পেয়ে পেয়ে তাকে কাটাতে হচ্ছে। তার পক্ষে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়, সে পাঁচ বছর আগে বাংলাদেশে, পূর্ববঙ্গে বিধবা হয়েছিল। বিধবার পরও একবছর বাংলাদেশে ছিল। আজ চার বছর মেজ দেওরদের সংসারে, বারাসাতে আছে সে। রাত নটা পর্যন্ত কাজ করলেও তাকে ভুলে যেতে হয় না, তাকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে। বাড়ি যেতে হয়। আবার সকালে কাজে আসতে হয়। সেই অর্থে দেওর, জা, শ্বশুর এবং ছেলে দিপুর সঙ্গে তার কোনো বসবাস নেই। অথচ তাদের ঘরের দেয়ালের পাশে তাকে রাত্রিবাস করতে হয়। একা। আর এখানে নরেনের ফর্মাঘরে সে যে থাকবে, রাত্রিবাস করবে, তার কোনো অনুকূল বাস্তবতা নেই তার জীবনে। আর বেলঘরিয়ায় নরেনের সংসার। সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডের নেপথ্যেই থাকতো। ভুলতে পারে না মিতা। নরেনের কারখানায় নরেন আর সে একে অপরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কাজ করতে পারতো। প্রেম হয় তাদের। সে পুত্রশোকের চেয়েও অধিক শোকের মত ভুলতে পারে না, সে ঘর থেকে সে নির্বাসিত হয়। নরেন ছোট কারখানার মালিক। একাই কাজ করতো। কখনো এক আধজন অস্থায়ী শ্রমিক নিত। মিতার সম্পর্কের ভেতরই নরেন উৎসাহ পায়। কারখানার উন্নতির। উৎসাহ ও শ্রমে ছিল মিতা আন্তরিক সঙ্গী। সে ভুলতে পারে না। কারখানার উন্নতির প্রক্রিয়ার ভেতরই তার নির্বাসন নিহিত ছিল। নতুন আরো কাজ পেল। আরো কর্মচারী রাখতে হল। ফর্মাতে ঘর ভরে যাচ্ছিল। ফর্মাঘর নিতে হল নরেনকে। স্বভাবতই নরেনের বউ শ্যামলী ও নরেনের বন্ধু বিমল এসে মিতাকে নির্বাসন দিল ফর্মাঘরে।

ওরা কি সন্দেহ করেছিল, তারা প্রেমসম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে পড়েছিল? না ভাবলেও তাকে ফর্মাঘরেই চলে যেতে হত। একা মালিক নরেন আর একা মেয়ে মিতা, বয়স কম, ছোট কারখানায় দুজনে থাকার বিপদ যে মনে ভাবেনি নরেনের বন্ধু বিমল, তা নয়। সেদিনের কথা ভুলতে পারে না। যেদিন ফর্মাঘর নেয় নরেন। সেদিন ছিল বিমল। বেলঘরিয়া থেকে নরেনের

বউও এসেছিল কারখানা দেখতে। বিমলই বলল, ফর্মাঘরে মিতাকে পাঠাতে। নরেনের বউ শ্যামলী সায় দিল। না যাওয়ার বিরোধিতা করার অধিকারী নয় মিতা। মেনে নেয়। কিন্তু অসহ্য ছিল এ ব্যবস্থা মেনে নেয়া। কেননা, সেই নিভৃত ঘরে, নরেনের মাথা কোলে তুলে নিতে পারতো মিতা। এবং মুখে মুখ ডুবিয়ে দেবার প্রেম তারা পেত। একে অপরে, একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার প্রেমে তারা থাকতো। একে অপরে তারা বিচ্ছিন্ন হয়। একথা ভুলতে পারেনা মিতা। নরেনকে দেখার জন্যে পাগল হয়ে থাকতো ভুলতে পারে না। কারখানা ঘরে কাজের মধ্যে ডুবে থাকতো নরেন। সহসা যদি কখনো কোনোদিন ফর্মাঘরে আসতো একা, তখন মিতা একা থাকতো, নরেনের পিঠে হাত দিয়ে দাঁড়াতে পারতো মিতা; নরেন ফর্মাঘরে ঘুমিয়ে পড়তে পারতো তার গা ঘেঁষে। মিতা বসে থেকে নরেনকে দেখার সুযোগ পেত। নরেনকে কাছে পাবার সুযোগ পেত। সে কথা ভুলতে পারবে না, নরেনকে ফর্মাঘরেও কাছে পেত। একদিন নরেনই আর একজন সেলাইয়ের মহিলা পাঠিয়ে দেয় এই ফর্মাঘরে। সবিতাকে। কাজের চাপ, নরেনকে আরো কাজের লোক রাখতেই হয়।

কিন্তু ভুলতে পারে না যে! সবিতার সঙ্গে কাজ করতে করতে, যদি কখনো নরেন ফর্মাঘরে আসতো শুধু নরেনকে দেখার আকুলতায় থাকতো। না এলে, নরেনের কারখানার দরজায়, একদিন পরে একবার আধমিনিট নরেনকে দেখায় সীমায়িত হয়েছিল। তাও কেড়েকুড়ে নিতে এল নরেনের বউ শ্যামলী। নরেনের কারখানার কাজের চাপ। শ্যামলী সারাদিন থেকে নরেনকে সাহায্য করতে এল। আটদিন এইভাবে যাওয়া আসা করল শ্যামলী। মিতা একটু দেখাটুকু পূরণ করতে পারল না। শ্যামলীর চোখে যদি ধরা পড়ে যায়? তাহলে ত ফর্মাঘর থেকেও তার নির্বাসন হবে। আটদিন পর, প্রবল ঝড়বৃষ্টি হল সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে। আটদিন পরে কারখানার দরজায় গিয়ে নরেনকে আধমিনিট দাঁড়িয়ে দেখবে। সেই অপেক্ষায় ঝড়বৃষ্টিতে ভেঙে চুর চুর হয়ে যাচ্ছিল মিতা, সেই অপেক্ষা, কাতরতার মুহূর্তকে ভুলতে পারবে না মিতা।

সেই ঝড়বৃষ্টির দিন, বিরহের দিন। এই গলির মুখে করোগেটের টিন ছেয়ে দিয়ে মৃত্যুভয় সন্নিহিত করেছে। মৃত্যু। টিনের কোনা মাথায় গেঁথে গেলে রক্ষে নেই। কদিন এই গলিতে এভাবে ঢুকতে হচ্ছে বেরতে হচ্ছে মিতাকে। শিশু শ্রমিকদের তেমন অসুবিধে নেই। তাদের উচ্চতা কম। মণ্টু ফর্মা দিয়ে যাওয়া নিয়ে আসার কাজটা করে। কারখানার সঙ্গে ফর্মাঘরের কাজের যোগানের কোনো বাধা থাকে না। সম্পর্কের অবরোধ থাকে। মিতার সঙ্গে নরেনের সম্পর্কের। এটা তাকে মেনে নিতে হয়। মেনে নেবার সে কেউ। মেনে না নেবার কেউই নয়।

নরেনকে ভালবেসে সে কি ভুল করেছিল? না সে ভুল করেনি। ভুল

করেছিল কমবয়সী মতির সঙ্গে সিনেমায় গিয়ে, মতির হাত বুকে টেনে নিয়ে। সেটা ছিল তার সেই মুহূর্তের অন্ধকারতা। মতি এখনো সেই অন্ধকারে ঘুরে মরছে। মতি তার শরীরের নিকটে আসতে চায়। মতি চরম শরীর পাবার কাতরতায় তার কাছে আসতে চায়। মিতার কাছে আঘাত পেয়ে পেয়ে একা ফিরে যায় মতি। মতির নবীন যৌবন মৃত্যুর আধার হয়ে উঠছে। এটা ভুলতে পারে না মিতা। ভুলতে পারার মত কথা নয়। ভুলতে পারে না, নিজের জীবনের এই অপমানকে। বাঁধাইখানার মালিক নরেনের সঙ্গে তার প্রেম। সে ফর্মাঘরে সবিতার সঙ্গে ফর্মা সেলাই করে। কখনো কোনোদিন এক মুহূর্ত নরেনকে কারখানার দরজায় দাঁড়িয়ে দেখে আসে।

চারপাশ মৃত্যু যেন ঘিরে আছে মিতাকে। মরণ যেন কথা বলে উঠছে। মতি তার সঙ্গে দেখা করতে এলে মরণের মুখোমুখি যেন হয় সে। নরেনের সম্পর্কের মৃত্যু ছেয়ে আসে। তার, শরীরের ভেতর মন মরে থাকে। মনের ভেতর শরীর মরে থাকে। গলির মুখে করোগেটের টিনটা যেমন ঝুলে থাকে।

সেদিনের ঝড়বৃষ্টি সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডের ইতিহাসকে ছুঁয়ে যায়। ওপার বাংলার রাশি রাশি মানুষের মৃত্যুমাখা ছিল সেদিনের ঝড়বৃষ্টি। পাঁচলক্ষের ওপর বাংলাদেশের মানুষ সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস ঝড়ঝঞ্ঝার মারা গেছে। কলকাতা নগরী তিল তিল বেড়ে ওঠার গোড়ার দিকে পূর্ব বাংলার ঝঞ্ঝাতাড়িত মানুষ, এই সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে তাদের জীবিকা গ্রহণ করে। বই বাঁধাই, রুলিং পাঞ্চিং ইত্যাদি কাজে। এপার বাংলার মানুষ যা ছোট কাজ বলে করতো না। তারা মৃত্যু তাড়া খাওয়া মানুষ, নিজের মাটির শিকড় থেকে ছেঁড়া, গায়ে লেগে থাকা মৃত্যুর হিম, স্বজন আত্মীয়ের মৃত্যুশ্বাস গায়ে নিয়ে এই ওয়ার্ডেই আশ্রয় নিয়েছে, জীবিকা নিয়েছে নিয়তি-নির্ধারিত মনে করে। আজও শিকড়বিহীনরাই এই সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডের শ্রমিক। তাদের জীবনযাপন মৃত্যুতাড়িত। তারাও জীবনের এক মৃত্যু। বিধবা ও বিধবার সন্তানরাই এই সব কারখানার শ্রমিক এখন। ইতিহাসের পর্ব বদলালেও। শতাব্দী বদলালেও। বিধবারা স্বামীর মৃত্যুশ্বাস নিয়ে থাকে। অনাথ শিশুরা পিতার। স্বামী ও পিতাদের মৃত্যু। স্বামী ও পিতার অপরিচয়ের জীবন। পূর্ব বাংলায় ঝড়ঝঞ্ঝায় পাঁচলক্ষের ওপর মানুষের মৃত্যু এই সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডের ইতিহাসকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বুঝতে সুবিধে হয়। কোন মানুষদের নিয়ে এই সাঁইত্রিশ নম্বরের পত্তন করেছিল, ব্রিটিশ কোম্পানি। অফিস আদালত কোর্ট কাছারি প্রশাসনিক কাজ করার উপকরণের জন্যে দপ্তরীপাড়ার পত্তন করে, সহজলভ্য সেই সব ঝঞ্ঝাতাড়িত মানুষ নিয়ে। স্বজন আত্মীয়ের মৃত্যুশ্বাস বুকে নিয়ে মৃত্যুতাড়া খেয়ে, শিকড়-বিহীন হয়ে সেই সব মানুষ এখানে আশ্রয় নেয়। আর পাঁচজনের মত তাদের জীবন ছিল না, মৃত্যু নির্ধারিত ছিল। কলকাতার এককোণে মলিন বসবাস ছিল। আজও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। ইতিহাসের পর্বান্তর ঘটে। দেশভাগের

পর, এখানে ওপার বাংলার বিধবা ও বিধবার সন্তানেরা জীবিকা গ্রহণ করে। এখানে যেসব মহিলা কাজ করেন তাঁরা সবাই বিধবা। যারা শিশু তারা সকলেই বিধবার সন্তান। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি।

মৃত্যুর স্মৃতি নিয়ে থাকে মিতা। বছর তিন হল বাঁধাইখানায় কাজ করছে। বিধবা হবার পরও এক বছর বাংলাদেশে ছিল। দেওর অনন্তের সঙ্গে চলে আসে। পদ্মার বুকে স্টিমারে হাওয়ায় হাওয়ায় তার অশ্রু শোষিত হয়েছিল। এই অহরহ মরা জীবন নিয়ে তার থাকা। থেকে থাকে সে। থাকা ছাড়া উপায় নেই। যাকে বলে সে মৃত্যুগন্ধে বেঁচে থাকে। মৃত্যুশ্বাস বুকে নিয়ে থাকে। সেও জেনেছে, বাংলাদেশে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস-ঝড়ের দুর্বিপাকে পাঁচলক্ষের ওপর লোক মরে গেছে। এতে সে বড় দুঃখ শোক পায়। সে-ভূখণ্ডের একজন ছিল সে। এখন অন্য দেশ, অন্য রাষ্ট্র। এখনো ওদেশের মানুষ ও প্রকৃতি জুড়ে সে ঘুমের ভেতর স্বপ্ন দেখে। ঐ বিপুল মৃত্যু তার ব্যক্তিজীবনের একান্ত মৃত্যুশোককে আরো তীব্র করে, অন্বিত করে বিপুল মৃত্যুর সঙ্গে। বিপুল শোক পায় সে। মৃত্যুচ্ছায়া ও মৃত্যুগন্ধে তার থাকাকে আরো আকীর্ণ করে। পাঁচলক্ষেরও বেশি মানুষের সহসা মৃত্যু। কত জীবন নিশ্চিহ্ন। কত জীবনের স্বপ্ন-স্মৃতি মরে যায়। কত জীবনের সংসার ধুয়ে সাফ হয়ে যায়। একটা গান মনে এসে আকুল করে রাখে মিতাকে। 'মনেতে ছিল আশা তারে নিয়া বাঁধব বাসা তবু সে চইলা গেল আমায় ফাঁকি দিয়া'—গানের বেদনা মিতার মনকে অধিকার করে রেখেছে। 'মনেতে ছিল আশা তারে নিয়া বাঁধব বাসা' আত্মজনের মৃত্যু দিয়ে এই বিপুল মৃত্যুকে খোঁজে মিতা। অনুভব করতে পারে। আত্মজনের মৃত্যুর সঙ্গে ওই বিপুল মৃত্যু মিশে যায়। কত হাহাকার কত বেদনা মিশে আছে ও-দেশের আকাশে বাতাসে। এই অনুভব আসে মিতার। মৃত্যুব্যথা মিতার বুকে পাথর হয়ে বসে থাকে। পদ্মার বুকে বাতাসে বাতাসে অশ্রু শুকিয়ে যাবার মত বেদনা খুঁজে পায় সে। এত লোক একসঙ্গে মারা গেল? চেনা দেশের মানুষ। কত মানুষের কত চেনা মুখ হারিয়ে গেল, শুধু স্মৃতি হয়ে রইল। কত প্রেমিক তার প্রেমিকাকে হারিয়েছে। কত প্রেমিকা তার প্রেমিককে নিয়ে জীবনের সাধ হারিয়েছে। 'মনেতে ছিল আশা তারে নিয়া বাঁধব বাসা' কত যে নানা রকম নানা ধরনের সম্পর্কের গ্রন্থি ছিঁড়ে গেছে! হায়! বড় বেদনা এখন ওদেশের আকাশে বাতাসে। পদ্মা এত বড় বিশাল যে পদ্মার বুকে কাঁদলেও কাঁদা হয় না। বাতাস শুষে নেয় সে কান্না। এখন মনে হয় পদ্মাই কান্না হয়ে ওঠে। বিপুল মৃত্যুর কান্না পদ্মা দিয়ে উপমিত হতে পারে। 'মনেতে ছিল আশা' গান আলোড়িত করেনা মিতাকে। গানের বেদনা মিতাকে আলোড়িত মথিত করে। নরেনের সঙ্গে প্রেমের বেদনা তার সঙ্গে মিশে যায়। পেয়েও না পাবার বেদনা। মৃত্যুশোকের বেদনা। মৃত্যু তাকে ঘিরে রাখে।

নরেনকে না দেখে থাকা, ফর্মাঘরে মিতার, মৃত্যুশোকের মত বিরহে থাকা তার। মতি তার কাছে ছুটে আসে, আর এক মৃত্যু –মতির মৃত্যু দেখে। মতির বিস্মর, মতিকে মৃত্যুর অন্ধকারতা দেয়। মতি, মিতার শরীর পাবার জন্যে মৃত্যু-অস্থিরতায় থাকে। এটা মতির জীবন নয়। মতির দোষ কি, মতিকেই ত জাগিয়েছে মিতা। মিতার মনের মৃত্যু-অন্ধকারতাই মতিকে এমনটাই করেছে। সিনেমা হলে মতির পুরুষের স্পর্শ সে চেয়েছিল। তারও উপায় ছিল না। তারই কারণে মতিকে মরতে হচ্ছে। মতি ছুটে ছুটে আসছে মিতার কাছে। মতি তার প্রেমিক পুরুষ হতে পারে না। হতে হয়তো পারতো, কিন্তু তার অনেক কেটিসভা এসে মিশতো। তাছাড়া নরেন তার প্রেমিক পুরুষ হওয়ায় মতি প্রত্যাখ্যাত হয়। মতিকে কিশোর পুরুষ হবে উঠতেই দেখে মিতা। কিন্তু সচেতনতায় আসলে সে ছোটভাইয়ের মত। মতির জন্যে তার কম বেদনা নেই। মতি তার চোখের সামনে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে। হায়!

নরেনের কারখানায় গিয়ে নরেনকে দেখার আকুলতা তার থাকে। কিন্তু নরেনের কারখানায় যাবার উৎসাহ আর পায় না মিতা। উৎসাহ তার মরে আছে। কেমন মনে মনে কাহিল হয়ে পড়ছে সে। সেলাইয়ের কাজ আদত বেদনাবহ। কাঁথা সেলাইয়ের রমণী বধূরা, কাঁথা সেলাইয়ের অবকাশ পায় যখন তার প্রিয় পুরুষ কাছে থাকে না। বইয়ের ফর্মা সেলাইয়ে সেই বিরহের রমণী লাগে। আশ্চর্য!

বড় নরেনের বিরহে থাকে মিতা। সে ভুলতে পারে না। নরেনের সঙ্গে তার প্রেমে থাকার টাটকা স্মৃতি মুহূর্তগুলো। গোটা সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে ফর্মা সেলাইয়ের কাজে বিধবা বিরহের রমণী নিয়ে গঠিত, নরেনের কারখানার রমণীর বিরহদশা থাকবে না, এটা হবে কেন? উদ্ধারহীন, নিরুচ্চার, বেদনা সইতে থাকে মিতা। নরেনের প্রতি অভিমান বেদনা কাতর করে রাখে তাকে। হায়! মেয়েদের একবারই বিয়ে হয়। এক পুরুষকেই ভালবাসতে হয়। সেই সামাজিক অবরোধের সংস্কার মিতার মন ভেঙেছিল। নতুন করে প্রেম-জাগরণ হয়েছিল। সেই প্রেমের কাতরতায় সে এখন থাকে। সে ভুলতে পারে না তার স্বামীর স্মৃতির মহাগ্রাস। অধুনা জীবনের চাওয়ায় ছিঁড়ে ফেলেছিল। স্বামীর স্মৃতি সর্বগ্রাসী থাকলেও আগে অনেককে তার ভাল লাগতো জীবনে পাবার। প্রেম পাবার আকুলতা তার তৈরি হত। কিন্তু মনের অবরোধ ভেঙে প্রেম নিবেদন করতে পারতো না কারো সঙ্গে। নরেনের সম্পর্ক চেয়েই সে অবরোধ ভাঙে মিতা। নরেনকে প্রেম নিবেদন করে, নরেনও তাকে ভালবাসে। আজ তাকে নরেনের বিরহে কাটাতে হয়। সে বিরহ মৃত্যুর অধিক। সে বিরহ তার ব্যক্তির অসম্মান। সেই বেদনা বিপুল মৃত্যুর বেদনার সঙ্গে উপমিত হতে চায়।

আর উৎসাহ পায় না মিতা। একেবারে মরে থাকে। মন ব্যথায় কাতর, জড়।

ঘণ্টা দেড়েক হল কাজে এসেছে মিতা। এতক্ষণ ধরে নিরবচ্ছিন্ন কাজ করে চলছে। সবিতাও তার সঙ্গে কাজ করছে। সেলাইয়ের কাজ।

কাজের ভেতর তারা অদ্ভুত নীরব থাকে। এত সময় চলে যায় তারা কোনো কথা না বলেই কাটায়। আসলে তাদের কথা বলার কিছু থাকে না। নিজেদের ভেতর কথা বলার কথা সব শেষ করে ফেলেছে। কথা বললে কথা বলবার জন্যেই বলবে। সম্পর্কের ভেতর নতুন কথা বলে ওঠার নতুনত্ব পায় না। আর কথা বলবার জন্যে কথা বলার ইচ্ছে সারাক্ষণ থাকে না। যখন ইচ্ছে হয় তখন তারা কথা বলে। এখন ইচ্ছে নেই, তারা কথা বলে না। ফর্মাঘরে এক-সঙ্গে থাকার ভেতর অসংখ্য নীরবতা জাঁকিয়ে বসে। চাপ চাপ ছায়ার মত নীরবতা।

ফর্মাঘরে নরেন ঢুকে পড়ে। সহসা মিতার শরীরের ভেতর নীরব চঞ্চলতা চেপে আসে। সে না চাওয়াতে নরেন ফর্মাঘরে নিজের মনে এসেছে। শুধু চোখ সরিয়ে নরেনকে দেখে মিতা। বুকের ভেতর তোলপাড় হয়। তার হৃদয়-চাঞ্চল্য সবিতার চোখে ধরা না পড়ে সে ব্যাপারে তার সাবধানতা থাকে। মনে পড়ে, গলির মুখে করোগেটের টিনটা ঝুলে আছে তার ভেতর নরেন সাবধানে এসেছে ত? ফেরবার সময় নরেনের সে সাবধানতা যেন থাকে। নরেনের বিপদ হলে কষ্ট পাবে বড। সবুজ নরম ঘাসের মত কাঁপছে মিতার হৃদয়। মুখ তুলে ভাল করে নরেনকে সে দেখার সুযোগ পায় না, কিন্তু এইটুকু আড়চোখে দেখার ভেতরই তার মনের আলোড়নকে শান্ত রাখতে হয়। নরেনের মুখের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকার আকাঙ্ক্ষা মেরে তাকে মুখ গুঁজে থাকতে হয়। নরেন এসেছে ফর্মাঘরে। কতোদিন নরেনকে দেখেনি। বুকে ঢেউ লাগে মিতার। ভেতরে তরঙ্গায়িত হতে থাকে। নরেনকে ভাল না বেসে পারে না। নতুন করে যেন সঞ্জাত হয়ে ওঠে। নরেনের মধ্যে সে মোহনমায়া আছে, তাতে বিঁধতে থাকে মিতা। পারবে না নরেনের প্রেম সরিয়ে রাখতে। পারবে না নরেনকে ভুলে থাকতে। পারবে না নরেনকে না দেখে থাকতে। হাত থেকে ছুঁচ শিথিল হয়ে পড়ে।

সবিতার দিকে তাকিয়ে দেখে মিতা, সবিতা কাজ ফেলে নরেনের দিকে তাকিয়ে আছে। সবিতার প্রতি রাগ হয় মিতার। সবিতার ওপর প্রতিহিংসায় চোখ দাউ দাউ করে ওঠে মিতার। বুক জ্বলে যায়। সবিতা সৌজন্য চাহনিতে আছে জেনেও রাগ হয় মিতার। দরজার মুখে মণ্টুকে পাশ ফিরে দেখে মিতা। সেই পাশ ফিরে মুখ ফেরানোর ভেতরই নরেনকে দেখা। বুকের ভেতর চঞ্চলতা বাজনা হয়ে বেজে ওঠে। প্রেমগীতি সারা শরীরে জড়ায় মিতার। মিতা হাতের পাশে রাখা গ্লাসটা নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। নরেনের গা ঘেঁষে মণ্টুর

দিকে এগিয়ে যায়। 'যা, একটাকার চা আনবি।' আঁচল থেকে দুটো আধুলি বের করে দেয় মণ্টুকে মিতা।

'দাদা, আপনার খেয়ালখুশি হলে ফর্মাঘরে আসেন।' সবিতা, নরেনের সঙ্গে কথা বলছে। 'এমনিতে আসেন না। সময় পান না দাদা?' সবিতার হাসিমুখ।

'সময় পাই না।' নরেন বলে।

নরেনের কণ্ঠস্বর। মিতার শরীরের ভেতর আলোড়ন চেপে বসছে। হু হু করে উঠেছে বুক। সবিতার কথা বলা বুকে বিঁধছে তার।

'আজ নতুন বইয়ের ফর্মা ধরতে পারবেন?' সবিতার দিকে তাকিয়ে কথাটা বলে নরেন। পরমুহূর্তে মিতার দিকে ঘুরে তাকায়। মিতাকেও এ প্রশ্নটা করতে চেয়েছে, এটা বোঝায়।

সবিতা বলল, 'বিকেল থেকে ধরতে পারব।'

নরেন তাকিয়ে থাকে মিতার দিকে।

মিতা তাকায়। তাকিয়ে থাকতে পারেনা। 'আজকেই ধরা হবে।' নরেনের সঙ্গে কতদিন পরে কথা বলছে। কথার আবেগের ঘা বুকের ভেতর চেপে বসে যাচ্ছে।

মিতার দিকে তাকাতে নরেনের ভাল লাগে। মিতা তাকে ভালবাসে বলে মিতাকে তার বড় ভাল লাগে। কথা বলতে তার ইচ্ছে হয়। 'বৃষ্টির দিনে একবেলা কাজ ত করতে পারনি।'

'না। ঘর অন্ধকারে ভরে ছিল।' সবিতা না থাকলে নরেনের হাত ধরতে এগিয়ে যেত মিতা। দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকে।

কাজ ফেলে এখানে আসা নরেনের পক্ষে তত সহজ নয়, নরেন জানে।

মিতা বলল, 'গলির মুখে টিনটা ঝুলছে, দেখে এসেছেন ত?'

'হ্যাঁ, তা দেখেছি।'

'সাবধানের মার নেই!'

'বৌদি আসেন ত দাদা?' সবিতার প্রশ্ন।

সবিতার দিকে পাশ ফেরে নরেন। 'এখন কদিন আসছে না।'

'বৌদি বেশ ভাল।' সবিতার হাসিমুখ।

মিতা জ্বলে যায়। 'নতু ফর্মার চারশো বই ত?'

'চারশোই ত বলে পাঠিয়েছি।'

'ও হ্যাঁ।'

'না চললাম।'

মিতা বলল, 'যাবেন কি, চা আনতে দিয়েছি।'

'সে কি!' চমকে ঘড়ি দেখে নরেন।

'একটু বসলে আপনার খুব ক্ষতি হয়ে যাবে না। কি বল্?' সবিতার দিকে

তাকিয়ে সবিতার সায় চাইল মিতা।

'তা ত বটে, আপনি মালিক বলে কথা।' সবিতা হাসছে।

তক্তিটা তুলে নরেনের দিকে বাড়িয়ে দেয় মিতা। 'বসেন। আপনি মালিক বলে কথা। ফর্মাঘরে পা পড়ে কখন কোনদিনে, আপনার দয়ায় খাচ্ছি পরছি—আবার পাব কবে, একটু চা খেয়ে যান!'

এ ধরনেরে কথায় নরেন চমকে ওঠে। মিতার এই কথার ভেতর কি শ্লেষ লুকিয়ে আছে? নাকি, সবিতার সামনে, স্বাভাবিক কথা বলার ধরনে এ কথা বলা মিতার? মিতা তাকে বসিয়ে চা খাইয়ে, ফর্মাঘরে কিছুক্ষণ ধরে রাখতে চায়, বুঝেছে। সেও বসার লোভ পায়। কিন্তু কত কাজ তার। কত ঝামেলার তাকে কাটাতে হয় এ কথা কি মিতা জানে? মিতার সঙ্গে দেখা করতে পারে না বলে মিতার মনে বেদনা জমে থাকে, এটা বোঝে নরেন। কিন্তু তার উপায় নেই। কেমন মিতাকে দূরে দূরে রাখছে সে। অথচ তার মনে মিতার কাছে থাকার ইচ্ছে থাকে। হারিয়ে ফেলতে চায় না, হারিয়ে ফেলে মিতাকে।

তক্তিটাতে বসে পড়ে নরেন। 'মন্টুটা কারখানায় প্রায়ই থাকে না—এখানে থাকে, না অন্য কোথাও আড্ডা মারে?' মিতার দিকে তাকিয়ে কথাটা জিজ্ঞাসা করে নরেন।

মিতা বলল, 'না, থাকে। এখানে দরজার গোড়ায় থাকে। সেলাই ফর্মা দিয়ে তখুনিই ফিরে আসে। গরিবের ছ্যামড়া, ফাঁকি দিলে ভবিষ্যৎ ঝরঝরে।'

সবিতা বলল, 'আপনি ওরে কাজে বসাবেন দাদা। তাড়াতাড়ি কাজ শিখতে পারলে ওর একটা গতি হয়। মা আছে, বাবা নেই। ওর আরো দুটি বোন আছে। ওর মা বাসায় কাজ করে খায়।'

'হুম্।' কথাটা বুঝল নরেন। 'ভাঁজাইয়ে বসিয়ে দিতে পার না তোমরা?'

'না, কাছে এসে বসেও না। কারখানায় 'পিলাতে' (লেই লাগানো) দেন?'

'মাঝে মাঝে ত দরকার হয়।'

'বইয়ে দাঁড়াতে দেন না?' সবিতা কথা বলেই চলে।

'তা দাঁড়ায়।'

'তাহলে কাজ দেখতে দেখতে এক ধরনের শেখা হয়ে থাকবে।'

গা জ্বলে যায় মিতার। সবিতার কথা বলার কি আছে? এই কারখানায় তার মত ত পুরনো নয় সবিতা। মিতা পুরনো কাজের লোক। মিতার সঙ্গেই কথাটা বেশি হতে পারে। মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সবিতা। সবিতার এরকমই স্বভাব। স্বভাব বদলাবে না সবিতার। আর নরেন কেমন শাদাসিধে মানুষ, সবিতা তার সঙ্গে কথা বলছে ত সেও কথা বলছে। এ-রকম হয়ে চলারও একটা শেষ আছে। থামতে হতে হবে নরেনকে। নরেন তার প্রেমিক। নরেন চাইবে তারই সঙ্গে বেশি কথা বলতে। ভেতরে ভেতরে ফুঁসতে থাকে

মিতা। কিন্তু অভিব্যক্তিতে অপ্রকাশ থাকে। জানাজানি হলে বিপদ। নরেনের ফর্মাঘর থেকে নির্বাসিত হতে পারে মিতা। সে সইতে পারবে না।

মন্টু চা নিয়ে এলে সামাল দিতে এগিয়ে আসে মিতা। চায়ের ভাঁড় নিয়ে নরেনের একেবারে মুখোমুখি হয়ে সবিতাকে আড়াল করে দাঁড়ায়। নরেনের চোখের দিকে তাকায়। 'নিন চা খান।' ঘুরে দাঁড়িয়ে আর একটা ভাঁড়ে সবিতাকে চা দেয় মিতা। তারপর সবিতাকে প্রায়ই আড়াল করে বসে। নরেনের মুখোমুখি চা খায় মিতা। চায়ের গ্লাস হাতে ধরে। 'নতুন পার্টিগুলো আপনার কারখানার কাজে সন্তুষ্ট ?'

নরেন 'মোটামুটি। একটা গুডউইল হয়েছে। টাকা পড়ে আছে অনেক-গুলো।'

মিতা দেখল নরেনের গায়ে যে শার্টটা, সেটা নতুন। একটা ছেঁড়া শার্ট নিয়ে চালাতো নরেন। নরেনের কারখানা ঘরে নরেনের সঙ্গে যখন মিতা কাজ করতো, তখন নরেনকে বলতো, নতুন জামা বানাতে। আজ নরেন নতুন জামা বানিয়েছে সেই, অথচ মিতা নরেনের কারখানা ঘরে, নরেনের কাছে নেই। অথচ দেখে খুশি হয় মিতা। 'অনেক টাকা ?'

'হ্যাঁ, তা হাজার চারেক টাকা।'

'কাজ কমে গেল ?'

'সিজিনের চাপ ছিল তখন।' নরেনের চা শেষ হয়ে যায়। উঠে দাঁড়ায় তখুনিই নরেন।

উঠে দাঁড়ায় মিতাও। 'দাঁড়ান, আমিও একটা পান খেয়ে আসব। সাবধানে যেতে হবে কিন্তু, ওখানে চালার টিনটা ঝুলে আছে।' মিতা আর পারে না। নরেনকে একা পাবার ইচ্ছে হয়েছে খুবই। নরেনের সঙ্গে চলতে চলতে কথা বলতে পারবে। তার ওই যাওয়া নিয়ে সবিতা যা কিছু ভাবুক না কেন, মিতা নাচার। নরেনকে একা পেয়ে কথা বলার সাধ সে তাড়াতে পারছে না।

নরেন গলির মাঝামাঝি এগিয়ে যায়। আঁচল লুটোতে লুটোতে ছুটে এসে নরেনকে ধরে মিতা। 'এত জোরে হাঁটেন যে ?'

নরেন পাশ ফিরে দেখে মিতাকে। মিতার আকুলতার টের পায়। আকুল মিতার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। মিতা ফর্মাঘরে একা একা কত অস্থিরতায় কাটায়, বুঝতে পারে নরেন। সে সাধারণ মানুষ, নরেন। অতি সাধারণ মানুষ। তাকে মিতা এত ভালবেসে ফেলেছে ? মন বড় মথিত হয় নরেনের। তার স্ত্রী পরিবার আছে। আছে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রাণপণ চেষ্টা। তার ভেতর মিতা কোথায় জায়গা পাবে ? মিতার ভালবাসা পাবার লোভও আছে। সেটা একান্ত প্রেমের বাসনার ভেতর সুচারু হয়ে ধরা পড়ে। নরেন একমুহূর্ত মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মিতার দিকে তাকানোর ভেতর। মিতার চোখ তাকে বড় টানে। মিতা স্বামীহীনা। পুরুষহীনা। মিতা নরম হ'য় তার কাছে ধরা দেয়।

মিতাকে পাশ ফিরে দেখতে দেখতে এগোচ্ছিল নরেন।

মিতা নরেনকে সাবধান করে দেয়। 'সামনে বিপদ, দেখে চলেন।' নিচু হয়ে দেয়াল ঘেঁষে গলির মুখটা পেরো নরেন। রাস্তায় নামে। পেছু পেছু মিতাও নামে।

রাস্তায় লোকজন। রাস্তার গায়ে দোকানপশারি। ঠেলা, মুটে, ভ্যান রিকস সাইকেল, ম্যাটাডর, টেম্পো,—তারই ভেতর লোকজনের চলাচল। ওপরে ইলেক ট্রিকের তারের জটিলতা। মৃদুমন্দ নানা শব্দের রাশি। হর্নের শব্দ, সাই-কেলের বেলের ক্রিং ক্রিং. ভ্যানরিকশর ধাতব শব্দ ঠন্ ঠন্। মানুষের হাঁটার আর এক হালকা শব্দ। তাদের কথা বলার মৃদু অস্পষ্ট শব্দমালা জড়িয়ে ধরে রাস্তাটিকে। গড়িয়ে যায় ফিতের মত রাস্তাটি।

রাস্তায় এই শব্দমালা ও ভিড়ের ভেতরই মিতার মুখোমুখি থমকে দাঁড়ায় নরেন। মিতা, নরেন মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, নরেনের ডান হাতটা খপ করে ধরে ফেলে সহসা ব্যাকুলতায়। চাপ দেয়। 'আপনি আমারে ভালবাসলেন কেন? ভালবাসলেন যদি, আপনি আমারে এত ব্যথা দেন কেন? আমিও একটা মানুষ, আমারও মন বলে একটা কিছু আছে। আপনি যদি আমারে মরতে কন, মরতে পারব। তবু আপনি আমারে দূরে রেখে থাকেন।' মিতা চোখ মেলে নরেনকে দেখছে। 'আমি আপনারে দেখতে পাই না যে। আপনারে না দেখে আমারে থাকতে হয়। আমি এত সইতে পারব না। আমি আপনার ঘরে আপনার গায়ের কাছে বসে কাজ করতাম, আপনি ভুলে যান। কারখানা থেকে বিদায় দিলেন, সে কথা কি ভুলে থাকেন নাকি? আপনি আমারে ভাল-বাসেন, একথাও ভুলে থাকেন? পারব না সইতে, একথা যদি সত্যি হয়।' নরেনের হাত চেপে ধরে আবেগকম্পিত স্বরে ভেঙে পড়ে মিতা।

মিতার এই ভেঙে পড়া দেখে নরেন সহসা নিজের নরম হৃদয়ের টান অনু-ভব করে। মিতাকে সে ভালবাসে। তারই কর্মচারী মিতা 'তুমি ত জানই, তোমাকে ভালবাসি। তোমার কাছে এলে আমার মনে শান্তি আসে। কিন্তু সময় পাই না যে। তোমার কাছে আসতে পারি না বলে যে ভালবাসি না তা নয়! ভালবাসি। তুমি আমার মনের শান্তি এনে দাও।'

'আমাকে আপনি দুঃখ দেন।'

'দুঃখ আমি দিই না।'

'দুঃখ আমি নিজে পাই।'

'নিজে নিজে এত দুঃখ পেলে চলে?'

'যত দুঃখী আমি, তত দুঃখ আমার আসে।'

'সরে দাঁড়াও, পেছনে ঠেলাগাড়ি।'

রাস্তা ঘেঁষে দাঁড়ায় মিতা। 'আমার কী হবে বলে দেন?'

'কীসের?'

'জানি না, আপনি আমার কাছে আসেন।'

'সময় পেলে আসব।'

'না আপনি আসেন না।'

মিতার চোখের দিকে স্থির তাকিয়ে থাকে নরেন। আহা! মিতার কি কষ্ট। থমকে গেছে সহসা নরেন। নরেন কী করতে পারে! মিতাকে তার ভাল লাগে। ভাল লাগেই। এই ভালবাসার বিনিময় সে কীভাবে তৈরি করবে তার এই মুহূর্তে মনে হয়, ভালবাসা তার উচিৎ হয় নি। তার বউ বাচ্চা আছে, তারই এক কর্মচারীকে ভালবেসে ফেলা উচিত হয় নি। ভালবাসার মূল্য যদি না দিতে পারল, ভালবাসল কেন? তার যেন কেমন হচ্ছে। মুখে বলতে পারছে না। ভেতরে এক অস্থিরতা এসে তাকে মোচড় দিতে শুরু করেছে। বুকের ভেতর এক হাহাকার। মিতাকে ভালবাসছে, মিতাকে জীবনে পাবেনা। হাহাকার এই পূর্বনির্দিষ্টতার নিয়তি জানতে পারে সে। তার বউ শ্যামলীর প্রতি সে কি দায়িত্ববান নয়? যথেষ্ট দায়িত্ববান। তবুও ভালবেসে ফেলেছে মিতাকে। শ্যামলীর দায়িত্বের সঙ্গে এই ভালবাসাকে মেলানোর কোনো মানে নেই। ব্যাখ্যা নেই। এ ভালবাসা অন্য জিনিশ। এ মনের কুসুমলাবণ্য। মনে মনে কুসুম ফোটায়। কুসুম ফোটার প্রেম। এ প্রেম তার বুকে কষ্ট হয়ে বিঁধে থাকবে। মিতাকে জীবনে না পাবার বেদনায়! না পাবে জেনেই প্রেমে মজেছে। না পাবে জেনেই ভালবেসেছে। না পাবে জেনেই ভালবেসে যেতে হবেই। মিতাকে জীবনে পাবে না। কুসুম ও কুসুমলাবণ্যের আকাঙ্ক্ষা কুরে কুরে খাবে তার জীবন জুড়ে। তার জীবন জুড়ে এমন না পাওয়ার বেদনা প্রবহমান থাকবে। এসব যদিই জানে, তবে মিতাকে ভালবাসে কেন? না বেসে পারে না যে!

'কী দেখছেন, মুখের দিকে তাকিয়ে?' মিতা বলল।

'তোমাকে দেখছি।'

মিতা মনে মনে ভীষণ খুশি হয়।

মিতা কেঁপে কেঁপে ওঠে। ভুলে যায় তার একবার বিয়ে হয়েছিল। তার স্বামী ছিল। শিশুসন্তান এখনো আছে তার। সে সে-সব জীবনের কেউ নয়। নরেনের চোখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই তার জীবনের লীলা ভরিয়ে দিতে চায়। কারখানায় সে আর নরেন থাকে না আর, একা একারা। সেখানে, যে নিভৃতে তাদের প্রেমনিবেদন হয়েছিল। নরেন দূরে থাকে, কারখানায়। সে ফর্মাঘরে বড় বিরহে। বড় কষ্ট, না দেখে থাকা। মৃত্যুশোকের চেয়েও বড় কষ্ট তার।

'ঢের কাজ পড়ে আছে। চলি।' হাতে অল্প চাপ দিয়ে ভিড়ের মধ্যে সেঁধিয়ে যায় নরেন।

মিতা তাকিয়ে থাকে সেদিকে। নরেন দুম করে বিদায় নিল। মিতার সঙ্গ

সাধ ফুরোয় না, আবেশ মিলায় না। নরেনের চলে যাবার পথের দিকে তাকিয়েই থাকে। তাকিয়ে থাকে।

বিকেল চারটের হালকা ছায়া ধূসরতা তখন সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে। আর তখনই ফর্মাঘরে নরেন এল অপ্রত্যাশিত রকম। নরেনের গায়ে চড়ানো সেই নতুন জামাটা। নীল রঙের। পরনে প্যান্ট। একটু বেশি রকম সুন্দর দেখাচ্ছে নরেনকে। নরেনকে চোখ তুলে সহসা দেখার ভেতরই ভাল লাগার আনন্দে কেঁপে যায় মিতা। দুদিন আগে দেখা হয়েছিল, আরো কদিন না দেখে থাকতে হবে, এরকম মানসিক প্রস্তুতি ছিল মিতার। নরেনের এই হঠাৎ আসাতে কি যে ভাল লাগে মিতার। মার্কেটে বেরবার আগে এসেছে।

তক্তির সামনে বসে আছে মিতা। তার ঠোঁটে হালকা হাসি গেঁথে আছে। হাসিটা নিয়ে এল নরেন।

নরেন দাঁড়াল ঘরের মাঝখানে। সবিতার দিকে তাকাল। 'এখন কাজের তেমন চাপ নেই। আপনার কাজ কদিন বন্ধ রাখতে হবে। মাঝে মাঝে খবর নেবেন, কাজ থাকলে আপনাকে আবার নেব।'

'ঠিক আছে।' মাথা কাত করে সবিতা।

এই কথায় সবিতার মুখ থমথমে হয়ে উঠল। ঘরের ভেতরটাও ভারী হয়ে উঠল।

মিতার ভেতরটা আনন্দে ফেটে পড়ছে।

নরেন ইতস্তত করছে, ফিরে যাবে।

'মার্কেটে বেরচ্ছেন দাদা?' মিতা শুধলো।

'হ্যাঁ' জানিয়ে একমুহূর্ত মিতাকে দেখল নরেন। তারপর বেরিয়ে গেল ফর্মাঘর থেকে।

মিতার মনে হল, সাবধান করে দেয়া হল না গলির মুখে বিপজ্জক টিনটার ব্যাপারে! নরেনের ওটায় একটুও আঘাত না লাগে। নরেন চলে যায় আর সাবধান করার সুযোগ পায় না মিতা। আর বোর্ডের দোকানের মালিকের এমন দশা হয়েছে যে এতদিনেও ওটা সরায় না! ছাঁট বোর্ডের দোকান ওটা। মালিকের বাড়ি মুর্শিদাবাদে। দোকান বন্ধ করে বাড়ি গেছে। এখনো ফেরেনি! নরেনের আসা যাওয়ার পথে ওটা থাকে কেন? খচ খচ করে লাগে মিতার।

বিকেল মরে আসছে মিতার চোখের দেখার ভেতরে। হালকা বিনম্র কলরব চারপাশ জুড়ে। সুশীতল শান্তি যেন ছড়িয়ে আছে। তার মনের ভাল থাকার ভেতর চারপাশ ভাল থাকে। মন তার ভাল, চারপাশের সুন্দরও ভাল। সবিতা চুপ করে কাজ করছে। কোনো কথা বলছে না সবিতা। সবিতা কাল থেকে ফর্মাঘর থেকে চলে যাবে। এটা মনের শান্তি মিতার। সবিতা ত কালো মেঘের মতই নেমে এসেছিল এই ফর্মাঘরে। সবিতার চলে যাওয়াটাই ঠিক।

'আবার ঘুরে ঘুরে কাজ করতে হবে।' সবিতা বলল। 'এক জায়গায় থিতু হলে আর কাজ করা হচ্ছে না।'

'না পেলে ওভাবেই কাজ করতে হবে। কত জন ওভাবে কাজ করে।'

'তুই থেকে গেলি।'

'হ্যাঁ।'

'তোর ওপর দরদ আছে দাদার।'

'দরদ নিয়ে কী করব? ভাতে মেখে কি খাওয়া যায়? কাজ করলে মজুরি পাই। না কাজ করলে দরদ দেখাবে? মজুরি দেবে?'

'তোর ত কাজ গেল না!'

'গেল না ত। একজন লোক রাখার কাজ আছে।'

'বেশ তুই একাই কর।'

'না করে উপায় আছে?'

'মালিক এলে একা চা এনে খাওয়াবি।'

'ওরকম কথা বলছিস যে?'

'না, আমি যেদিন এখানে কাজে আসি, তোর বাড়া ভাতে ছাই দিতে যেন এসেছিলাম মনে হয়েছিল সেদিন। কেন, মনে মনে ভাবি।'

'কেন?' প্রায় চিৎকার করে ওঠে মিতা।

'কেন বলতে পারব না।'

'আমার কি এমন দেখেছিস যে মনে মনে ভাবিস?'

'আচ্ছা যা, চুপ কর—ভাবি না।'

'চলে যাবার দিনে ঝগড়া করে যাচ্ছিস?'

'ঝগড়া তুইই করছিস।'

হঠাৎ মুখে কান্না ছেপে আসে মিতার। 'সবিতা রে, তুইও যা আমিও তা, আমাদের দুজনেরই পোড়া কপাল। কষ্ট দিয়ে কথা বলিস না।' তক্তির ওপর মুখ নেমে আসে মিতার। সবিতা কিছু বুঝেছে। নরেন আর তার সম্পর্কে সবিতার মনে কিছু একটা সন্দেহ উদয় হয়েছে। সবিতার এই সন্দেহ সত্যি বলেই মিতার কান্না আসে। সবিতা আজ চলে যাবে। অন্য কারখানায় কাজ করবে। হয়তো একথা ভুলে যাবে সবিতা। কিন্তু এই মুহূর্তে যে খোঁচা দিল সবিতা, তার ব্যথায় ককিয়ে ওঠে মিতা।

'তুই সেদিন মালিকের হাত ধরে রাস্তায় কথা বলছিলি।'

'বেশ করেছি বলেছি।' ভয়ঙ্কর চাপা চিৎকারে ও মূর্তিতে উঠে দাঁড়ায় মিতা। 'তোকে লাথি মেরে ঘর থেকে এখনই তাড়াব। একটু পরেই ত তোকে চলে যেতে হবে।'

'দিদি, অন্যায় ভাবে কথা বলছিস তুই।'

'বেশ করছি!' ভয়ঙ্কর মূর্তি মিতার। সবিতার প্রতি তার যত হিংসা

রাগ সমস্ত এসে এই মুহূর্তে মিতাকে রণচণ্ডী করে তুলেছে। বুঝি কাঁচি নিয়ে সবিতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। চোখ দপ দপ করছে। সবিতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দাঁতেই ছিঁড়ে খাবে সবিতাকে। নখ দিয়ে চোখ গেলে দেবে। সবিতার চুলগুলি হাতে উঠে আসবে। হাত দুটি সবিতার মুড়ে ভেঙে দেবে। মেঝেয় মাথা ঠুকে ঠুকে মাথা ফাটিয়ে দেবে। বুকে নখ দিয়ে রক্ত বের করে ছাড়বে। তার জীবনের শত্রু হয়ে তার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সবিতা। সবিতাকে পাবলে খুনই করে বসবে।

'যা. চুপ করে যা দিদি, আমারই অন্যায় হয়েছে।' সবিতা নিবস্ত করে মিতাকে।

সবিতার এই কথায় মিতার প্রচণ্ডতা একটু কমে। গা জ্বালা করছে। গায়ে আগুন ছুটছে। ধীরে ধীরে রাগ পড়তে থাকে তার। কিন্তু অগ্নিদাহ কমে না, বরং বাড়ে।

বেড়েই চলে, বেড়েই চলে অগ্নিজ্বালা। হু হু করে তাকে পোড়াচ্ছে। নরেনকে সে ভালবাসে একথা রাষ্ট্র হয়ে না পড়ে। এমনি না হলে নরেন তাকে কোথাও নিয়ে পালাবে। সে রকম অবস্থায় তারা থাকলে, এমন জ্বালা হত না তার। লোকের কানাকানি, সন্দেহ সইতে পারতো তখন। এই প্রেম এত গোপন নিষ্ঠুর যে তার জ্বালা দুর্বিষহ, তার সঙ্গে যদি উটকো কলঙ্কজ্বালা সংযুক্ত হয় মরে যাবে মিতা। ছটফট করে জীবন নিয়ে। একা একাই সে জ্বালা সইতে হবে। এ জ্বালা বুঝবে কে? একটু আগে নরেন এসেছিল, নরেনের আকর্ষণের প্রতিক্রিয়াও তাকে পোড়ায়। এ কথা সত্যি। এ সম্পর্ক সত্যি। এ কথা সত্যি যে নরেন আজ আসার ফলে তার প্রেম আরো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। নরেন আজ নতুন ব্যবস্থাও সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। সবিতাকে বাড়ি থেকে ছাড়িয়ে দিতে এসেছিল। আবার এ ঘরে নরেনকে একা পাবে মিতা। ফলে, প্রেম যত তার বাড়ে জ্বালাও তত বাড়ে। সবিতা সে ব্যথার জায়গায় হাত দিয়ে ফেলেছে।

সবিতাকে মারলে শান্ত হতে পারতো মিতা। সবিতাকে মারতে পারে না। সবিতার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে মিতা। আঁচলে চোখ মোছে। আবার কাঁদে। আবার অশ্রুতে ভরে ওঠে চোখদুটি। এ তার কি হল? এত যদি নরেনকে পাবার জন্যে তার কান্না হয় তাহলে নরেন তাকে উদ্ধার করে না কেন? নরেন তার সব নিয়ে নেয় না কেন? তাকে কাঁদাবার জন্যেই কি নরেন তার সম্পর্কে এসেছে? নাকি নরেন তার জীবনে শুধুই কান্না? আর কিছু নয় কেন? ভালবেসে এত কাঁদবে জানলে ভালবাসতো না মিতা। ভাল না বেসেই ত এতদিন ছিল। নতুন করে বাঁচার মত করেই ভালবাসার মন পেয়েছিল। তবে এই কান্নাই কি নতুন করে বাঁচা? বড় কষ্ট। নিজের দেশে থাকলে এত কাঁদতো না নিশ্চয়। যে কারণে, পদ্মার

বুকে স্টিমারে অত কেঁদে উঠেছিল। তার অশ্রুগুলি, তার দেশের জল মাটির বাতাস শুষে নিচ্ছিল। কাঁদলেও কাঁদা হচ্ছিল না। নিজের দেশ ছেড়ে এসেছে। অন্য দেশ, অন্য রাষ্ট্রে আছে। সেজন্যেই কি অত কাঁদায় নরেন ?

দরজার কাছে মণ্টু নড়াচড়া করছে। মণ্টু এসেছে, এমন নরম শব্দে জানাচ্ছে মণ্টু। মিতা চোখ মোছে। শান্ত চোখে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার ছেলে দিপুটাও নিষ্ঠুর। তাকে ত্যাগ করেছে। বাড়িতে থাকলে তার কাছে ঘেঁষে না দিপু। দিপুর অন্য ভুবন। অন্য ভালবাসার জগৎ। সেখানে মিতা নেই। মিতা নেই তবু ভাল। দিপু তাকে ছাড়ান দিয়েছে। দিপুকে নিয়ে বসবাস করার এক জ্বালা আছে। পূর্বদিনের বসবাসের স্মৃতি আসে। আর সে সব ভাবতে চায় না সে।

মণ্টু ঘরের ভেতর এসে গুলি খেলতে শুরু করে দেয়। মেঝেয় গুলির শব্দ পড়ে। গুলি গড়িয়ে যায়। গুলিতে গুলি লাগার শব্দ পড়ে। মণ্টু এ পাশ ফেরে ও পাশ ফেরে। সামনে এগোয়, পিছিয়ে আসে।

জয়নাল ঘরের ভেতরে ঢুকল। সবিতার দিকে এগিয়ে যায়। হাতে টাকা জয়নালের। টাকা বাড়িয়ে দেয় 'মালিক টাকা দিয়ে পাঠিয়েছে।' মুখ ঘুরিয়ে সবিতাকে লক্ষ করল মিতা। সবিতা কেমন মিইয়ে কুঁকড়ে গেছে। কাল থেকে সবিতা আর এখানে কাজ করবে না। মালিক টাকা মিটিয়ে দিল। বেশ হয়েছে। সবিতার এই দশায় মিতার খানিকটা প্রতিহিংসা মেটে! সবিতার দুঃখ হয়, নুয়ে যায় বলে মিতার জ্বালা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে। সহজ হতে থাকে। কাল থেকে সে এখানে রাজত্ব করবে। এমনিতে চাবি তার কাছে রাখে মালিক। নিজেই ফর্মাঘর খোলে।

ছোট কারখানার মালিকের কাছে কাজ করলে এটা হয়েই থাকে। আজ আছে, কাল কাজ নেই। সবিতা বাড়তি ছিলই। সিজিন সামলাতে সবিতাকে রাখা হয়েছিল। সিজিন ফুরিয়েছে ত সবিতার কাজ শেষ।

এটা হয়েই থাকে। এক জায়গায় কয়েকদিন কাজ করবার পর, চলে যাবার সময় মন খারাপ হয়ে থাকে। অনেক জনকে এমন কারখানা ঘুরে ঘুরে কাজ করতে হয়। হয়তো এক বেলা এ কারখানায় কাজ আছে, আর বেলা অন্য কারখানায় গিয়ে কাজ করতে হয়। এক জায়গায় কাজ করতে করতে কাজের ফাঁকে কারখানার দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াতে হয়। খবর নিতে হয় কাজ আছে কি না। এই জীবিকার মধ্যে এই ঘটনা সচরাচর। তবুও আগের কারখানা ছেড়ে যাবার বেদনা ই-ই। সেই মুহূর্তটুকুতে ভারক্রান্ত করে রাখে তাকে। এ রকম মন খারাপ অবস্থার দিকে সবিতা যতই ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে, ততই মনে মনে প্রসন্ন হয়ে ওঠে মিতা।

জয়নাল চলে গেল।

মণ্টু গুলি খেলছে।

এখন ত সিজিন নয়, আর নটা পর্যন্ত কাজ নয়। তবে মিতার যতক্ষণ কাজ করতে ইচ্ছে করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কাজ করে চলে যাবে। এখন কাজ করতে ইচ্ছে করছে না। সবিতা এখন চলে যাবে। সবিতা চলে যাবার পর হয়তো কাজ ধরতে পারবে মিতা। যা হোক, সাতটা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত কাজ করে চলে যেতে পারবে। জয়নাল কারখানা ঘরে থাকে। কাজের চাপ কমতে এখন আবার নরেন বেলঘরিয়ায় ফিরে যেতে পারছে। বেলঘরিয়ায় নরেনের সংসার। নরেনকে ফিরে যেতেই হয়। সিজিনের সময় নরেনের বউ কদিন কারখানায় এসে নরেনকে সাহায্য করে গেছে। যখন নরেন বাড়ি ফিরে যেতে পারতো না। রাত জেগে একা কারখানায় কাজ করতো তখন। তখন শ্যামলী সারাদিন থেকে রান্নাবান্না করে খাইয়ে বিকেলে একা ফিরে যেত বেলঘরিয়ায়। বাঁধাইয়ের কাজেও নরেনকে সাহায্য করতো নরেনের বউ শ্যামলী। এখন নেই, বাঁচা গেছে। কেন জানি, শ্যামলীকে ভীষণ ভয় করে মিতার। আর নরেনের বন্ধু বিমলকেও ভয় করে তার।

সবিতা শাড়ি বদলাচ্ছে। একবারও মিতার দিকে তাকাচ্ছে না সবিতা। মিতার ওপর হিংসা। সে ছেড়ে যাচ্ছে, মিতা কাজে বহাল থাকছে—এই হিংসে। সবিতা চোখ তুলে ওর দিকে তাকাচ্ছে না, ভুলেও তাকাচ্ছে না। সবিতার দিকে মিতা তাকিয়ে থাকে। মন ভিজে হয়। প্রসন্ন হয়। অলসমন্থর এক নরম অনুভূতিতে ঠোঁটে হালকা সরু একটুকরো হাসি নিয়ে বসে থাকে।

সবিতা চলে গেল কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে। চলে যাচ্ছে, এ কথাটা বলে পর্যন্ত গেল না সবিতা। এতখানি হিংসা সবিতার। সন্ধের ধূসর মিহি আলোর ভেতর বসে থাকে মিতা। একা। মন্টুটা পালিয়েছে। ছুটি করল গিয়ে। বাইরের আলো মরে আসছে। ঘরের ভেতর প্রায় ছায়া হয়ে ওঠে মিতা। নীরব খুঁটির মত একা হয়ে বসে আছে। আর কেউ থাকবে না, ফর্মাঘরে সে একা থাকবে। নরেনের সঙ্গে এ-ঘরে নিভৃতে দেখা হতে পারবে। নরেনকে সে পেয়েছে। আর হারাতে পারবে না।

'তুমি একা?'

চমকে ওঠে মিতা। চুপ করে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়েছে মতি।

'তুমি একা রয়েছ বলে মনে হচ্ছে?' অস্থির হয়ে মতি প্রশ্নটা করে মিতাকে।

অস্থির মতিচ্ছন্ন মতিকে দেখে মিতা।

'কি হল কথার জবাব দিচ্ছ না? তুমি একা কিনা বলবে ত?'

'একা না ত দোকা পাব কোথা?' মিতার রাগ[illegible] স্বর।

'আমার ভাল লাগছে তুমি একা আছ বলে।' আনন্দে ভরে উঠেছে মতি।

মতিকে দেখে মিতা। কি রোগা হয়ে গেছে মতি। সরু চোয়াল। চোখ দুটি ঢুকে গেছে। মতির ওপর রাগ হয়, কিন্তু মতিকে এ-রকম দেখে রাগটাকে দমন করে নেয় মিতা। হালকা এক সৌজন্য আনে মতির দিকে।

মতি তার হাঁটু ধরে পায়ের কাছে বসে পড়ে।

মতির স্পর্শে গা শিউরে ওঠে মিতার। মতি আজকাল এ ধরনের আচরণ করে কেন? সপাটে এক চড় কষাতে ইচ্ছে করে, কিন্তু পারে না। দোষটা তারই। সেই-ই মতিকে আস্কারা দিয়েছে। তার প্রেমহীন চরম নৈরাশ্যের দুর্দিনে অন্ধকার সিনেমা হলে মতির হাত বুকে গুঁজে দিয়েছে। মতির অসুস্থতার সময় মতিকে চুমু খেয়েছে। মতি যখন সিনেমা হলে অন্ধাকারে নিজে থেকে মিতার বুকে হাত দিয়েছে, বাধা দেয় নি, বরং নীরব সম্মতি জানিয়েছে। মতিকে নিয়ে ঘোষপাড়ার সতীমার মেলায় গেছে। মতি ছিল তার দুঃসময়ের সঙ্গী। তখন আরো ছোট ছিল। এখনো ছোট। তার মিতাদিকে ছাড়া মতি আর বাঁচে না যেন! মিতা সে দুঃসময় কাটিয়ে উঠেছে—এখন তার নরেনের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক। সে এখন মতিকে ওভাবে চায় না। তবু মতি পূর্বঘটনার টানে মিতার সঙ্গ ছাড়ে না। মিতা তাকে নানাভাবে প্রত্যাখ্যান করে, তবু মতি ছুটে ছুটে আসে।

মতি গোপনে তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের কথা ভাবে বুঝি! মিতাকে একা পাওয়ার ভেতর এক উল্লাস, মিতার চোখে ধরা পড়ে। মিতা শিউরে ওঠে।

'কি রে, গায়ে হাত দিয়ে বসে আছিস যে বড়?'

'ভাল লাগছে বলে তোমার হাঁটুতে হাত দিয়ে বসে আছি।'

'হাঁটু থেকে হাত সরা, আমার হাঁটুতে ব্যথা আছে।'

হাত সরিয়ে নেয় মতি।

সেদিন মিতার তলপেটে ব্যথা হচ্ছিল, মতিকে হাত বোলাতে দিয়েছিল মিতা, এই ফর্মাঘরের ভেতরেই। মতির কি যে ভাল লেগেছিল মিতার তলপেটে হাত বোলাতে! মিতা, তার প্রতি আগের মত ব্যবহার করেনি আর। কিন্তু আবার ত শুরু করতে পারে! এই সম্ভাবনার একটু আশায় হাতছানিতে ছুটে ছুটে আসে মতি। তার আর কিছু ভাল লগে না। সে রুলিং কারখানায় কাজ করে, কাজের গতির টানে। কিছুই ঠিকঠাক চলে না তার। মিতার শরীর ছোঁয়ার অনুভূতিতে মরে যাচ্ছে মতি। শরীর ছোঁবার জন্যে মিতাই মতির হাত টেনে নিত। সে এখন মিতার সঙ্গে চরম শারীরিক সম্পর্কের আশা করে। মিতাই প্রস্তাব দেবে অথবা ইঙ্গিতে জানাবে।

মতিকে মিতা এই জায়গায় নিয়ে ফেলেছে। মিতা মতিকে চেয়ে চেয়ে দেখে।

মতি ধরতে পারে, যেদিন থেকে নরেনের কারখানায় মিতা কাজে ঢুকেছে, সেদিন থেকে মিতা তার সঙ্গে আগের মত ব্যবহার করছে না। নরেন মিতাকে অন্যায়ভাবে অধিকার করেছে বলে তার মনে হয়। এবং সে ধরতে পারে, মিতা ও তার সম্পর্কের মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে নরেন। মিতা তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলেও সে কারণ ভেবে মতি মিতাকে ছেড়ে যেতে পারে না। মতির সঙ্গ ছেড়ে যাবার উপায়ও নেই। সারাক্ষণই ছটফট করে। নরনারীর দেহগত

সম্পর্ক কেমন, সে জানে না। এই রহস্য ও নিজের শরীরের ভেতর অনুভূতি-মালার আঘাতে আঘাতে মনে মনে মিতার শরীর চেয়ে বসছে সে।

'কি রে, ছুটি করেছিস ?'

'এই ত এখনই ছুটি করে এলাম।'

'মাথা কেটে ফেলেছিস। যা এবার।'

'কেন ?'

'কাজে বসব।'

'কেন, মালিক আসবে নাকি ?'

'না না।' হেসে ফেলে মিতা। মালিককে ভয় করে মতি। মালিক যখন ঘরের ভেতর থাকে, মতি দরজাগোড়া থেকে উঁকি মেরে পালিয়ে যায়। মালিক ফর্মাঘরে আসেই না।'

'তাহলে ত ভাল হয়েছে। তুমি কাজ কর, আমি তোমার কাছে কাছে থাকি।'

এ ত বেশ জ্বালা হয়েছে, যদি সন্ধ্যায় নরেন আসে, তারই অপেক্ষায় ফর্মাঘরে থাকবে মিতা, আর মতি কিনা মাঝখানে এসে ঝামেলা পাকাচ্ছে। মিতার মানসিক শৃঙ্খলা ভেঙে যায়। বিরক্ত হয়ে ওঠে। নিজের মনে দাঁত কিড়মিড় করে ওঠে, মতির প্রতি রাগে। কিন্তু মতির প্রতি সে খারাপ ব্যবহার করতে পারে না, এটা তার দোষ অথবা দুর্বলতা। 'যা না, আমাকে একা কাজ করতে দে।'

'একা কাজ করতে তোমার ভাল লাগবে ?'

'ভাল ত লাগে।'

'তোমার কাজের কোনো ক্ষতি করব না, বলছি ত চুপচাপ বসে থাকব।'

'না রে মনা, আমার মন ভাল নেই আজ। তুই যা।'

'তাড়িয়ে দিচ্ছ ?' অভিমান হয় মতি।

'তুই এসব ভাবিস ? তোর দিদি হই না ?'

মতি কি ভেবে চুপ করে যায়। নিজের মনে চুপচাপ গোঁজ হয়ে বসে থাকে। তারপর একটু নড়ে চড়ে। কি যেন ভাবে। 'তুমি রাগ করে চলে যেতে বলছ না ত ?'

'না, এমনি যেতে বলছি।'

'তা হলে আমার চলে যেতে কষ্ট হবে না।

এর পরে আর কথা বলে না মিতা। কাজে বসে যায়। মতিকে ঘাঁটাতে চায় না। তবুও মতি যায় না। বুঝতে পারে মতির চলে যেতে বড় কষ্ট হচ্ছে। মিতা কি করতে পারে আর ?

মতি উঠে দাঁড়িয়ে মিতার দিকে তাকিয়ে দেখছে। যদি তাকে যেতে বারণ করে, তারই আশা ও অপেক্ষা।

মিতা বুঝতে পারে মতির অবস্থাটা। সে যার কারণে মতির দিকে তাকাচ্ছে

না। তাকালে যদি প্রশ্রয় পায় মতি! না, নরেন যদি আসে? নরেন যে আসবেই, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তবুও মতিকে প্রত্যাখ্যান করতে হচ্ছে তাকে। মতির সঙ্গে শীতল নিষ্ঠুর ব্যবহার করছে। মতি পাতলা ও নমনীয় স্বভাবের, অন্তত মিতার কাছে, ফলে মতিকে কব্জা করা সহজ হয় মিতার পক্ষে।

মিতা মুখ গুঁজে কাজ করে।

'আসছি তাহলে?'

মিতা মুখ না তুলে, কথা বলে মাথা কাত করে সম্মতি জানায়। পরমুহূর্তে মিতার মনে আসে এতখানি নির্লিপ্ত হয়ে ভাল করছে না সে। মতিকে পেছু ডাকে 'এই শোন।'

মতি দাঁড়িয়ে পড়ে। মতির চোখ দুটি কি নরম।

মুখ ফেরায় মিতা। মতিকে দেখে। 'বাল্বের সুইচটা টেপে দিয়ে যা ত।'

মতি আলো জ্বালিয়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। মিতার হাতের ছুঁচ শিথিল হয়ে পড়ে।

মকবুলের রুলিং কারখানায় রাত্রিবাস মতির, বুড়ো আজাদের সঙ্গে। কারখানায় একা থাকতে বেশ অসুবিধে হত মতির। আগে লক্ষ্মী সাহার কারখানায় তাকে একাই শুতে হত। এখন বুড়ো ওস্তাদ আজাদের সঙ্গে থেকে তার ভালই লাগে। এমনিতে তার কাছে রাত দুর্বহ হয়ে ওঠে। মিতা না হলে তার জীবন কাটে না। তার মনের মত করে মিতাকে পাচ্ছে না। আর যদি রাত একা কাটাতে হত, তাহলে মরেই যেত মতি।

আজাদ একটা টুলে বসে। চোখ বুজে শারীরিক কষ্টের ব্যথা মুখের ওপর এঁটে এসেছে। বয়স প্রায় সত্তর। এ বয়সেও তাকে কাজ করে খেতে হয়। শিথিল চামড়ায় অসংখ্য কুঞ্চন। শরীরের কষ্ট মুখে নিয়ে ঝিমোচ্ছে আজাদ। ওস্তাদের বিছানা তৈরি করে দিয়েছে, মতিই।

মতি নিজের বিছানাটা বিছিয়ে আর অন্য টুলে বসে তার খাতাটা দেখছিল। খাতার এ-পিঠ ও-পিঠ দুই পৃষ্ঠাতেই ফিল্মস্টারদের ফটো সাঁটা আছে। ও-গুলো দেখে সময় কাটাচ্ছে মতি। রাত দশটার পরে এপাড়ায় আর কোলাহল থাকে না। এক নৈঃশব্দ ছেয়ে আসে। মৃত্যুর মত হিম অন্ধকার নেমে আসে। এখানে অসংখ্য গলির সমাবেশ। গলি জুড়ে অন্ধকার লুকিয়ে থাকে।

আজাদ মুখ তুলল একটু। সামান্য পাশ ফিরল মতির দিকে। ডাইনে। মতি তাকাল ওস্তাদের দিকে'

লুঙ্গির ট্যাঁক থেকে একটা সিকি বের করে কাঁপা করতল মেলে ধরল মতির চোখের সামনে। 'ভাই মতি, একটু খাবার সোডা এনে দিবি?'

বৃদ্ধের মুখে কষ্টের চিহ্ন দেখে একটু দয়া হয় মতির। মতি আজাদের এটা ওটা করে দিয়েই থাকে। লোকটা কতদিন আর বাঁচবে। তাছাড়া আজাদ

তার রাত্রিবাসের সঙ্গী। কম বড় কথা নয়।

পয়সাটা হাতে নিয়ে আবার দেখতে লাগল খাতাটা। এসব ফটো সে দোকান থেকে কিনেছে। দু-একটা ফটো খবরের কাগজ থেকে কেটে নিয়ে খাতায় সেঁটেছে। এসব ছবি দেখলে মনে মনে অস্থির হয় বড়। নায়িকাদের অর্ধনগ্ন ছবি তার চোখ আটকে দেয়। একবার কিছুক্ষণ দেখে আবার দেখতে ইচ্ছে করে। পাতা উল্টে আবার ফিরে আসে সে ছবিতে। তাতে মিতার প্রতি আকর্ষণ বাড়ে। মিতা তাকে কুরে কুরে খায়। নায়কদের ছবিগুলোও তার ভাল লাগে। নায়কদের চুলের মত তার চুল হবে, এটা ভাবে সে। তার তাকানোর ভঙ্গিতে সেও তাকানো নকল করে মনে মনে। সিনেমার দৃশ্যের সঙ্গে মিলিয়ে নায়কের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে নিজের ব্যক্তিত্ব নকল করে।

'এ ভাই মতি !'

পাশ ফিরে আজাদকে দেখল মতি।

আজাদের মুখের ওপর একরাশ কষ্ট ছেয়ে আছে। আজাদের হজমের অসুবিধে, অম্বলের ব্যথা—খাবার সোডা খেয়ে সামাল দেয়। আজাদের কষ্ট ও অস্থিরতা বাড়ে।

মতি ছবি দেখা থেকে লোভ সরিয়ে নিতে পারছে না। আজাদের অস্থির তার টের পায়। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে। মতি মনে মনে পুলকিত হয়, ছবি দেখে। ঠোঁটে একটু হাসি লেগে থাকে। মৃত্যুর হাসির মত ছোট্ট।

'যাবি না ভাই !'

ফটাস শব্দে খাতাটা বন্ধ করে মতি। 'কথাটা ত এই বললে, একটু দেরি সইছে না ?'

আজাদ চোখ বুজে ফেলে। আর কোনো কথা বলবে না। সে জানে, মতি যখন রাগ করে, তখন তাকে ভালবাসছে বুঝতে হবে। এখুনি সোডা কিনতে যাবে।

বেরিয়ে আসে মতি। এখন বেশি দোকান খোলা থাকে না। এলাকায় মাত্র দুটি দোকান খোলা থাকে। উত্তরদিকে একটা, দক্ষিণ দিকে আরেকটি। উত্তরদিকে দোকানটায় যায় মতি। এদিকটা অনেকটা অন্ধকার। অনেকটা ঘিঞ্জি। অনেকটা নির্জন। মিতার ফর্মাঘর এখানেই। নরেনের কারখানা সামনে পড়বে, তারপর মিতার ফর্মাঘর। মিতা তার সঙ্গে কেন এখন দুর্ব্যবহার করে, মতি খানিকটা বুঝতে পারে। মিতাকে অধিকার করেছে মালিক নরেন। মিতাকে নরেনের পিঠে হাত ঠেকিয়ে দাঁড়াতে দেখেছে। দুজনে মুখোমুখি অনেকক্ষণ কথা বলে দেখেছে। সে এইটুকু ভেবে সান্ত্বনা পেয়েছে, মিতার কোনো দোষ নেই, কোনো ইচ্ছে নেই। নরেন তাকে অধিকার করেছে। নরেন মালিক বলে জোর খাটাতে পারে।

আরো খানিকটা অন্ধকারে ঢুকে যায় মতি। টুক টুক হাঁটে। চেনা পথ,

অন্ধকারেও হে'টে যেতে পারে। হালকা আলোর রেখা রাস্তায়। দোকানটা খোলা। একজন মাঝবয়সী লোক দোকানের পাটায় বসে সোডা কিনে নেয় মতি।

নরেনের ওপর ক্রোধ হয় বড় তার। মিতার মন অধিকার করে আছে নরেন। নরেনকে যদি মেরে ফেলতে পারে! যেন মেরে ফেলি, মনে হয় তার। যদি নরেনের জন্যে মিতা ফর্মাঘরে আজ থেকে যায়, এই দুশ্চিন্তা আসে তার। আজকাল নরেনও কারখানায় রাত কাটায়। মিতা ফর্মাঘরে থেকে গেল, আর নরেন অনেক রাতে মিতার কাছে এল। এ রকমটা সত্যিই চায়। মিতা ফর্মা-ঘরে থেকে গেলে, রাতে মিতার কাছে চলে আসবে মতি। সমস্তটা ঘটবে মিতার ইচ্ছেয়, মিতার আদেশে।

ভয় পায় মিতা আজ রয়ে যায় নি ত!

গলিতে ঢুকতে গিয়েই গলির মুখে ঝুলে থাকা চালার টিনের কাছে থমকে যায় মতি। আর একটু হলে মাথার ভেতর টিনের কোনা ঢুকে যেত। সাবধানে গলির ভেতর ঢুকে যায় মতি। ফর্মাঘরের দরজায় তালা। আর চারপাশে অন্ধকার। ঘরের ভেতর অন্ধকার। ফর্মাঘরে কেউ নেই। না নেই।

ফিরতে থাকে মতি। একটা কুকুরের গায়ে পড়ে যায়। কুকুরটা ভয়ে আর্তনাদ করে ওঠে। সাধারণত এপাড়ার কুকুরগুলো শান্ত এবং ভীত হয়ে থাকে। তাদের প্রতাপ নেই তেমন। না খেতে পেয়ে শরীর জরাজীর্ণ। এক-পাশে চুপচাপ পড়ে থাকে।

মতিকে কামড়ায় নি।

কারখানায় নিঃশব্দে ঢোকে মতি। দেখে আজাদ বুড়ো চিৎ হয়ে শুয়ে আছে নিঃসাড়ে। চোখ বোজা। মরে গেল না ত! কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখে বুকের খাঁচাটা সামান্য উঠছে পড়ছে। সে বুঝতে পারে, তার ফিরে আসতে দেরি হওয়ায়, আজাদের অভিমান হয়েছে। চুপ করে পড়ে আছে তাই।

আর ত মতির কেউ নেই, এই ওস্তাদবুড়ো ছাড়া। বাড়িতে মা ভাই বোনদের কাছে কতদিন যায়নি। তারা তার কাছে নেই হয়ে গেছে। যেতে তার ভাল লাগে না। যা রোজগার করে খরচ হয়ে যায়। একমাত্র আজাদই তার সঙ্গী। আজাদের ওপর তার একরকম ভালবাসা জন্মেছে। আজাদ অভিমান করলে, অভিমান বোঝেও মতি।

একগ্লাস জল ঢেলে আজাদের মাথার কাছে নিঃসাড়ে এগিয়ে যায় মতি। বাঁ হাতের ভেতর সোডার মোড়ক। আজাদের মুখের দিকে নুয়ে পড়ে, বাঁ-হাত দিয়ে আজাদের মুখ নাড়ায় মতি। মতির আঙুল ভিজে যায়। আজাদের অশ্রুতে। মতির মন ভিজে ওঠে। মুখ ধরে নাড়ায়। 'ওঠো চাচা, সোডা এনেছি।' জলের গ্লাস রাখার শব্দ করে।

আজাদের হাত ধরে টানতে, আজাদ নিজে থেকে উঠে বসতে চায়। পারে

না। শিথিল অথর্ব শরীর তার। মতি ভাবে, বুড়োটা তারই কাছে এইভাবে থাকতে থাকতে মারা যাবে না ত! আজাদকে টেনে তোলে মতি।

আজাদ উঠে বসে। আজাদের হাতে সোডার মোড়কটা গুঁজে দেয় মতি। 'শালা মটকা মেরে পড়েছিল।'

আজাদ সোডার মোড়ক খুলে সোডা খায়, জল খায় কাঁপা হাতে। হাত দুটি তার কাঠিসার। গেলাসটা শারীরিক বিষাদে পাশে হালকা শব্দে রেখে দেয়। বসে থাকে আজাদ। শুতে আর ইচ্ছে করছে না তার। কেমন ঝিমিয়ে আছে।

মতি আজাদের মুখোমুখি বসে পড়ে, আজাদের হাঁটু নাড়ায়। 'ও চাচা কথা বল।'

আজাদ নিস্পৃহ হয়ে আছে, তাকে জাগাতে চায় মতি। 'কথা বল।' হাঁটু নাড়া দেয়।

একটু একটু জেগে উঠছে আজাদ। কিন্তু মুখে তার কষ্টের ছাপ। জীবন এতদূর বয়ে আনার কষ্ট। কষ্টের জীবন বয়ে আনার কষ্ট। চোখ মেলে তাকায়। মতির দিকে তাকায়। 'কি কথা বলব?'

'তুমি যা জানো, সে সব কথা বল।'

'কি জানি!'

'হ্যাঁ, তুমি জানো। পুরনো দিনের গল্প বল।'

'তখন রুলিং লাইনটা ভাল ছিল।'

'কেন ভাল ছিল?'

'তখন দুধ কও, মাছ কও, খেয়েছি। এখন খেতে পাই না। আমাদের সেই দেশ, এখন আমরা কি খাচ্ছি? আর এখন মানুষ কী খাবে? মানুষের অভাব কতদিন থাকে? এ ত চিরদিন অভাব। মানুষের স্বাধীন করবে,—মরবে মানুষ—সে ত একবারই মানুষকে বিপ্লবী করবে, একবারই মানুষ মরবে, এ ত রোজই মরছে। দেশে তেল নেই, জিনিশ নেই। ভাবলাম ইংরেজকে তাড়িয়ে দিলাম, খুব সুখে থাকবো। এখন দেশে খাবারই নেই। ইংরেজকে তাড়িয়ে নাই ত্যাল, চাকরি নাই। এরা মানুষের কী করবে? তুমি দেশ চালাচ্ছ, তুমি জানো না, মানুষ কী করে বাঁচবে?' আজাদ হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। অস্থিরতা আসে তার।

'তারপর চাচা?'

'তারপর আর কি'।

'তোমার যখন আমার মত বয়স ছিল, এ লাইনে ভাল মাইনে ছিল?'

'না, মাইনে বেশি ছিল না। তবে খাবার-দাবার জিনিশপত্রের দাম কম ছিল।'

'তোমার ওস্তাদ কে ছিল?'

'লতিব মিয়া। কবে মরে গেছে সে।'

'তখন নাকি বেশি খাটতে হত ?'

'হ্যাঁ, সকাল ছটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত। রাস্তায় গ্যাসলাইট জ্বলতো। ভিস্তিঅলা পানি দিয়ে রাস্তা ভিজিয়ে যেত। কারেন্ট ছিল না, কারখানায় হ্যাজাকবাতি জ্বলতো। কারবাইডের বাতিও জ্বলতো।' আজাদের চোখ চিক চিক করে ওঠে। দূর অতীত আর যৌবনের দিকে চোখ চলে যায় তার। মনে মনে সে সব স্মৃতির ছবি দেখতে পায়। ভেসে ওঠে তার এই শেষবেলার জীবনে। তার মত করে তখন ভাল এখন খারাপ সে বলে। তার জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েই বলে। যৌবনে পরিশ্রমক্ষম ছিল, এখনের থেকে ভাল খেতে পরতে পেরেছে। আর তার সঙ্গে যৌবন ছিল তার।

'তারপর ?'

'লেবার আন্দোলনের 'অ্যাসিসটেন' হই আমি।'

'কেন ? লেবার কাকে বলে ?'

'লেবার আমাদেরকেই বলে, যারা কাজ করে। আটঘণ্টার বেশি কাজ করব না আমরা আন্দোলন করি। আমাদের আন্দোলন করতে ইয়া শিক্ষিত মেয়ে-ছেলে উৎসাহ দিয়েছিল। মিসেস প্রভাবতী দাশগুপ্ত। পি এইচ ডি।'

'পি এইচ ডি, কি ?'

'ওটা নামের পরে বসে, নামই।'

'তোমার সঙ্গে কথা বলত ?'

'কেন বলবে না ?'

'তারপর ?'

'তারপর এক গুণ্ডা দিয়ে আমার মাথা ফাটিয়ে দেয়।'

'তুমি মার খেয়েছিলে, মারনি ?'

'না। মারতে পারতাম, মারিনি।'

'কেন ?'

আজাদ চুপ করে যায়। এ কথার জবাব দিতে তার ইচ্ছে করছে না।

'তোমার দেশ কোথায় ছিল ? গ্রাম ?'

আজাদ মনে করতে পারে না। তাই ত তার গ্রাম ছিল কোথায় ? দেশ ছিল কোথায়। স্মৃতি হাতড়ায়। কিছুটা বন্দ হয়ে থাকে ভাবনায়। ভাবতে ভাবতে খুঁজে পায়। নামগুলো কানে বাজে। সে দেশের স্মৃতির কথা তার মনে নেই। বলল, 'টাঙ্গাইল জেলার সেলিমাবাদে বাড়ি ছিল।' এই নামটুকুই তার মনে আছে। আর কিছু তার মনে নেই।

'কত বছর বয়স থেকে এখানে কাজ করছ ওস্তাদ ?'

'দশ বারো বছর আমার বয়স ছিল তখন।'

'তোমার ভাইবোন কজন ছিলে ?'

'জানি না।'

'মনে করে বল না।'

'তোর জানার দরকার কি?' মুখ ফিরিয়ে মতিকে দেখে আজাদ। দুজনেরই আজ কথায় পেয়েছে। কথা বলতে ভাল লাগছে। তারা রাত জেগে কথা বলছে। কখনো এমন হয়, একজনের কথা বলতে ইচ্ছে করে, অন্যজনের কথা বলতে ইচ্ছে করে না। একজন অপরজনের ওপর তীব্র নিষ্ঠুরতায় চুপ করে থাকে।

মতি বলল, 'বলই না চাচা।'

'তিন বোন দু-ভাই ছিলাম আমরা।'

'তারা সব কোথায়?'

'জানি না।'

'বেঁচে আছে?'

'জানি না।'

'তোমার বউ বেঁচে আছে?'

'মরে গেছে আজ দশ বছর।'

'তোমার ছেলেমেয়ে কটি?'

'চার মেয়ে এক ছেলে। ওদের সব বিয়ে হয়ে গেছে। বড় মেয়েটা মরে গেছে বুঝলি। ছেলে খেতে দেয় না। তারও সংসারে খেতে অনেক।'

'ছেলে থাকে কোথা?'

'গ্যাস স্ট্রিটে। তিন নম্বর। ওটা আমারই বাসা।'

'কটা ঘর?'

'একটাই। ওদের অসুবিধে হয় বলে এখানে কারখানায় থাকি। আর হাঁটাচলা করে যেতেও পারি না। এখনো নিজে খাটি নিজে খাই। ছেলে প্রেসে কাজ করে, ছেলের পয়সা কম। খেতে দেয় না।'

দুঃখী ও বিমর্ষ দেখায় আজাদকে। 'ঘরটা ত তোমার?'

'হ্যাঁ। এখন আমার কি আর আছে?'

'এখন ভাড়া দিতে হয় কত, ঘরটাতে!'

'সতের টাকা।'

'সিনেমা দেখতে চাচা?'

ঘাড় ফিরিয়ে মতিকে আবার দেখে আজাদ। কিছুটা রাগে গরগর করে এই প্রশ্নের প্রতিক্রিয়ায়। বুঝিবা আজাদকে স্মৃতি নাড়া দিচ্ছে। যৌবনের স্মৃতিদিন নাড়া দেয় তাকে। সেদিনে ফিরে যেতে পারবে না বলে তার রাগ। ধীরে ধীরে নিজেকে গোছাতে থাকে। দুই হাঁটু মুখের দিকে তুলে বসেছে। মুখে দাড়ির জটলা। গলার হাড় বেরনো। পাঁজর একটা একটা করে গোনা যায়। তার ওপর শিথিল কুঞ্চিত চামড়া জড়ানো। দাঁত পড়ে গেছে অনেক-

গুলো। ঠোঁট দুটি মুখবিবরে ঢুকে যায়। হনুর হাড় বেরনো। গালের দু পাশ চুপসে গেছে। ঢোকা চোখ দুটির ওপর স্মৃতির ছবি ঝিলমিলিয়ে যাচ্ছে।

'আমাদের সময়ে সাইলেন্স বায়স্কোপ ছিল। তারপর টকি হয়। যখন সিনেমাতে কথা বলে ছবিগুলো, দুনিয়ার লোক সব পাগল হয়ে গেল। ছবি কথা বলে নাকি?'

'হা হা' করে হেসে ওঠে। মজা হয় মতির।

'হাসি নয়। সে কি সিনেমা দেখার ভিড়।

'কি বই দেখলে?'

'প্রথম বই দেখি 'সোনার সংসার'।'

'টিকিটের দাম কত ছিল তখন?'

'ফোর কেলাস ছ পয়সা, সেকেণ্ড কেলাস বারো পয়সা ছিল।'

'এত কম?'

'তখন ছ পয়সার দাম ছিল কত? এক পয়সায় পেটভরে নাস্তা খাওয়া যেত।'

এসব শুনে হাসি পায় মতির। 'সিনেমা দেখতে খুব?'

'টকি দেখতাম আর থিয়েটার দেখতাম। স্টার থিয়েটারে 'বিল্বমঙ্গল', 'চণ্ডীদাস' দেখেছি।'

'থিয়েটারও দেখতে?' হাসে মতি। হাসিতে হাসিতে ছেয়ে যায় মতি। আজাদ ওস্তাদের পুরনো দিনের কথায় তার বড় হাসি পায়। খিল খিল হাসিতে লুটিয়ে পড়ছে মতি।

আজাদ মতিকে হাসতে দেখে। মতির এত হাসির কি আছে। যা সত্যি, তাই ত বলেছে। তার ত হাসি পাচ্ছে না। ফোর কেলাস ছ পয়সার ছিল। এক পয়সায় পেটপুরে নাস্তা করা যেত। তখনকার সিনেমা কথা বলতো না।

'তারপর।'

আজাদ শুয়ে পড়ে।

মতি ওস্তাদকে নাড়ায়। 'তারপর?'

আজাদের মুখে কষ্ট ছেয়ে আসে। 'আলো নেভা।' চোখে আলো সইতে পারছে না।

মতির হাসি থেমে যায়। গম্ভীর হয়ে আসে মতির মুখ। স্থির চোখে আজাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার এখন কথা বলতে ইচ্ছে করছে, আজাদ কথা বলবে না আর। এরকমটাই প্রায় ঘটে। আজাদ যখন কথা বলতে চায়, তখন মতি কথা বলতে চায় না এরকমই।

আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ে মতি। কথা বলার জন্যে সে ছটফট করে। আজাদ কথা বলছে না। আজাদ এখন নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে। জেগে একা একা থাকতে মতির বড় কষ্ট হয়।

ফর্মাঘরে একা কাজ করতে করতে, সেই যুবকটির কথা মনে পড়ে যায় মিতার। যে কিনা তার জীবনের কথা জানতে চেয়েছিল। জেনেছিলও। যুবকটি নাকি, এ লাইনে যারা কাজ করে, তাদের নিয়ে গবেষণা করছে। সে বিধবা, তার বিয়ে করতে ইচ্ছে করে কিনা, কাউকে তার ভাল লাগে কিনা, এসব প্রশ্ন করে জানতে চেয়েছিল। মিতা মনে মনে ভাবে, এসব হিসটিরি বলে কিছু হবে? কিছু হবে না। খুব কষ্ট করে মানুষ হলাম। শিক্ষিত সেই যুবকটিকে শুনিয়েই সে যেন মনে মনে বলতে চায়। বড় হলাম। বিয়ে হল। স্বামী ছাড়া আর কি আছে মেয়ের জীবনে? দশ বছরও বিয়ে হয়নি। ছবছরে বিধবা। আমার পিসতুতো বোনরা আমার চেয়ে বয়সে বড় তাদের এখনো বিয়ে হয়নি। আর আমার এর মধ্যে বিয়ে সংসার ধর্ম ছেলে হয়ে গেছে। জীবন শেষও হয়ে গেছে। এসব কি বলার লাগবে? না বললেও ত সে কেমন আছে, বুঝে নেয়া যায়। বলতে লাগে না। মুখে বলতে গেলে ত মিথ্যে করে বলতে হবে। বুঝে নিতে হয় না মানুষকে? সত্যি সত্যি তার বিয়ে করতে ইচ্ছে যায়, এ কথা কি মুখে বলতে পারে? এ প্রশ্ন শুধায় কেন? কাউকে তার ভাল লাগে, এ কথা জিজ্ঞাসা করে জানতে হয় কেন? মানুষের মন সে জানে না? আমার জায়গায় নিজেকে মনে মনে বসিয়ে নিয়ে উত্তর পেয়ে যাবে সে।

যুবকটি তবু যদি জিজ্ঞাসা করে, তাহলে সে মিথ্যে করেই বলবে। সে বিয়ে করতে চায় কিনার উত্তর। বলবে, 'আমি বিয়ে করতে চাই না আর।' হল ত? মিতাকে ধরবে কী করে? বলবে, 'আমি বিয়ে করব, হয় নাকি এটা? সবার মন ত সমান নয়। আমার নিজের বাধা আসছে।' লোকভয়, সমাজের বাধার কথাই সে বলবে না। তাহলে বেকাদায় ফেলে দেবে যুবকটি। বলবে, 'কি দরকার? এখন কি আর তা হয়? আমার ছেলে আছে। তার ভবিষ্যৎ আছে। আমার সুখের জন্যে বাচ্চার ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে চাই না। আমি এসবের জন্যেই বিয়ে করতে পারবনা। এর মধ্যে কাউকে আমার মনে ধরেছে, কাউকে আমার ভাল লাগে, কাউকে আমি ভালবাসি, কাউকে মনে ধরলেও, কাউকে ভাল লাগলেও, কাউকে আমি ভালবাসলেও, তাতে আমার করবার কিছু আছে? বলেন?' তারপর বলবে 'কথাটা কাউকে বলতে না পারলে কষ্ট পাব। কাউকে বলাও যাবে না, যাকে ভালবাসি, যাকে বিয়ে করতে চাই। আর বিয়ে করাও যাবে না। তাহলে স্বাভাবিক, কষ্ট পাব।'

তারপর বলবে 'যাকে ভালবাসি, তার সঙ্গে দেখা হবার আকুলতা আমার আছে। তারও আকুলতা থাকে। কিন্তু এতে কি হয়, কি হবে? কিছু কি সম্ভব? আপনি বলুন? আপনি একটা পথ বাতলে দিতে পারবেন?'

'ধরুন, যাকে ভালবাসি, তার বউ আছে, মেয়ে আছে। আমার ছেলে আছে, শ্বশুর দেওররা আছে। এখন আমরা কী করতে পারি? আপনি এর সমাধান কী করে করবেন?'

কল্পিত প্রশ্ন নিজেই তৈরি করে, নিজেই উত্তর দেয় মিতা।

এখন সত্যি সত্যি ভাবে মিতা, এখন তার কী হবে? নরেনকে ভালবাসে, এর পরিণতি কোথায় গিয়ে ঠেকবে? তার ভালবাসা কী চায়? প্রেমের ত একটা নিজস্ব ধরন আছে। তাতে, পাওয়া পাওয়ির প্রশ্নটা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। সেটা কীরকম? শুধু কি ভালবেসেই যাবে? জানে না, কিছুই জানে না, কী হবে।

বার বার সেই যুবকটিকে, তার কথা দিয়ে হারায়। কথাটা তার কথা নয়। সমাজ সংস্কার নীতিজ্ঞানের কথা। যুবকটিকে হারিয়ে হারিয়ে ক্লান্ত হয়ে যায় নিজেই মিতা। আর তখন সে নিজেই যুবকটির কাছে হারতে শুরু করে। হেরে হেরে যায়। হ্যাঁ সে বিয়ে করতে চায়। শ্বশুর দেওর জা ছেলে এদের ভুলে গিয়েই। নরেনকে নিয়ে তার সংসারের স্বপ্ন। নরেন সব ছেড়ে-ছাড়ে দিক। নরেন তার বউ মেয়েকে ভুলে যাক। কারখানা ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে অন্য কোথাও নিয়ে চলে যাক তাকে। এখানে যারা তাদের চেনে, তারা কেউই দেখতে দেখতে পাবে না, এমন জায়গায় নিয়ে চলে যাক নরেন। যদি নরেনকে রিক্সা টানতে হয়, রিক্সা টানবে! যদি তাকে লোকের বাড়িতে ঝিগিরি করতে হয়, ঝিগিরি করবে। নতুন করে জীবন শুরু করতে পারবে, সব ভুলে গিয়ে। সব। এসব কথা কি নরেনকে বলা যায়? বলা যায় না। নরেন যদি নিজে থেকে বলে, তাহলে তার নিজের মনে মনে বলার ভাবনার স্বপ্নসফলতা খুঁজে পাবে মিতা! এমন স্বপ্ন নিয়ে তাকে থাকতে হয়। সে জীবনের কি বাস্তবতা, সে কল্পনা করে। সেই কল্পনা নিয়েও তাকে থাকতে হয় স্বপ্নকল্পনার বাস্তবতা।— যে বাস্তবতা সে পায় না।

যুবকটি তার কথা নিয়েই পালায়। তার জীবনের সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধের দায়িত্ব নেই। তার জীবনের সন্ধান নিয়ে চলে যাবে। কিন্তু তাতে মিতার কী হবে? মিতা জানে তাতে তার জীবনের সুরাহা কিছু হবে না। খুব ঘনিষ্ঠজনের মত কথা শোনার মত বন্ধুও সে নয়। যার সঙ্গে দেখা করতে পারবে নিকট প্রতিবেশীর মত। তাও নয়। তার জীবনের নানা টানাপোড়েনের সুখদুঃখের কথা জানাবে, দৈনন্দিন সম্বন্ধ থাকবে না। প্রতিদিনের দুঃখ-দৈন্যের কথা কাউকে প্রতিদিন বলতে পারলে সে খুশি হয়, অথচ একদিন এসে, তার কথা শুনে মিতার কী হবে? তাকে সত্যি বলার দায়িত্ব নেবে কেন সে?

সবিতা আর এ ঘরে কাছে নেই। মিতা একাই কাজ করে। সবিতা থাকায়, এক বেদনা মিতাকে কুরে কুরে খেত। নরেন এ ঘরে এলে নরেনকে একা পাওয়া যেত না। এখন সবিতা চলে যাওয়ায়, মিতা একাই। কিন্তু একা একা সময় বসে নিয়ে যাওয়া বড় কষ্টকর। শূন্য সময়ের বেদনা। সবিতা থাকায় তবু কথা বলে মন ভুলে থাকতো। ভুলে থাকতো নরেনকে তবু। এখন নরেনের সঙ্গ একা ঘরে পায় না, সেই প্রত্যাশায় সারাক্ষণ একা থাকতে হয়,

নরেনকে না ভুলে, সারাক্ষণ।

বিকেলের আলো প্রতিদিন মরে যায়, দরজার বাইরে, গলির ভেতর, প্রতিদিন মরা ধূসর আলোয় মুখ ফিরিয়ে দেখা ক্লান্তকাতর হয়ে ওঠে। প্রতিদিন।

মিতা মুখ ফিরিয়ে দেখল মতি মুখ বাড়িয়েছে!

রাগ হয় মিতার। মুখ গুঁজে ধরে। 'তুই?'

কাছে এসে দাঁড়ায় মতি। 'কেন, এসেছি ত কী হয়েছে?'

মতির রোখা ভঙ্গিটা দেখে মিতা। 'মালিকের ফর্মাঘরে প্রতিদিন এমন জ্বালাবি?'

'আমি এলে জ্বালা পাও তুমি?' কঠোর শক্ত মুখ মতির।

মতির দিকে মুখ তুলে তাকায় মিতা। 'হ্যাঁ যদি বলি?'

মতি এই কথার আঘাতে চুপ হয়ে যায়। একেবারে নিশ্চুপ জলের মত নীরব হয়ে পড়ে। এবং দাঁড়িয়েই থাকে। সে চলে যেতে পারতো। এই কথায় চলে যাওয়ারই কথা। কিন্তু তার অপমান তাকে যত তীব্রতায় কুরে কুরে খায় তত সে মিতার সামনে দাঁড়িয়ে থাকার অপরাধ ভালবেসে ফেলে। তাতে তার রাগ আরো তীব্রতা আকার ধারণ করে। অনড় দাঁড়িয়ে থেকে মিতার দিকে একদৃষ্টে বড় বড় অগ্নিময় চোখে তাকিয়ে থাকে।

মতির দিকে চোখ তুলে ভয় পায় মিতা। মতি তার জীবনে কালো ছায়ার মত এঁটে আছে। যতই তাকে তাড়াতে চায়, সরে না। মতি তার জীবনের এখন শত্রু। বড় অসহায় বোধ করে মিতা। মতি কি চায়? মতি বোধহয় তার শরীর চায়। মতি ত তাকে বাঁচার জীবন দিতে পারবে না। মতির এটা অন্যায়। মতিকে নিয়ে খেলেছে সে, আগুন নিয়ে খেলেছে। মতি তার কাছে কাছে থেকে এমন আহত হলে, মতি তাকে খুন করে ফেলতেও পারে। মিতা ত মরতে চায় না। মতির এই চাহনিকে ভয় পায় মিতা। মতিকে শান্ত করাবে কী করে? কোন্ যাদুমন্ত্রে? মতির প্রতি কড়া ব্যবহার করা কি উচিত হচ্ছে তার?

'কি হল, দাঁড়িয়ে আছিস কেন? বোস।'

মিতার এই নরম কথায় সঙ্গে সঙ্গে স্নিগ্ধ কেঁপে ওঠে মতি। আর বসে পড়ে মিতার পাশে।

মিতা ভাবে, নরেনের জন্যে অপেক্ষা করে আছে এখানে, মতির জন্যে নয়। মতিকে কাছে বসাতে হয়। বড় অসহায় মিতা। কেন মতি তার জীবনে এসে পড়ল? মতির মরণও হয় না? মতির মৃত্যু হলে মতির শত্রুতার হাত থেকে তার জীবন ছাড়িয়ে নিতে পারতো। মতিকে ভয় করে ভীষণ। কেমন নরম শান্ত ছিল। এখন মতির চোখ মুখ ক্ষুধার্ত জন্তুর মত লাগে। অথচ নিজে মেরে ফেলতে চায় না মতিকে, মিতা। মতি এমনিতে যদি মরে যায়, যাক। মতির এই অবস্থার জন্যে তার নিজেরই দোষ বলে কঠিন হয়ে উঠতে পারে না মিতা।

মতির সঙ্গে ভাল ব্যবহার করার দায়িত্ব নেয়নি ত সে? মতির জীবনে ভাল কথা শোনাবার ইজারাদার সে নয়। কোনো দায়িত্ব নেই তার। মতি উচ্ছন্নে যাক।

ঘুরেফিরে মতির মরণ কামনা করে সে। মতির দিকে শান্ত তাকিয়ে থাকার ভেতর। কীভাবে মরণ হবে মতির? একেবারে নেই হয়ে যাবে মতি? তাকে বিরক্ত করতে আসবে না আর। জীবনে মতির সঙ্গে তার দেখা হল কেন?

মুখ তোলে মিতা, 'আমার কাছে সারাক্ষণ থাকতে তোর খুব ভাল লাগে?

মতি মাথা হেলায়, হাসে।

'আমি মেয়েছেলে বলে তোর ভাল লাগে?'

'ধ্যাৎ!'

'ধেৎ কি যা সত্যি, তাই বললাম। বল?'

মতি কিছু অস্বস্তি বোধ করে। 'এসব কথা বলছ কেন?'

'তুই জানিস না, কেন বলছি:'

মতি প্রকাশ করতে পারে না। তার এক লজ্জাবোধ আসে। যেরকমভাবে মিতা মতির হাত বুকে তুলে নিত, সিনেমা হলের অন্ধকারে, আর সেই অন্ধকারের বাইরে, ছোটভাই সে,—এই সম্পর্ক বিশ্বাসের কথা বলতো মতিকে, তেমন রকম এই মুহূর্তে ছলনার খোলস খুঁজে পায় মতি, তার নিজের সত্য ঢাকতে। 'মেয়ে বলছ যে, তুমি ত আমার দিদি। দিদি বলেই তোমার কাছাকাছি থাকতে ভালবাসি। তোমাকে ছুঁলেও আমার কিছু হয় না। দিদিকে ভাই ছোঁয় না বুঝি?'

এরকম কথা মিতাও বলতো। মিতার কথার ছলনা ধরেছে মতি। মিতা ভাবে, তাহলে মিতার ছলনা ধরতে পারতো মতি। মিতা মতির শরীর ছুঁতে চাইতো, মতির পুরুষস্পর্শ চাইতো, এই সত্য জানতে পেরেছে মতি, এটা ধরতে পারে মিতা। তাতে চমকায় মিতা। তাহলে এটাও সত্যি, তার পুরুষস্পর্শের আকাঙ্ক্ষা দিতে খুঁজে পায়, মতি তার নারীস্পর্শ কামনা করে। দিদি বলাটা তার ছলমাত্র।

'হাঁ করে দেখছিস কি?'

'দিদিকে দেখতে বারণ?'

মিতা কেঁপে ওঠে মতির এ কথায়।

'তোমাকে ছুঁলেও আমার দোষ হবে না।' কথাটা বলে মিতার কাঁধে হাত রেখে, সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে নেয় মতি।

মতির গরম হাতের স্পর্শ পায় মিতা। মতিকে কীভাবে তাড়াবে? মতির বয়স, অভিজ্ঞতা কম। মতির হাত টেনে নিতে পারতো মিতা। মতির সে সাহস নেই। মতি যতই দিদি বলে তার সঙ্গে খেলতে আসুক, মতি তার মত পারবে না। দিদির সম্পর্কের ছলনায় মতিকে আমন্ত্রণ করেছিল মিতা, দিদি

সম্পর্কের ছলনায় সম্পর্কে মতিকে প্রত্যাখ্যান করতেও পারবে মিতা। ফলে, মনে মনে হাসে মিতা, মতির উদ্দেশে।

'যা, এখন যা, সকালের দিকে এসে আমার মাথা ছুঁয়ে যাবি। পা ছুঁয়ে যাবি, পিঠ ছুঁয়ে যাবি। দিদিকে ত ছুঁবি, নাকি?'

মিতার এই কথায়, মনে মনে রাগ হয় মতির। তার লোভনতাকে আহত করছে মিতা। আবার এক প্রশ্রয়ও খুঁজে পায়। দিদির কাছে ভাইয়ের আসার অধিকারটা পেয়ে যায়। এই দিদি ভাইয়ের সম্পর্কের ভেতরই মিতা অন্ধকার সিনেমা হলের ভেতর মতির হাত বুকে তুলে নিত। এই দিদি ভাইয়ের সম্পর্কের ভেতর এখানে থেকে মিতা তাকে যদি মিতার শরীরের একেবারে নিকটে যেতে আহ্বান করে, এই আশাও খুঁজে পায় মতি।

'কি রে বসে আছিস? এখন কাজ করতে দে। যা, সকালে আসিস।'

মতি হাসে।

মিতা কাঁচি তোলে। 'মার খেয়ে মরবি।'

মতি উঠে দাঁড়ায়। 'মারতে পারলে ত!'

'তোকে মারতে পারব না বুঝি?'

'ভাইকে দিদি এরকম কাঁচি ছুঁড়ে মারে নাকি?'

'কেন মারতে পারব না?'

'না।' মতি হাসছে।

মিতার অন্তর জ্বলে যায়। 'দেখবি কেমন মারতে পারি?' মতিকে তাক করে মিতা।

মতিকে কাঁচি তাক করে আছে দেখে মতির কিছুটা আশঙ্কা হয়, সত্যি সত্যি তাকে ছুঁড়ে মারবে কি না। যদি সত্যি মারে, তার বিশ্বাস ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়বে।

মিতা মতিকে মারতে পারলেই বাঁচে। মিতার পক্ষে মতিকে মারা এই মুহূর্তে সহজ। এবং তার ইচ্ছেটাও এই মুহূর্তে প্রবল। মেরে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেনা মিতা। কাঁচির এই আঘাতে একেবারে মতি ত মরে যাবে না? তারপর মতির মুখোমুখি হবে কীভাবে? কাঁচিটা হাতে ধরে রাখতে পারে না মিতা। প্রতিহিংসায় পুড়ছে সে। ছুঁড়ে মারবে সে। বড় বেদনা। সহসা কাঁচিটা ছুঁড়ে মারল সে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে মতির গায়ে না মেরে দেয়ালের গায়ে সজোরে মারল। দেয়ালের গায়ে কাঁচিটা ঝনাৎ শব্দ তুলল। কাঁচিটা মেঝেয় ঝনাৎ শব্দে পড়ল, তার সঙ্গে ছিল পলেস্তরা খসে পড়ল। মতি চমকে ওঠে। হাত দুটি বুকে গুঁজে থমকে যায়। দেখে মিতাকে। মতির গায়ে লাগল না, তাই হেসে ফেলে মিতা। 'যা, কাঁচিটা কুড়িয়ে দিয়ে যা।'

থমকে যাওয়া অবস্থাটা কিছু পরে কাটে মতির। তাকিয়ে দেখে, মিতার

চোখে কোনো হিংসা আছে কিনা।

মিতা হিংসা প্রকাশ হতে দেয় না। 'কি হল দিয়ে যা!'

কাঁচিটা কুড়িয়ে সামনে এগিয়ে আসে মতি। 'তুমি সত্যি মারছিলে?'

'ভাইকে দিদি মারতে পারে নাকি?' হাসে মিতা। 'যা কাজ করতে দে।'

মতি পেছন ফিরে বিস্ময়ে ও রহস্যময়তার ধন্দে পড়ে গিয়ে মিতাকে দেখতে দেখতে বেরিয়ে যায়।

মতি চলে যেতে স্বস্তি পায় মিতা। সত্যি সত্যি মতিকে মারতে পারলে তার গায়ের জ্বালা জুড়তো।

ঘর কেমন ছায়া ছায়া হয়ে এসেছে। বাল্বটা জ্বালিয়ে দেবার কথা মতিকে বলতেই পারতো। মতি চলে যেতে একা হয়ে পড়ে মিতা, ফর্মাঘরে। নরেনহীন আরো একা। উঠে দাঁড়ায়। সুইচবোর্ডের কাছে গিয়ে আলো জ্বালায়। দরজায় হাত রাখে। বাঁ হাতটা। সঙ্গে সঙ্গে নিঃসঙ্গ একা বেরিয়ে আসে গলিতে। গলির মুখে তাকিয়ে দেখে নরেন ঝুলে থাকা টিনটা বাঁচিয়ে গলির ভেতর ঢুকছে সাবধানে। মিতা পুলকিত বোধ করে ভীষণ। এতক্ষণ পরে অপেক্ষা তার ঘুচল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই নরেনের আসা দেখে। নরেন মুখ গুঁজে আসছে, মিতাকে দেখতে পায় নি, দরজায়।

নরেন ভাবছিল মিতার কথাই। মিতা তার ফর্মাঘরে এখন একা থাকে। মিতাকে সে কেমন করে যেন ভালবেসে ফেলল। মিতার জন্যে তার মন কেমন করে এই কথা ভেবে যে মিতা তার মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছে এ রকম অবস্থায় তার বড় ভয় লাগে। মিতা এমন করে জড়িয়ে যায় কেন তার জীবনে? একটু সময় পেয়েছে, ছুটে আসছে মিতার কাছে। এ প্রেম কষ্ট হয়ে তাকে বেঁধে রাখছে। ভীষণ ব্যথা। তার স্ত্রী, মেয়ে আছে। তবু সে মিতার প্রেম চায়। স্পর্শের ভেতর মিতাকে কাঙ্ক্ষা করে। গন্ধের ভেতর মিতাকে কাঙ্ক্ষা করে।

'আপনাকে দেখতে পেয়েছি, আপনি আসছেন।' মিতা হাসে।

নরেন মিতার গায়ের পাশ থেকে ঘরে ঢোকে।

মিতা নরেনের পেছনু পেছনু ঘরে এসে ঢোকে। গায়ের পাশে দাঁড়ায়। নরেনের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। মিতার কাঁধে তার বাঁ হাতটা রাখে।

মিতা বলল, 'আপনার এমন বড় বড় শ্বাস পড়ে কেন জানি।' নরেন এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে মিতাকে অপলক চোখে দেখে! মিতা নরেনের গায়ের কাছে আরো ঘেঁষে যেতে চায়। ঘাড় ভেঙে মুখ আনত হয়ে ওঠে। আঁচলের খুঁট হাতে জড়ায়। নিজেকে দেখে, নিজেকে দেখায় যেন।

মিতার থুতনি বাঁ হাতে ধরে মিতার দিকে তাকিয়ে থাকে নরেন। থুতনি ধরার প্রতিক্রিয়ায় মিতা নরেনকে দেখে ভেতরের কাঁপুনিতে। 'সত্যি বলেন না, আপনার বড় বড় শ্বাস পড়ে কেন? আমাকে না পাবার জন্যে দুঃখ হয়?'

নরেন এই কথার উত্তর দিতে পারে না।

'আমি জানি, সে জন্যেই আপনার বড় বড় শ্বাস পড়ে।'

নরেন তার পাওয়ার ভেতর মিতাকে পেতে পারে না বলে দীর্ঘশ্বাস পড়ে। এটা ধরতে পারে মিতা। মিতাকে নিয়ে নরেনের অসহায়তা বোধ ধরতে পারে মিতা। তাতে মিতার কষ্ট বাড়ে। কারণ নরেনের এই দীর্ঘশ্বাস তাকে ভালবাসার কারণেই। নরেনের অসহায়তা তাকে ভালবাসার কারণেই। সেই ঘূর্ণির ভেতর পাক খায় মিতা। এ ভীষণ কষ্ট।

'কি হল, কথা বলছেন না কেন?' থুতনিতে ধরে রাখা নরেনের হাতটা নিজের দুই হাতে সজোরে চেপে ধরে মিতা। 'চুপ করে থাকবেন না। কথা বলেন।'

নরেন কথাহীন, অনেক কথা হয়ে মিতার মনে বাজতে থাকে নরেন। তাকে জীবনে না পাওয়ার বেদনা ও অসহায়তা প্রকাশ করে ফেলছে নরেন। মিতা কাঁপতে কাঁপতে নরেনের হাত দুটি নিজের বুকে চেপে ধরে আরো কাঁপতে থাকে। 'আপনি চুপ করে থাকবেন না।' বুকে গুঁজে রাখা নরেনের হাত দুটির ওপর নিজের মুখ নামায় মিতা। ঠোঁট ছোঁয়ায়। 'আপনি কি ভাবছেন অত?'

নরেন হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'কিছু না।'

'আপনার মনের অবস্থার কথা বুঝতে পারি। আমাকে নিয়ে আপনার সমস্যা হয়?'

'তোমাকে পেতে আমার ভাল লাগে বলে কষ্ট হয়।'

'আমাকে ধরেন, আমি পড়ে যাচ্ছি।' ধীরে ধীরে বসে পড়ে মিতা। নরেন তাকে ধরে। নরেনের নিষ্ঠুরতা উপলব্ধি করল মিতা। সে পড়ে যাচ্ছিল, তাকে ধরতে এগিয়ে এল না নরেন। এমনি ভাবেই কি তাকে উৎপাটনের সামনে ঠেলে দিয়ে নরেন চুপ করে থাকবে? 'আপনাকে দেখতে না পেলে আমার ব্যথা হয়।'

'আসব।'

মিতা মনে মনে প্রশ্ন করে, শুধু আসবে? আর কোনো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেই নরেনের? স্বাভাবিক, নরেন এই জায়গাতেই ভয় পায়। নরেনকে জীবনে পাচ্ছে না বলে, এই বেদনায় নরেনকে প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না মিতা। নরেনের এইটুকু আসা, দেখা হওয়া, হারাতে পারবে না। নরেন তাকে জীবনে পাবার জন্যে কোনো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা না করুক, এই আসাটুকু বন্ধ না করে। এইটুকু হারিয়ে গেলে কী নিয়ে বাঁচবে মিতা?

'আপনি এমনি এলেন, না কোনো কাজের কথা নিয়ে এলেন?'

মিতার এটা জানতে ইচ্ছে করে।

'এমনি এলাম।'

আবার কাঁপুনি এসে নাড়ায় মিতাকে। নরেনকে গভীর চাহনিতে দেখতে থাকে।

'আবার কাজ এসেছে অনেক ?'

'হ্যাঁ।'

'কথা দিন, আর কাউকে সেলাইয়ের কাজে নেবেন না ? আমি অনেক রাত পর্যন্ত একাই কাজ করে সামাল দেব। তাহলে আপনাকে একা পাব না ফর্মা-ঘরে। আপনি আমার কাছে এসে বসলে শান্তি পাব।'

'ঠিক আছে।'

'আমি রাতেও থাকতে পারি এখানে।' লজ্জায় মুখ গুঁজে ধরে মিতা। তারপর কথাটাকে স্বাভাবিক করে বলে, 'সারারাত কাজ করে যেতে পারব।' মিতা জানে, এই কথায় সে নরেনের ফর্মাঘরে একা রাত থাকার কথা বলছে। যাতে, রাতে তাদের ভালবাসার তীব্রতা বাড়তে পাবে। যেখানে দেখা হবার সুযোগ হয় না, অনেক কথা বলার সুযোগ হতে পারে। এই কথার ভেতর সহসা এক ইঙ্গিত তৈরি হয়, সে ইঙ্গিত মিতা তৈরি করতে চায় নি, বলতে চায়নি। এমনিতেই সে ইঙ্গিত চলে আসে। বরং তাতে ভয় পায় মিতা। চরমতার কথা বলে ফেলার ভয়। সে কি নরেনকে রাতে একা পেতে চায়নি ? সব গোলমাল পাকিয়ে যায় মিতার। নরেন দেখছে তাকে। মুখ গুঁজে আছে মিতা।

'যাই।'

'চলে যাচ্ছেন ?' মুখ তোলে মিতা।

'হ্যাঁ, কাজ পড়ে আছে।'

'আর বসবেন না ?'

'না।' নরেন হালকা হাসল। নরেন ভাবল, রাতে কখনো মিতা ফর্মাঘরে থাকবে, আর সে তার কারখানায় থাকবে, এই অবস্থায় ফর্মাঘরে মিতার কাছে আসার জন্যে সে কি ছটফট করবে না ? অস্থির হয়ে উঠবেই গভীর রাতে। মিতার কখনো কোনোদিন ফর্মাঘরে রাত কাটানোটা আকাঙ্ক্ষাও করে ফেলে নরেন। কিন্তু এই সম্পর্কের পরিত্রাণ কোথায় ? নরেন কি জড়িয়ে পড়বে না ? তাকে এই বিপদের মুখে পড়তে হবে, মিতা ফর্মাঘরে একা রাত কাটালে সে সেই বিপদোন্মুখতার কথায় আলোড়িত হয়। যে বিপদ সে নিজেই ডেকে নেবে। ফর্মাঘরে মিতা রাত কাটালে নরেন কারখানায় একা খিল এঁটে থাকতে পারবে না। মিতা তাকে টানবে। মিতা তার জীবনকে টলায়। মিতাকে সে ভালবাসে। নিভৃত ঘরে মিতা একা রাত কাটালে নরেন দুর্বল হয়ে পড়বে বড়। পারবে না, একা কারখানায় থাকতে। মিতা তাকে টানে। তার জীবন চুরমার করে দেবে সেই মুহূর্তটিতে। ঘটনার সমর্পণে জীবনের সর্বনাশ সে বসতে পারে। তার পরিবার সংসার সমাজ মুছে যেতে পারে। কেননা সে মিতাকে ভালবাসে। তিল তিল করে কারখানা গড়ছে সে। সে ভাবনার ভেতর নিয়ে ফেলে মিতা। সেই ভাবনা এড়াতে চায় নরেন। এ ভেবে সেই

ভাবনা তাড়ায়, সে ঘটনা সেই মুহূর্তে এখনের নয়। সে তখন প্রতিরোধ বা আহ্বান করবে কিনা তখনই দেখা যাবে।

'গেলাম।'

নরেনের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে মিতা।

কারখানায় কাজ বেড়েছে। খুব সকাল সকাল আজ আসতে হয়েছে মিতাকে। নরেন রাতে থাকে কারখানায়। সারারাত প্রায় কাজ করে। তার সেলাই ও ভাঁজাইয়ের কাজে টান ফেলে দেয়, নরেন রাত জেগে কাজ করে বলে। তাছাড়া দিনে এক কারিগর ও এক সাগরেদ নিয়ে কাজ করে। তাকে ফর্মা সেলাই ভাঁজাই যোগান দিয়ে যেতে হয়। নরেনের নিষ্ঠুরতার ত কোনো তুলনা হয় না। হয়তো এদিন সেলাইয়ের কাজের মেয়ে তার সঙ্গে জুতে দিল। সেজন্যে মিতাকে আপ্রাণ কাজ করে যেতে হয়। আজকেই সে মনে মনে সাধ করছে, কারখানায় রাত থাকবে। কাজের চাপ, তাই নরেনকেও কারখানায় থেকে যেতে হচ্ছে। বেলঘরিয়ার বাড়ি সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন নরেন।

কিন্তু মিতা রাত থাকবে, তার বাড়ি কি ভাববে? সে যে বাড়ি ফিরল না ওদেরকে বলবে তার শরীর খারাপ হয়েছিল। তার এমন শরীর খারাপ হতে পারে না যে সে বাড়ি ফিরে যেতে পারল না! এমন ত মানুষের হয়েই থাকে মাথা ঘুরে পড়ে গেল, হেঁটে চলার শক্তি নেই। এই শরীর খারাপ হওয়াটা বিশ্বাস করাতে হবে তার শ্বশুর দেওরদের সংসারে, তাকে নিয়ে দুশ্চিন্ত মুখগুলিকে। তার মন সেই ঝোঁক নেয়। এই ঝোঁকেতে মন বেঁধেছেও। আজ সে নরেনের ফর্মাঘরে থাকবে। সন্ধ্যাবেলা একফাঁকে গিয়ে নরেনকে জানাতেও হবে তাকে। নরেন জানল না, সে ফর্মাঘরে রাত কাটাচ্ছে, তার কোনো মূল্য নেই। নরেন জানবে। এই ঝোঁকিতে মিতার সমস্ত কিছু ছারখার হয়ে যাচ্ছে। সেই কথার হদিস কেউ জানে না।

কারো কথা ভাববে না। তার দেওর জা শ্বশুর, তার ছেলে দিপুর কথা ভাববে না। এ যুক্তিও সাজাতে পারে, সারারাত আর্জেন্ট কাজ সকল কর্মচারী মিলে তারা করেছে। মালিকের সুবিধে কীসে হয়, তাদের দেখতে হয়।

এই যুক্তির কথা বাদ দিলেও তার থাকতে ইচ্ছে করছে। দুরন্ত ইচ্ছে। দুর্মর। তার সামনে সমস্ত দেয়াল খুলে ফেলছে। এই একসঙ্গে থাকার ভেতর নরেন যদি নতুন রকম সংকল্প তৈরি করে, তার যদি আর একটা বউ হয়, তাহলে সমস্ত নিন্দাকলঙ্ক সইতে পারবে মিতা। আজকের রাত থাকার ভেতর পালা পরিবর্তনের সন্ধিসময় তৈরি করে মিতা। আজ রাতের ভেতর যদি তার জীবনের পর্বান্তর খুঁজে পায়! নরেন তাকে ভালবাসে। আজ থেকেই যদি তাকে আর বারাসাতে ফিরতে না হয়—এমনও হয়। ফর্মাঘরেই রয়ে গেল। তার শ্বশুরঘরের সবাই কলঙ্কের কথা জেনে, এখানে মুখ

দেখাতে আসবে না। মিতা মুক্তি পাবে। এই বিষ সংসার থেকে মুক্তি পাবে। সে ওদের কাউকেই চায় না। নরেন চাইলেই হয়। নরেনের রক্ষিতা হয়েই থাকবে।

তাছাড়া, এখানে নরেনের সহযোগী কেউ থাকার দরকার আছে, এই দৈন্য নরেনকে নিশ্চয় উপলব্ধি করতে হয়। রাতে একটু রান্না করে দেয়া। নরেনের শ্রমের সঙ্গে শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করার দরকার আছে।

কিন্তু নরেনের স্ত্রী শ্যামলী কীভাবে নেবে? শ্যামলী যদি এসে কিল ঘুঁষি লাথি মেরে যায়, সইতে পারবে মিতা। নরেনই পারে, শ্যামলীকে রুখতে। শ্যামলীকে ছেড়ে দেবার কথা বলে যদি ভয় দেখায়? শ্যামলী আপসে মেনে নিতে বাধ্য হবে। আর পুরুষমানুষ বেহাত হয়ে গেলে তাকে ফেরানো বড় কঠিন জানবে শ্যামলী। নরেনকে তেমন হাত করতে চায় মিতা। নরেন তার হাতে চলে আসবে। বেলঘরিয়ায় শ্যামলী তার মেয়েকে নিয়ে থাকুক না। মাসোয়ারা পাবে।

প্রথম প্রথম মানুষ তাদের সম্পর্ককে নিন্দাকলঙ্কের ভাববে। পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। যেমন চলে, ঠিক তেমনভাবেই চলবে। সকলের চোখে সহজ স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠবে। তাদের সকলে মেনে নেবে। এমন কি শ্যামলীও ধীরে ধীরে মেনে নেবে।

তাদের প্রেমের আকর্ষণ এতই প্রবল হবে যে নরেনের মন ফেরাতে পারবে না কেউ। নরেনের বন্ধু বিমল বুঝিয়েও পারবে না। বিমল হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। নরেনের মন অটল অনড় থাকবে। নরেন তার হয়ে থাকবে। মিতা পাবে নতুন জীবন। এসব কি হয় না?

স্বপ্নকল্পনার জাল বোনে মিতা। অদ্ভুত তার মন আলোড়িত হয়। ফর্মা ভাঁজাই করছিল মিতা। মুখ গুঁজে। তার মুখে এক হাসি গেঁথে থাকে। চুলে তেল মেখে স্নান করেছিল। মাথার ভেতর এক তাজা ভাব উপলব্ধি করে মিতা। কপালের ভেতর ভাবনাগুলো সুখসিক্ত হয়ে উঠেছে। মন ভাল হয়ে থাকার আনন্দে সে ভরে উঠেছে। তার শরীর মনে এক তাজা ভাব। সুন্দর, বড় সুন্দর হয়ে আছে সে। তার মুখে হাসি, তাকে ধরে রেখেছে। সে মুখে হাসি ধরে রেখেছে। সে হাসির ভেতর। হাসি তাকে নিয়ে খেলছে। সে হাসির একজন। তার হাসি তার হয়ে আছে। ছবির মত হাসিমুখ নিয়ে স্থির থাকে সে। ফর্মার কাগজ ভাঁজে ভাঁজে তার হাতে ছোট হয়ে এলেও তার হাসি থাকে মুখে।

এখন কত আর বেলা? সবে সকাল দশটা। ভ্রমরের মত আলোর গুঞ্জর চারপাশে। গলিতে, রাস্তায়, সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে। রেণু রেণু রোদের গন্ধ পাওয়া যায়। শৈশবের মত আলোর নরম চারপাশে খেলে বেড়ায়। চারপাশের নানা শব্দমালা মুখর হয়ে থাকে। পাতলা বাতাসের ওপর ভেসে বেড়ায়।

সঙ্গীতের মত সুর হয়ে ওঠে।

সকালবেলাতেই নরেন মিতাকে চমকে দেবার মতই চলে এল হঠাৎ। হঠাৎ। মিতার অপ্রত্যাশিতই ছিল। মনের সৌন্দর্যে ছেয়ে যায় মিতা। অদ্ভুত তার মনের প্রাণতা। নরেনের দিকে তাকিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত হেসে ওঠে মিতা। 'এখন আসবেন ভাবতে পারি নি।' মিতার স্বরে ছেলেমানুষি সুর।

'দেখতে এলাম কাজ করছ, না ঘুমচ্ছ?'

'ঘুমতে আবার কবে কখন দেখেছেন?'

'না, তোমাকে দেখতে এলাম।'

'যাঃ, সত্যি?'

'কেন নয়?'

চোখাচোখি হাসে মিতা।

'এত সব ফর্মা সামলাতে পারবে ত'

'আপনি ভাবনা করবেন না।'

'ভাবনা করবারই ত কথা, সে জন্যেই ছুটে এলাম।'

'তাহলে আমাকে দেখতে এসেছেন, বললেন মিথ্যে বললেন বলুন?'

'না, তোমাকেও দেখতে এলাম।'

'বাজে বকবেন না ত।' মিতা কৃত্রিম নাকিস্বরে বলল।

নতুন সম্ভাবে সজ্জিত মিতাকে দেখে নরেন। হাসি চোখে মিতাকে চোখে চোখে ধরে রাখতে চায় নরেন। এই দেখতে চাওয়ার এক আকর্ষণ বাড়ে মিতার এখনকার স্বভাবগুণের কারণে মিতা নিত্য তার চোখে নতুনতর হয়ে উঠছে। এখনের দেখায় এক মুগ্ধতা। মুগ্ধতার পরিমাণ বাড়ে। মিতার ভেতর নরেন এক শান্তিসন্ধান করে। উপলব্ধি করে। জেগে ওঠে বড় মায়া।

'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছেন কি? কাছে এসে বসুন ত।'

নরেন মিতার কাছে আসতই। না এসে পারত না। মিতার কাছে এসে বসে নরেন।

এখন তক্তির ফর্মার ওপর মিতার চোখ। হাতগুলি নড়াচড়া করে তক্তির ওপর। বইয়ের ফর্মা ভাঁজাই করে। তারই কারখানার বইয়ের ফর্মা। নরেনের হাসিটা লেগে থাকে মিতার মুখে। নরেন যেন তাকে ছুঁয়ে দেবে, এমন মিতার ফর্মার তক্তির দিকে মুখ করে থাকা।

'এই ত বললাম, কী বলবে বল?' মিতার দিকে মুখ নত করে নরেন।

নরেনের দিকে হাসিমুখ ফিরিয়ে ধরে মিতা বলে, 'আমি কি জানি যে বলব!'

মিতার কাঁধে থুতনি গুঁজে দেয় নরেন।

নরেনের এই ব্যবহারে কতই না অভ্যস্ত, এমন রকম গর্বিত থাকে মিতা। 'আর একজন কাউকে সেলাইয়ের কাজে নিলে আপনি কি আমাকে একা পেতেন?'

'না পেতাম না।' নরেন স্বীকার করে। 'তুমি আমাকে একা পেতে?'

'পেতাম না ত।'

'এবার বল, একা এত কাজ পারবে কী করে?'

'রাত থাকব। সারারাত কাজ করব।'

'রাত থাকবে!'

মিতা মুখ গুঁজে বলে 'হ্যাঁ।' কিছুটা তাকে লজ্জাতুর দেখায়। তারপর গণ্ডে লজ্জালাল নিয়ে পাশ ফিরে নরেনের দিকে তাকায়, 'আপনি ত কারখানায় থাকবেন?'

'হ্যাঁ আমিও কাজ করব।'

মিতা আর বলতে পারে না, নরেন যেন তার সঙ্গে দেখা করতে আসে রাতের বেলা। বলাটা তার তৈরি হতে পারে না।

নরেন বলল, 'তুমি সত্যি ফর্মাঘরে আজ রাত থেকে যাবে?'

মিতা এবার আঁচল তুলে মুখের লজ্জা ঢেকে ফেলে। এর চেয়ে বেশি কিছু বলার ক্ষমতা নেই তার। এটাই তার বেশি বলা!

মিতা তার ফর্মাঘরে সারারাত কাজ করছে, এটা কম পাওয়া নয়। নরেন, নরেন কি না-এসে পারবে মিতার কাছে? না, না এসে পারবে না। মিতা-তাকে প্রেমে পাগল করে তুলেছে। কিন্তু মিতাকে জীবনে পাবার উপায় কি? উপায় খুঁজে পায় না নরেন। গোপনে মিতা তারই হয়ে থাকুক। এতে তার জীবনের এক শান্তি সে খুঁজে পায়। জীবনে প্রেমসৌন্দর্যে থাকার স্বাদ পাবে। গোপনে পাবার এই আনন্দ নিয়ে বাঁচবে।

মিতার পিঠে হাত বোলায় নরেন। বড় শান্তি পায় মিতার মুখ দেখার জন্যে ছটফট করে। মিতা আঁচলে মুখ লুকিয়ে আছে।

কেউ এসে পড়তে পারে এই ভেবে উঠে পড়ে নরেন। 'না উঠি।' মিতা আঁচল থেকে মুখ সরিয়ে নরেনের দিকে তাকায়। 'আপনার কর্মচারী কাজ করছে কিনা মাঝে মাঝে দেখে যাবেন।'

'ফাঁকি দাও নাকি?'

'আপনি চলে যাবার পরেই ফাঁকি দিতে শুরু করব।'

'ওরকম কর্মচারীর দরকার নেই আমার।'

'তাড়িয়ে দিতে পারবেন?'

'ফাঁকি দিয়ে একবার দ্যাখই না।'

'এই ত ফাঁকি দিচ্ছি।'

দরজার কাছ থেকে হাসিমুখ ফিরিয়ে একবার মিতাকে দেখে নরেন।

এক কৌতুক দিয়ে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে।

নরেন চলে যায়। মিতা কৌতুক দিয়ে নরেনের চলে যাওয়া সমর্থণ করে কিন্তু নরেন চলে যাবার পর বড় শূন্য লাগে তার। নরেনের থাকাটা নিরব-

চ্ছিন্ন থাকা হত যদি। নরেন এসেছিল, মিতার মনের ভেতর এক গুঞ্জরণ। আবার নরেনের চলে যাবার বেদনা। দুইয়ের মিশেলে প্রেমকাতরতায় সে। নরেনকে এক মুহূর্ত ছেড়ে থাকার কথা আর ভাবতে পারে না সে। একটুও চোখের আড়াল করতে চায় না। তার গায়ের কাছে, চোখের কাছে রাখতে চায় নরেনকে। নরেন নরেন। নরেনময়তায় ভাবী হয়ে ওঠে সে ভেজা শীতল গামছার মত। বুকের ভেতর কেমন করে যেন। তরঙ্গ। তরঙ্গ। আলোড়ন। আলোড়ন। কোনো কিছুই আর ভাবনা নেই তার। তার কোনো পূর্বস্মৃতি নেই। কোনো পূর্বজীবন ছিল না। অধুনার জীবনযাপন তাকে বাঁধতে পারবে না। বাঁধতে পারবে না। দিপু তার সন্তান নয়। সতীশ শ্যামল তার দুই দেওর না। সতীশের বউ বিন্দু তার কেউ নয়। অন্ধ শ্বশুরও তার কেউ নয়।

ফর্মা ভাঁজাইয়ের ফট ফট শব্দ সারা ঘর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে। ঘরের ভেতর এই শব্দ নড়াচড়া করছে। ডান হাতের তালুতে ছোট কাঠের টুকরোটা ফর্মার কাগজে ঘষে ঘষে ভাঁজাই করে। কাজে বড় প্রাণতা খুঁজে পায়।

'ও দিদি।'

চমকে ওঠে মিতা। ঘরের ভেতর তার গায়ের পাশে মতি কখন এসে বসেছে টের পায় নি মিতা। 'ও মা, তুই কখন এলি?'

'এসেছি অনেকক্ষণ।'

'ডাকলি না যে?'

'তুমি কি সব ভাবছিলে, আর একা মনে হেসে হেসে কাজ করছিলে।'

মিতা হাসে, 'কি ভাবব আর। হাসছিলাম নাকি আবার?'

'হ্যাঁ, হাসছিলে।'

'হাসলাম আবার কখন?'

'হ্যাঁ, হাসছিলেই ত।'

'পাগল হয়েছিস? তুই আমার হাসি দেখেছিস, না অন্যকিছু। কিন্তু চুপিসাড়ে এমন এলি, সাড়া দিলি নে যে বড়?'

'চুপি চুপিই ত এলাম।'

'কেন চুপি চুপি এলি?'

'আমি তোমাকে চমকে দেব বলে।'

'আমি চমকালাম নাকি?'

'চমকালেই ত।'

'এখন যে এলি? এখন আসে নাকি?'

'বা, তুমিই ত সকালের দিকে আসতে বললে গতদিনে।'

'বলেছি বুঝি?'

'তুমি এরকম করে কথা বলছ কেন বসত? তোমার কী হয়েছে?'

'কী আবার হবে? চুপ কর। কথা বলিস না। কথা ভাল লাগে না।'

'কেন কথা ভাল লাগে না?'

'জানি না।'

'ভারি মুশকিল ত অথচ রাগ করে কথা বলছে না—আবার বলছ কথা বলিস না।'

সত্যি, মতির ওপর রেগে উঠতে পারছে না মিতা, এই সময়। মনের আনন্দ নিয়ে থাকতে চায় মিতা। সে মনের হদিস কী করে পাবে মতি? মতি তার কাছে এসে বসেছে, থাক না, এই স্নেহ এই মুহূর্তে জন্মায় মিতার। মতিকে দুঃখ দিয়ে তার কী হবে? একটু স্নেহ-মমতা মতিকে দিলই না হয়। তার মন যে আনন্দে আলোড়িত, তাতে মতিকে খেপিয়ে নষ্ট করতে চায় না। 'কি রে এখানে বসে থাকতে এলি বুঝি?'

'এলাম ত।'

'কিন্তু আমার কাজের ব্যাঘাত হয় যদি?' এটা মিতার রাগের কথা নয়, কৌতুক। কৌতুকের স্বর চেনে মতি। তাই মতি রাগ করছে না।

'তুমি তোমার কাজ কর, আমি তোমার কাছে বসে থাকি।'

'তুই নেই জেনেই কাজ করব একমনে। তুই বিরক্ত হয়ে চলে যাবি!'

'আমি বিরক্ত হলেই ত।'

'তোর কি কাজ নেই? বসে থাকবি নাকি সারাক্ষণ?'

'একদিন না কাজ করেও তোমার কাছে এসে সারাক্ষণ বসতে পারি।'

'আর এদিকে মালিক গলাধাক্কা দেবে যে?'

'দিলেই হল? কারিগরের কাজ করিয়ে নিয়ে নিম কারিগরের পয়সা দেয়। তাড়িয়ে দিলে বেশি পয়সা দিয়ে কারিগর রাখতে হবে।'

একমুহূর্ত মতিকে দেখে মিতা। মতির শরীর কত ভেঙেছে। কেমন যেন শুকনো হয়ে গেছে মতি। তার কাছ থেকে ভাল ব্যবহার না পেয়ে এমন হয়ে যাচ্ছে। মতিকে সুস্থ করে তোলার কথা ভাবে সে। মতির জন্যে একটু ভিজে উঠছে সে। তার জন্যে মতির ভাবনার বিকারগুলোকে মুছে দেবে সে, শুধু স্নেহ ভালবাসায়। মতিকে শান্ত সুস্থ করে তুলবে।

মতিকে বলে মিতা, 'একটা গান গা ত মতি।'

'সত্যি গান শুনবে? না তুমি অন্য কথা ভাবছ, তোমার মন ধরতে পারছি—তুমি অন্য ভাবনায় আছ।'

নরেনের কথা ভাবতে ভাবতে, মতির অনুযোগ শোনেই না মিতা। এই ভাবনা দিয়ে কাজেরও এক মগ্নতা তৈরি হয়।

হাত দিয়ে মিতাকে নাড়ায় মতি।

'আহ্ নাড়াচ্ছিস কেন? বিরক্ত করিস না।'

'তুমি আমার কথা শুনছই না।'

'শুনছি ত।'

'না, শুনছ না।'

'আহ্ নাড়াস না।'

'না, কী ভাবছ বল ?'

'ভাবছি তোর মাথামুণ্ডু। আমার মাথা ধরেছে, জ্বালাস না।'

'আমার কোলে মাথা রাখবে, মাথা টিপে দেব ?'

'না। অত দরদ দেখাতে হবে না।'

'তুমি চলে যেতে বলছ ?'

'কাজ ফেলে এখানে কতক্ষণ বসে আছিস খেয়াল আছে ? এবার কাজে যা লক্ষ্মীটি।'

এই কথায় মতির ভাল লাগে। মিতা চলে যেতে বলছে, চলে যাবার মন হয় এভাবে বলায়। এভাবে মিষ্টি করে বলায়। 'এখন যাচ্ছি, ছুটির পরে এসে তোমার কাছে চুপটি করে বসে থাকব।'

'তা থাকিস, এখন যা ত।'

মতির ভাল লাগে। মিতা আবার তার সঙ্গে ভাল করে কথা বলছে। খুশি হয়ে ওঠে মতি। প্রাণতা তার ফিরে আসে। উঠে দাঁড়িয়ে ফিরে ফিরে মিতার দিকে তাকায়। মিতার মধ্যে এক মগ্নতা। গলিতে বেরিয়ে আনন্দে ভরে ওঠা বোধ করে। টিনের চালাটা এখনো গলির মুখে ঝুলে আছে। মাথা নুইয়ে গলিটা পেরয়।

ঠিক দুপুরবেলা, কাজের ভেতর মিতার কথা ভাবছিল নরেন। মিতা তার ফর্মাঘরে আছে, এ কথা বেশি করে মনে পড়ে নরেনের। সে এখনো ভাবে, ফর্মাঘরে মিতা সারারাত আছে, আর সে কারখানায়, মিতার কাছে না গিয়ে সে পারবে না। না যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। এক মিষ্টি ভাবনা তার মনের ভেতর ঘুরে বেড়ায়। সবুজের মত গাঢ় ও নরম শীতল সে ভাবনা। সে ভাবনা থেকে সে আর বিযুক্ত হতে পারছে না। তার চিন্তনে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে মিতার সঙ্গে তার সম্পর্কের স্বাদ। এসব নিয়ে তার থাকা। আজ মিতার জন্যে এত আলোড়িত কেন, ভেবেই পায় না নরেন। এতখানি প্রাবল্য বোধ করে কেন ?

এত কাজের চাপের ভেতরও ঢুকে পড়তে পারছে মিতা ? এতখানি আকর্ষণ মিতার ? কাজের চাপে বাড়ি ফেরা হচ্ছে না। গত চারদিন বাড়ি যায়নি। সে কারখানায় প্রাণপাত না করলে কারখানা দাঁড়ায় না। একেই ছোট কারখানা, তার মালিক হওয়া যে কি কঠিন, হাড়ে হাড়ে টের পায় নরেন।

আজ মার্কেট যাওয়া বন্ধ রেখেছে। নতুন কাজ এই মুহূর্তে নেয়ার দরকার নেই। নিলে পেরে উঠবে না। ফর্মাঘরে সেলাই ভাঁজাইয়ের কাজ মিতা একাই করুক। এটা মেনে নেয় নরেন। না হলে মিতাকে নিভৃতে পাবে কী করে ?

তাছাড়া মিতা দুজনেরই কাজ করে ফেলছে। মিতা শুধুই দুজনের কাজ করছে না, তাকে সহায়তা করছে। কারখানার নিবিড় সঙ্গীর আচরণ মিতার। মিতা তার প্রকৃত সঙ্গিনী হয়ে পড়েছে। এই জায়গায় মিতার আর এক আসন আছে নরেনের ভাবনার ভেতর, এই উপলব্ধি করে নরেন। জড়িয়ে যায় মিতায় ভাবনায়। এসব কি তার সর্বনাশের লক্ষণ। তার কি সর্বনাশ হয়ে যাবে? তার ভেতর ঢুকছে বুঝি নরেন? নরেন পারছে না নিজেকে রোধ করতে। মিতাকে ভালবাসা সে সরাতে পারছে না।

তাছাড়া তার কাছে সমর্পিত মিতা। এবং বুঝতে পারে, তাকে কতখানি তীব্রতায় ভালবাসে। এসব সাজালে প্রতি-ভালবাসা কম হয় না। তাকে রোধ করার কেউ নেই।

বুক ভার হয়ে ওঠে নরেনের।

বড় ঘুম ধরে। কাজ আর তার সয় না। শরীর আর কাজের ভার নিতে পারছে না। এমনটা মিতা দেখলে, নরেনকে শুয়ে পড়তে বলত। নরেন পরম নিশ্চিন্তে একটু ঘুমিয়ে নিতে পারত। ঘুমের ভেতর, তার গায়ের কাছে মিতা নড়াচড়া করত। নরেনকে শান্তি দিত মিতা।

ঘুমোবার যো নেই। কাজই তাকে আটকে দেয়। আর তার এই শ্রমের ভেতরই মিতার সম্পর্কের অনুভূতি, প্রেম-ভাবনা, সঙ্গ-অধীরতা। মিতা আজ ফর্মাঘরে সারারাত কাজ করবে, কর্মচারী হিশেবে নয়, প্রেমিকা হয়ে। শ্রমের সঙ্গে প্রেম, প্রেমের সঙ্গে শ্রম মিশে যাচ্ছে। এতে নরেন ভাল রকম খাওয়া পরার সম্ভাবনা দেখছে। সাচ্ছল্যের জীবনযাপন। আবার এসব ভেসে যাবারও সম্ভাবনা দেখে। মিতার প্রেম তাকে কোথাও ভাসিয়ে নিয়ে যাবে না ত? প্রেম সাচ্ছল্য দুটিকে একসঙ্গে পাওয়া মুশকিল। একটা ধরলে অন্যটাকে ছাড়তে হয়। আজ মিতা ফর্মাঘরে থাকলে তাকে যেতেই হবে মিতার কাছে। অতি সাধারণ সে। অসাধারণ কিছু করার কেউ নয়। সাধারণ মানুষের মতই মিতার কাছে যেতে চাইবে।

ঘুমতে চায়। ঘুমতে পারে না। ভারী শরীরে হাঁসেদের হাঁটার মত চোখে ঘুম নেমে আসতে চায় তার। বসে কাজ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে নরেন। সমস্ত শরীর ভরে ঘুম আসছে।

'দাদা, দাদা!'

নরেন শুনতে পায়, কেউ তাকে ডাকছে। যে ডাকছে, সে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে, এটা বুঝতে পারে।

দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকে সবিতা—'দাদা, দাদা।'

একটু চোখ মেলে নরেন, একটু ঘুম তাড়ায়।

'দাদা, আমি এলাম, আপনাকে একটা কথা জিগাতে,—'আপনি ঘুমাচ্ছেন?'

চোখ মেলে নরেন 'হ্যাঁ' বলে ওঠে।

'আমার জানার কথা ছিল, আপনার ঘরে কাজ হবে কিনা।'

'হ্যাঁ'। ঘুমে ঢুলছে নরেন।

'কবে থেকে আসব!'

'জানি না।' ঘুমতে থাকে নরেন।

কারিগর জয়দেব ও জয়নাল দুজনেই হেসে ফেলে: সবিতাও দরজায় শব্দহীন হাসে। সে যে ভুল কিছু বলেছে, এটা তন্দ্রার ভেতর ধরতে পারে সবিতা। সচেতন ভাবে ঘুম ভাঙায় নরেন। চোখ মেলে দেখে সবিতা দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। এতক্ষণ তারই সঙ্গে কথোপকথন চলছিল তার? হাতের তালু দিয়ে চোখ ঘষে নরেন। 'হ্যাঁ, আপনি কী বলছিলেন?'

'কাজ আছে?'

কাজ ত আছে। কিন্তু কাজে নেয়া যায় না। 'না।'

সবিতা চলে যায়। আবার চোখে ঘুম নেমে আসছে। সে বসেই ঘুমতে থাকে নরেন। স্বপ্নে মিতাকে দেখে। মিতার ফর্মাঘরে আছে নরেন। মিতার সঙ্গে যেন ফর্মাঘরে নরেনের সংসার। ফর্মাঘরের দড়িতে মিতার অনেকগুলো শাড়ি ঝোলে। নরেনের জন্যে সুন্দর একখানা বালিশ। কতদিন মিতার সঙ্গে সংসার ঐ ঘরে। ও ঘরের ভেতর খুটখাট কাজ করছে মিতা। মিতা তার বউই। ঘরের নানা স্থানে অনেকগুলো ফোটো। ফর্মা ও তক্তও আছে। মিতাকে সে শুধু দেখছে। মিতা তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে।

জয়নাল তাকে নাড়ায়, 'দাদা ওঠেন, কে এসেছে দেখেন।'

ঘুম ভাঙতে চায় না নরেনের।

'ও দাদা!'

ঘুম ভাঙাতে পারছে না নরেন।

'ও দাদা বৌদি এসেছেন! উঠুন!'

খট করে ঘুম ভেঙে যায় নরেনের। চোখ মেলে দেখে, শ্যামলী এসেছে। শ্যামলীর এক-হাতে বড় একখানা চটের ব্যাগ। তাতে নানা জিনিশপত্র। কোলে মেয়ে রীণা। দেখল, রীণা তাকে চিনতে পেরেছে। মাত্র দেড় বছরের মেয়ে। ঝাঁপিয়ে আসতে চায় তার দিকে। মায়ের কোল থেকে ঝুলে এসেছে দু হাত বাড়িয়ে।

উঠে দাঁড়িয়ে রীণাকে নিয়ে নেয় নরেন। একেবারে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে।

ব্যাগ নিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে যায় শ্যামলী। ফর্মার ওপর ব্যাগটা রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শ্যামলী আঁচল তুলে মুখের ঘাম মোছে। 'কদিন যাও নি?' ফর্মার স্তূপের ওপরই শ্যামলী থুব করে বসে পড়ে। 'আবার কাজের চাপ বেড়েছে বুঝি?'

নরেন বলে,' হ্যাঁ।'

'আমি ঠিক ধরেছি।—ঘরে থির থাকতে পারছিলাম না আর। যদ্দিন কাজের চাপ থাকবে, তদ্দিন তোমার কাছেই থাকব। স্টোভ এনেছি, রান্নার যোগাড় এনেছি।'

'সেকি তুমি এখানে থাকবে?'

'কেন? তুমি থাকতে পার, আমি পারব না কেন?'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও, আগে থির হও। মুখে চোখে জল দাও ত!'

'তুমি প্রতিদিন ফিরে গেলে তবু একবেলা রান্নাভাত পেতে।'

'কটার গাড়িতে এলে?'

'দুটো চল্লিশের গাড়িতে। ভিড় ছিল না।'

মেয়ে রীণা নরেনের কোলে চড়ে নরেনের নাক ছেঁড়ে, চুল ছেঁড়ে। নরেন বলে 'উহু লাগছে।' নরেনের কাতরতার স্বর শুনে পাশ ফিরে শ্যামলী দেখে নরেনকে। দেখে তার মেয়ের কাণ্ডকারখানা। শ্যামলীর মুখ প্রসন্নতায় ভরে ওঠে। 'ওর জাঙ্গিয়াটা খুলে একটু বাইরে নিয়ে যাও ত।'

রীণার দিকে স্নেহচাহনিতে নরেনের চোখ দুটি কুঁচকে ওঠে। 'কি রে মেয়ে, চলে এলি?'

মেয়ে খিল খিল হাসে।

শ্যামলী ব্যাগের জিনিশপত্র বের করছে। শ্যামলীকে পাশ ফিরে দেখে নরেন। মেয়ে রীণাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ডান হাত দিয়ে জাঙ্গিয়াটা তার খুলতে থাকে নরেন। খুলে ফেলে। তারপর দরজার চৌকাঠের বাইরে নিয়ে আসে নরেন। মুখে সি সি ই ই ই, শব্দ করে।

রীণা হিসি না করে তার বাবাকেই দেখছে।

'হিসি করে নাও, হিসি করে নাও—সি সি ই ই ই, মাটিতে দাঁড় করাতে চায় রীণাকে। রীণা তার পা দুটি নরেনের কোলের দিকে তুলে দিতে চায়। এরকম করতে করতে মেয়ে হিসি করে ফেলে। তাকে বুকে জড়িয়ে ঘরের ভেতর নিয়ে চলে আসে নরেন। মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে। শ্যামলী জিনিশপত্তর নিয়ে পড়ল। কারখানার কাজ এই মুহূর্তে স্তব্ধ করে দিয়েছে শ্যামলী। শ্যামলী ও মেয়েকে এই মুহূর্তে পেয়ে গিয়ে নরেনের ভালও লাগে।

জয়দেব ও জয়নাল একটু কোনঠাসা হয়ে বসেছে।

মণ্টু দরজার বাইরে।

শ্যামলী সকলের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বসেছে। রান্নাঘরে যেরকম বসে।

একটা বড় বাটিতে মুড়ি আর নারকেল নাড়ু বাড়িয়ে দেয় শ্যামলী নরেনের দিকে। ছখানা নারকেল নাড়ু। নরেনের জিভে জল এসে যায় কেমন।

শ্যামলী উঠে দাঁড়িয়ে, বাঁ হাতে নারকেল নাড়ুর কৌটো ধরে, জয়নাল আর জয়দেবকে নারকেল নাড়ু দেয়।

মন্টুকে মুখ নাড়িয়ে কাছে ডাকে।

মণ্টু নারকেল নাড়ু পায়।

এসব দেখে নরেন।

শ্যামলী বলল, 'মণ্টুকে চা আনতে দাও।'

রীণাকে নারকেল নাড়ু খাওয়ায় নরেন।

'ওকে নারকেল নাড়ু দিও না। তুমি নিজে খাও।' শ্যামলী উঠে দাঁড়িয়ে জলের কলসির কাছে চলে আসে। এক গ্লাস জল গড়ায়। দুটো টাকা আর ছোট কেটলিটা নিয়ে মণ্টু চা আনতে চলে গেল। 'দুপুরে ভাত খেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ ভাত খেয়েছি।'

'হোটেলে?'

'হোটেলে।'

'কিছুদিন এভাবে খেলে, পেটের রোগ এসে ধরবে এমন, ছেড়ে যাবে না।'

নরেন লক্ষ করে শ্যামলীর ভেতর থেকে গিন্নিপনা বেরিয়ে এসেছে প্রবল রকম। সুন্দর একখানা শাড়ি পড়ে এসেছে দেখে। শ্যামলীর মুখ দেখে। সাজগোজ করে এসেছে। সংসারের মেয়েমানুষ শ্যামলী. দেখতে একেবারে হেলাফেলা নয়। সাজলে আরো মানায়।

নরেনের বুকে রীণা ঘুমিয়ে পড়তে চায়। কি অধিকার!

'মেয়েকে আমার কাছে দাও, ঘুমাবে।'

'গাড়িতে ঘুমিয়েছিল নাকি?'

'একটুও ঘুমোয় নি।'

'তা হলে ত ঘুমবে এখন।'

'ঘুমাবে। দাও আমার কাছে।'

নরেন উঠে দাঁড়িয়ে শ্যামলীর কাছে এগিয়ে গিয়ে রীণাকে দেয়। রীণা ঘুমে কাতর হয়ে আছে।

রীণাকে কোলে শুইয়ে হাঁটু দুটো নাড়ায় শ্যামলী। রীণা ঘুমিয়ে পড়ছে। শ্যামলী তাকাল নরেনের দিকে 'রাত জেগে কাজ করছিলে?'

'রাত ত জাগতেই হচ্ছিল।'

'এসে ত দেখলাম. বসে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিলে।'

চা আসে।

শ্যামলী বলল, 'সেই মেয়ে দুটো এখনো কাজ করে?'

মনে মনে চমকায় নরেন। 'একজন কাজ করে।'

'কে করছে? আগে যে ছিল, না পরে যে এল?'

'আগে যে ছিল।'

'বিমলদা আসে?' ভাঁড়ের চায়ে চুমুক দেয় শ্যামলী।

'আসে ত।' জয়দেব আর জয়নালের দিকে তাকায় নরেন। কাজ না হওয়ায় উদ্বেগ নরেনের মুখে। ওরা বুঝতে পারে।

কাজ শুরু দেয় ওরা।

চায়ের ভাঁড়ের তলানি চাটুকু নিঃশেষ করে নরেনও কাজে মগ্ন হয়ে পড়ে। শ্যামলীর কোলে শ্যামলীর মেয়ে ঘুমোয়। শ্যামলী নরেনকে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে।

বিকেল হয়ে উঠছে সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ড। ছায়াস্নিগ্ধতায় ভরে উঠছে। শ্যামলী তার মেয়েকে নিয়ে চলে এসেছে। সংসারের নানা টুকিটাকি সঙ্গে এনেছে। আর মিতা আজ রাতে ফর্মাঘরে থাকবে। এই কথাটা মনে পড়ে যায় নরেনের। মিতা ফর্মাঘরে রাত কাটালে, নরেন নিজেকে রুখতে পারত না, সে মিতার কাছে একসময় চলে যেত। না যাওয়া ছাড়া তার উপায় থাকতো না। এই উৎসাহ ও উন্মাদনায় এখন কেমন নিরুত্তেজ হয়ে পড়ে। মিতা ফর্মাঘরে রাত থাকবে, নরেনের উপায় নেই, একবার তার কাছে যাবে। যেতে পারবে না। যাবার আকুলতা থাকে, আকুলতায় উন্মাদ হয় না সে। উন্মাদনা ছাড়া আকুলতা সে বড় বেদনাময়। কেমন রকম অপ্রকাশ্য মরা হাহাকার তার বুকের মধ্যে বয়ে চলে, সে নিজেই জানে। আর কারো জানার উপায় নেই। আর কাউকে জানানর ঘটনায় সে যেতে পারবে না।

একটা ছোট আয়না আর চিরুনি এনেছিল মিতা। তার ব্যাগের ভেতরে করে। আজ রয়ে যাবে সে ফর্মাঘরে। কেউ তাকে রুখতে পারবে না। সে পৃথিবীতে নেই হয়েই এখানে রয়ে যবে। বাইরের দেখায় নিস্তরঙ্গ, ভেতরে ভেতরে উদ্দাম বহমান। ঢেউ যেন তাকে ছলাৎ ছলাৎ করে মারছে।

একটানা অনেকক্ষণ কাজ করেছে। দোকান থেকে চপ আর মুড়ি চুপিসাড়ে কিনে এনে বসে বসে খাচ্ছে। তার এখন ভীষণ ভয়। ভয় করে। অন্য কেউ তার গোপন ভাবনা ধরতে না পারে। কেউ না জানতে পারে, সে আজ ফর্মা-ঘরে থেকে যাচ্ছে। কেউ না জানতে পারে সে যে ফর্মাঘরে থেকে যাচ্ছে, আসলে নরেনের সঙ্গে একা একা নিভৃতে দেখা হবে বলে। কেউ না তার চোখে মুখে ইঙ্গিত খুঁজে পায়!

দরজা ভেজিয়ে বসে বসে মুড়ি চপ খায় মিতা। অনেকক্ষণ না খাওয়ার জন্যে খিদেও পেয়েছে দারুণ। রাত হলে চুল আঁচড়াবে। এখন নয়। একবার নরেন সন্ধ্যাবেলা দেখা দিয়ে যাবে না? হয়তো মার্কেট গেছে। কলেজ স্ট্রিট পাড়া ঘুরে সাড়ে সাতটা নাগাদ ফিরতে পারে। ফেরার পথে দেখা করে ত যেতে পারে! নরেনের সময় হয় না। আটটা পর্যন্ত ওভারটাইম চলে নরেনের কারখানায়। তারপরেও নরেন কাজ করবে।

খাওয়া শেষ। এক গ্লাস জল খায়। আরো জলের তৃষ্ণা। আরো এক গ্লাস জল খায়। শরীরের ভেতর এক পরিতৃপ্তি তৈরি হয়। বাল্বের আলো মিতার সারা শরীরে মেখে আছে। দরজা ভেজিয়ে ঘরের ভেতর আলোয় আলোয়

মিতা। আলো তাকে গ্রাস করে যেন। গ্রাস করে তার নিভৃতি। গ্রাস করে তার ভাবনা। তার ইচ্ছে। তার প্রাণতা। জীবনাকাঙ্ক্ষা তাকে গিলে ফেলেছে। বাড়ি যাবে না। বাড়ি ফিরবে না। বাড়ির লোকজন অনেক কথা ভাববে। ভাবুক। আজ সে তার বাড়িকে মিথ্যে করে দিচ্ছে। ভেতরে ভেতরে তার ভয়ঙ্কর উদ্যোগ। সচেতনভাবেই এটা করছে। প্রতিদিনের বাড়ি ফেরার কথা মিথ্যে করে দেয়।

এবার একটু কাজে বসে মিতা। সেলাই করতে লাগে। শরীরের ভেতর রক্তের গতি এত প্রবল প্রখর যে একটার পর একটা সেলাই দ্রুত তালে হয়ে যায়। ব্লাউজ আর অন্তর্বাস খুলে ফেলেছে সে। বুক শাড়ির আঁচলে মুড়ে রেখেছে। ব্লাউজ অন্তর্বাস অনেকক্ষণ পরে থাকলে কষ্ট হয় তার। সে বুঝতে পারে শাড়ির আঁচলে মোড়া তার বুক খুবই সৌন্দর্যসুখে আছে। এক পরিতৃপ্ততায় সহজ হয়ে আছে। সহজ গঠনে তার বুক তার কাছে সুখদায়ক হয়ে গেছে। কোনো বাঁধন না থাকলো, তার কী যে ভাল লাগে!

একটা গান গুন গুন করে গায় মিতা। কণ্ঠেরই ভেতর সব হয়ে মেখে থাকে গানটা। গানটার কথা ও সুর অস্পষ্ট হলেও সেটা গানই। আর এমন এক একটা গান গলায় নিলে, কিছুতেই ছাড়া যায় না, তেমন হয় মিতার। একটা কলিই বার বার গাইছে। গাইতে গাইতে গাওয়া তার শেষ হয় না। গাইতে গাইতে গাওয়া তার হয়েই চলে।

হঠাৎ কাজ থেকে উঠে দাঁড়ায় মিতা। একটু আগেও বোঝা যায় নি, সে উঠে দাঁড়াতে পারে। তার মুহূর্তের পর্বান্তরের ভেতর অথচ এক স্বাচ্ছন্দ্য তৈরি হয়। এবং গান গাইতে গাইতে একা মনে সে ফর্মাঘরের এপাশ থেকে ওপাশে যায়। একবার এ দেয়ালের দিকে মুখ ফেরায়, ফের অন্য দেয়ালের দিকে। নিজের মনে সুখে থাকার এক আর্তিতে যেন খুঁজে পায়। ঘরের ভেতর সহজ পদচারণা করে। বুকে জড়ানো শাড়ির আঁচল খানিকটা ঝুলতে থাকে। আদুল পিঠ। নম্র খোপা। হাত দুটি যেন নাচে। নিতম্বের দোলার সঙ্গে হাত দুটিও দোলে। নিতম্বের আঘাতে হাত দুটি দোলে। নিতম্বের দোলার ঘষা লাগে হাতদুটিতে। হাত দুটি শরীর থেকে আলাদা হতে চায় যেন।

নিঃশব্দে দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকে মতি। মতিকে দেখতে পায় না মিতা। মিতাকে এমন ঘরের ভেতর অলস পদচারণা করতে দেখে, কাজে না দেখে, মতির কেন যেন মনে হয়, আজ মিতা ফর্মাঘরে থেকে যাবে। স্পষ্ট মনে হয় মতির। এক দোলা লাগে মতির বুকে। মিতার নগ্ন পিঠ দেখতে পায়। নগ্ন পিঠে বুকের আভাস চলকে আসে। মতির মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে। দেখে বোঝে মিতার আজ মন ভাল। সমস্ত শরীর জুড়ে বিদ্যুৎ খেলতে থাকে মতির। হাসিমুখে তাকিয়ে থাকে মিতার দিকে। মিতা বুঝি গান গায়। মিতার কণ্ঠে সুর আর গানের কলি। মতির ভাল লাগে। নারীর নিভৃত রহস্যের স্বাদ যেন খুঁজে

পাচ্ছে মতি। গান হয়ে তাকে উদ্দীপ্ত করছে। মুগ্ধ চোখে মতি মিতার দিকে তাকিয়ে থাকে। শরীরের তেতর অদ্ভুত কম্পন অনুভব করে। উত্তাল তরঙ্গ বয়ে বেড়াচ্ছে।

'কি হল তুই! কখন এসেছিস! চমকে পেছন ফেরে মিতা। আরো চমকে ওঠে মতি।

'কতক্ষণ ধরে আমাকে দেখছিস তুই?'

'এই ত এলাম।'

আঁচলটা পিঠে জড়িয়ে নেয় মিতা। 'চোরের মত ঘরে ঢুকে পড়লি যে?' তারপর মিতা নিজেকেই নিজে সামলায়। খামাকো আজ মতিকে বকে মন খারাপ করবে না। ধৈর্য আনে। 'ছুটি করলি কখন?'

'অনেকক্ষণ।'

'আয় বোস। বেশিক্ষণ বসাব না, তারপর চলে যাবি?'

মাথা হেলিয়ে হ্যাঁ জানায় মতি।

'আমিও কাজ করি, তুই একটু বোস।'

মিতা কাজে বসে।

মিতার কাছ ঘেঁষে মতি বসে পড়ে এক আনুগত্যে।

মিতা সেলাই করে। মতির দিকে তাকায়।

'আজ খাবি কি রাতে? খেয়েছিস?'

'না খাই নি। ভাত খাব।'

'ভাত কী দিয়ে খাবি।'

'ভাত ডাল আর সবজি।'

'ক টাকায় খাবি?'

'আড়াই টাকায়।'

'রাত ত হল, এবার খেয়ে নে গে যা।'

মতি বুঝতে পারে, মিতা তাকে যেতে বলছে। তাড়াচ্ছে। কেন জানি মনে হয়, আজ মিতা ফর্মাঘরে থেকে যাবে। আর জানে, নরেন তার শত্রু। নরেনই তার কাছ থেকে মিতাকে কেড়ে নিয়েছে।

'কি হল, তাড়াতাড়ি খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড় গিয়ে।'

'তুমি কি আজ এখানে রাতে থাকবে?'

'না, না, না ত। কে বলল?'

'আমার মন বলছিল।'

হাতের কাজ থেমে যায় মিতার। 'দূর. বাড়ি ফিরতে হবে না? নটার লোকাল ধরব।'

মুখ গুঁজে আবার কাজ করতে যায় মিতা। কিন্তু কাজ করতে পারে না। মন বিস্রস্ত হয়ে পড়ে। মতি কি তার মনের গতি ধরে ফেলেছে? এলোমেলো

হয়ে যায় মিতার সবকিছু। 'যা, এবার যা।'

মতির মনে হয়, মিতা তাকে তাড়ায় কেন? তবে কি মিতার কাছে নরেন আসবে বলে? মতির মন বেপরোয়া হয়ে যায় এই কথার প্রতিক্রিয়ায়।

'যা বলছি।'

রাগ হয় মতির। উঠে দাঁড়ায়। 'যাচ্ছি, কিন্তু আবার আসব।'

'খবরদার, আর আসবি না।'

'আসব।' বলে রেগে পালায় মতি। মতিকে বারণ করার সুযোগ মতি দেয় না।

মিতার অদৃষ্টের ওপর মিতার রাগ হয়। মতি কুচুটে, তার সুখের মুহূর্তে বাধা হচ্ছে। মতিব মরণও হয় না? মতির মরণ হলে বাঁচে মিতা। বেশ হয় মতি তাকে আর জ্বালাতে আসবে না। ছাড়া হাত পায়ে থাকবে। মতি মরে যা তুই, আর জ্বালাতে আসিস না। তার ইচ্ছের ওপর যদি মতির বাঁচা মরা নির্ভর করত, তাহলে মতির মরণ চেয়ে বসত সে। রূপকথার সেই রাক্ষসদের প্রাণভোমরার মত, হাতে যদি মতির প্রাণভোমরা পেত, তাহলে মতিকে মেরে ফেলত সে। আর পাবে না মতিকে নিয়ে। তার সুখে বাধা হয়ে আসছে। আর সইতে পারছে না মতিকে। দূর হয়ে যা মতি। উচ্ছন্নে যা মতি। মরে যা মতি। কিন্তু মতির ওপর প্রচণ্ড হয়ে উঠতে পারে না বলে তার আরো কষ্ট। মতিকে প্রশ্রয় দিতে হয় বলে কষ্ট। বোধহয় কোথাও কোনোখানে মতির জন্যে একটু স্নেহ আছে তার। তবুও মতির মরণ চায় মিতা। তার একটু স্নেহ মমতার সুযোগ নিতে মতি তার যেন সুখের বাধা হয়ে ওঠে। এ সইতে পারে না আর মিতা। তাব একটু স্নেহ মমতার সুযোগ পাবে না মতি আর।

মতি আবার আসবে? কেন? মতির অন্যায়। সে যে রাত্রিবাস করবে, মতি এটা জেনে যাবে? মতি যতক্ষণ থাকবে, নরেন তার ঘরে ঢুকতে পারবে না। মিতা একা থাকবে, নরেনের আসাটা চায় মিতা।

জানে মতি আসবে। মতিকে না ক্ষেপিয়ে শান্ত করিয়ে ফেরাতে হবে। তার মাথা গরম করলে চলবে না। মতি অশান্তি না ঘটায়। আজ মনে কোনো অশান্তি আনতে চায় না মিতা। সুস্থ মনে শান্ত সুন্দর থাকতে চায়। মন তার কুসুমের মত ফুটে থাকবে। নরেনের ফর্মাধরে রাত কাটাচ্ছে। নরেন তার কাছে আসবে। বাতাসে অসন্তোষ বয়ে না বেড়ায়। মনে অসন্তোষের প্রতিক্রিয়া না থাকে। আর কাজ করতে পারে না। মনে হয় রাত নটা বেজে গেছে। উঠে দাঁড়ায় মিতা। পেরেকে ঝোলানো ব্যাগ থেকে নিজের হাত ঘড়িটা বের করে। দেখে আটটা পঞ্চাশ। ঘড়িটা আর ব্যাগে রাখে না। তক্তির পাশে রেখে দেয়।

জল খেতে ইচ্ছে করে। কলসির কাছে গিয়ে জল খায়। দরজা খুলে বাইরেটা দেখে। কেউ নেই। রাস্তার আলোয় গলির মুখটা একটু আলোকিত,

চালার টিনটা তেমনই বিপজ্জনক ঝুলে আছে। টিনটা দোলে। একটা ছায়া ওখানে দুলতে থাকে। অনেকটা শুনশান হয়ে পড়েছে চারপাশ।

ঘরে ফিরে আসে মিতা। দরজা ভেজিয়ে দিয়েছে।

তক্তির সামনে বসে। আয়না আর চিরুনিটা টেনে বের করে আনে। আয়নাটা তক্তির ওপর সেলাই ফর্মার গায়ে ঠেস দিয়ে রাখে। একটু ঝুঁকে সিঁথিটা ফোটায়। তারপর আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে চুল আঁচড়ায়। রাতে একবার চুল না আঁচড়ালে শান্তি পাওয়া যায় না। চুল তার বেশ বড়ই। চুল ভিজে থাকলে, না শুকোলে মনে অশান্তি হয় তার। চুল একটু রোদ মাখলে, বেশ লাগে। এ নিয়েও তার মনে অশান্তি কম নয়। গায়ে ব্লাউজ আর অন্তর্বাস পরবে না। রাতে গায়ে এসব রাখা যায় না। ঝুঁকে নিজের বুক নিজে দেখে।

দরজার দিকে বার বার মুখ তুলে দেখে মিতা। নরেন ঠেলে ঢুকল কিনা। কপালের টিপটা খুলে আবার পরে মিতা। খোপা বাঁধে।

দেখল মতি ঢুকছে।

মিতার গা জ্বলে যায়।

'কি হল, তুই আবার এলি ?'

'বললাম ত, আসব।'

'আমি তোকে বললাম যে আসতে, তুই আসবি !'

'আমি আসব বলেছি, তাই এসেছি।'

মিতা রাগ সামলায়, মতিকে বুঝতে না দিয়ে। মতির ওপর ক্রোধ হয় তার ভেতরে ভেতরে চিড়বিড় করে।

'আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি আজ ফিরবে না।'

'আমার ইচ্ছে, আমি আজ ফিরব না। তোর মত নিয়ে থাকব ?'

'তা থাকবে না কেন ? সত্যি কথা স্বীকার করছিলে না কেন ?'

'কী সত্যি কথা ?'

'এই যে তুমি থাকবে ?'

মিতা রেগে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারছে না।

'তুমি আমার মত নিয়ে কিছু কর নাকি ?'

মতিকে কিছুটা একরোখা দেখে মিতা।

'আমি তোমাকে কত ভালবাসি জান ?'

'জানি না ত, আমি কি তোর নিজের দিদি নাকি ?'

'তুমি নিজের দিদি হলে তোমাকে এত ভালবাসতাম না।'

'খুব ভালবাসিস বুঝি ?'

'বাসিই ত।'

মতির চিবুক নেড়ে দেয়। 'যা, এবার আমি কাজ করব। কাজে কদিন

ফাঁকি দিয়েছি বলে আজ সারারাত কাজ করে পুষিয়ে নেব।'

মতি না গিয়ে মিতার পাশে বসে পড়ে।

মিতা সেলাইয়ে মন দেয়। টুক টাক সেলাই করে। মনের যুত পায় না। 'যেতে বললাম, আবার বসে পড়লি ?'

মতি কোনো কথা বলে না। গা তার শির শির করে। বড় কষ্ট হয়। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ে।

মতির নিশ্বাসের শব্দ পায় মিতা। নিশ্বাসের গন্ধ পায়।

মিতার ডান হাঁটুতে হাত রাখে মতি।

'কি হল হাঁটুতে চাপ দিচ্ছিস কেন ? আমার লাগছে যে ? যা এবার।'

মতি কানে কথা নিচ্ছে না।

মিতা বুঝতে পারে মতি তার বুকের দিকে তাকিয়ে আছে। অস্বস্তি বোধ করে মিতা, ভেতরে ভেতরে।

সহসা মতি মিতাকে পাশ থেকে জড়িয়ে ধরে। মতির হস্ত দুটি মিতার বুক আর পিঠ বেড় খেয়ে যায়। বেঁধে ফেলে মিতাকে। এতটা বুঝতে পারে নি মিতা। মতির ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে। মিতাকে মেঝেয় শুইয়ে দিতে চাচ্ছে। সহসা এরকম ঘটনায় এই মুহূর্তে মিতা কোনো কথা বলতে পারেনা। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। মতিব হাতের মধ্যে কব্জা হয়ে পড়েছে। বুকের আঁচল খুলে দিয়েছে মতি। মতি। অন্য মতি। মতি তাকে শোয়াতে চাচ্ছে। রাগে ফেটে পড়ে মিতা। ডান হাত বাড়িয়ে মতির চুলের গোছা পেয়ে যায়। মাথার চুল ধরে মতিকে ঝাঁকুনি দেয়। হাঁটুর গুঁতো মারে মতির বুকে। মতি কাৎরে ওঠে। মিতার বুকে মুখ গুঁজে দেয়। শাড়ি বিস্রস্ত করে দিচ্ছে মতি। সায়ার দড়ি টানাটানি করছে দু হাত দিয়ে। মিতা মতির গলাটা দু-হাতের নাগালে পেয়ে যায়। মতির এই আচরণে ক্রুদ্ধ প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে। দু-হাতে মতির গলা টিপে ধরে। মতির শ্বাসনালীতে চাপ পড়ে। মতি বেকায়দায় পড়ে ছটপট করে।

মিতার মনে হল, মতিকে নিজে হাতে মেরে ফেলতে পারবে না। অথচ শরীরের শক্তিতে মতির সঙ্গে পারবে না জানে। গলা টিপে ধরেছে বলে কব্জা করতে পেরেছে মতিকে। গলা টিপে মতিকে কিছুটা কাহিল করতে চায় সে। সে যে আক্রমণ করেছে, এতেই মতি মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে। মতির গলার থেকে হাত দুটি সরিয়ে নেয় মিতা। দেখল, মতি মুখ গুঁজেই পড়ে আছে, বড় বড় শ্বাসে শরীর কাঁপছে।

মিতা উঠে দাঁড়িয়ে ঘেন্নায় ও রাগে কাঁপে। শাড়ি ঠিক করে নেয়।

প্রচণ্ড ক্রোধ হয় তার। মতির শয়তানিতে অপমানিত সে। সজোরে একটা লাথি মারে মতির মুখে।

মতি উল্টে যায়।

দুই হাতের মধ্যে চোখ দুটিকে আড়াল করে রেখেছে মতি।

মিতার ক্রোধ থামে না। 'খানকির ছেলে, বেরো।' আর একটা লাথি মারে মতিকে। একেবারে বুকে।

মতি অপমানে মরে যায়। মিতা তাকে লাথি মারছে। তাকে ঘেন্না করছে। দুহাতে মুখ আড়াল করে রাখে সে। মিতাকে তার মুখ দেখাতে পারছেনা। মিতা লাথি মারছে তাকে? যে মিতা তাকে চুমু খেত, সে কি না লাথি মারছে?

মুখে দু হাত চাপা দিয়ে উঠে বসে মতি।

দু হাত দিয়ে পেছন থেকে মতিকে ধাক্কা দেয় মিতা। 'বেরো।'

মতি কোনো কথা বলে না। কাঁদতেও পারে না। কাঁদার অধিকারও তার শূন্য হয়ে গেছে।

পিঠের ওপর ধাক্কা মারছে মিতা। 'বেরো। বেরো। আমার মুখের সামনে থেকে বেরিয়ে যা। কোনোদিন আসবি না। আমি তোর বেউ নই।'

ধাক্কার তোড়ে দরজার দিকে কিছুটা গড়িয়ে যায় মতি। তারপর মতি চোখ মেলে দেখে, সামনে তার দরজা। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দরজাটা দড়াম শব্দে খুলে ফেলে। তারপর হোঁচট খায় চৌকাঠের ওপর। তারপর তার চোখের সামনে অন্ধকার। অন্ধকার গলির ভেতর দিশেহারা হয়ে ছোটে মতি। গলির মুখে বাধা পেল। টিনের কোনাটা তার মাথায় গেঁথে গেছে।

মতির সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক নয়। মতি নেই হয়ে থাক তার জীবনের থেকে। আবার যদি মতি কোনোদিন তার কাছে আসে, মতিকে লাথি মেরে মেরে তাড়াবে মিতা।

নরেন আসবে ত? কটা বাজে? হাতঘড়িতে সময় দেখে মিতা। সাড়ে এগারটা বাজে। গলিতে পায়ের শব্দের জন্যে উৎকর্ণ থাকে। দরজা নড়ে ওঠার অপেক্ষায় থাকে। অপেক্ষা তার সয় না, অপেক্ষা ছাড়াও তার উপায় নেই।

হয়তো ভুলে গেছে নরেন। নরেনের যে মন, ভুলে যাবারই কথা। অথবা নরেন ঘুমিয়ে পড়েছে। নরেনের ঘুমিয়ে পড়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। রাত জেগে কাজ করে, তাছাড়া, দিনে একটুও ঘুমতে পায় না। হয়তো আজই তার এমনই ঘুম ধরল যে, ঘুমের হাতেই চলে গেছে নরেন। কাজ থেকে শরীর যখন সরে যায়, নরেন তখনই ঘুমোয়। নরেনের ঘুমোবার কোনো আয়োজন থাকে না। সে কারণেই মিতার ভয় হয়, নরেন ঘুমিয়ে পড়ল কি না? নরেনের ঘুমিয়ে পড়াটা তবে অন্যায় হবে। ঘুম ধরছে, বুঝতে পেরেই যদি তার কাছে চলে আসতো, তার কোলে মাথা দিয়েই না হয় নরেন সারারাত ঘুমতো। কারখানায় ঘুমলে অনুচিত হয় নরেনের। নরেন কি আসবে না? সুইচ বোর্ডের কাছে যায়। আলোটা নিভিয়ে দেয়। ঘরটা অন্ধকার হয়ে যায়। অন্ধকারময়তার ভেতর একা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে মিতা। নিজের হৃদস্পন্দনের শব্দ শুনতে পায়।

নরেন হয়তো খিল না এঁটেই কাজ করছিল বসে বসে। আর সেই অবস্থাতেই নরেন ঘুমিয়ে পড়ল। এমনটা হলে নরেনের দরজায় টোকা মেরে, নরেনকে না জাগিয়েই, নরেনের কাছে, নরেনের ঘরে যাওয়া যায়।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিতা ভাবে, নরেনকে কাছে পাবার কথা। সে এমনই জ্যামুক্ত হয়েছে। তার কোনো পিছুটান নেই। নেই-কোনো বন্ধন। নরেন ছাড়া কিছু বোঝে না এখন। নরেনই তার জীবনের সব, এই মুহূর্তে। এটা তার মন চেয়েছে। মনের গতির টানে সে সঁপে দিয়েছে নিজেকে। অন্ধকারের ঘরের ভেতর, অন্ধকারের পিঠে তার মনের নানা কথা ফোটায়। নানানাধের কথা লিখতে থাকে। অন্ধকারের ভেতর তার মুখের লজ্জা দৃশ্যমান হয় না।

তালা আঁটে দরজায় মিতা, সন্তর্পণে, শব্দহীন, গোপনতায়। কেউ তাকে লক্ষ করছে কিনা, চারপাশে দেখে। কেউ নেই। গলিতে দুটি কুকুর শুয়ে আছে। ঘুমিয়ে থাকার নিরীহ ধরন তাদের। তাদের গা বাঁচিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় মিতা। রাস্তায় নেমে দেখে কেউ নেই। কয়েকটা ঠেলা কাত হয়ে পড়ে আছে। লাইটপোস্টের চারপাশ আলোকিত। তার কাছাকাছি গলির মুখ আলোয় ভরে থাকে। রাতের গলিগুলো অচেনা অপরিচিত হয়ে ওঠে। মানুষের চলাচল যানবাহনের জটলার ভেতরই চেনা হয়ে থাকে। তার ওপর লাইটপোস্টের আলো গলির মুখে পড়েছে। গলির গহন গভীর অন্ধকারে ডুবে আছে—শব্দহীন।

চামচিকেটা তার মাথা ছুঁয়ে গেল বোধ হয়। একটা ভিজে অনুভূতি। আবার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে চামচিকেটা। সামনে পাক খাচ্ছে চামচিকেটা। তাকে বিরক্ত করে মারছে চামচিকেটা। সামনে পেছনে মাথার ওপর উড়ে বেড়ায়।

নরেনের বন্ধ দরজার সামনে এসে দেখল নরেনের ঘরের ভেতর আলো জ্বলছে। দরজার ফুটোয় চোখ রাখল মিতা। দেখল নরেন আর তার বউ। পাশে নরেনের মেয়ে শুয়ে আছে। নরেন তার বউকে ফর্মা সেলাই শেখাচ্ছে। নরেনের বউ হাসতে হাসতে সেলাই শিখছে। নরেনেরও মুখে হাসি, প্রসন্নতা, সুখের স্পর্শ।

একই রকম নৈঃশব্দে ফিরছে মিতা। পা ভারী হয়ে আসে। হাঁটতে তার কষ্ট হয়। চামচিকেটা তার চারপাশে ঘুরছে। বড় ঘুম পায়। বড় ক্লান্ত লাগে। চামচিকেটা তার মাথা ছুঁয়ে এগিয়ে যায় কিছুটা, আবার তার দিকে ফিরে আসছে।

দুদিন কাজে যায়নি মিতা। সেদিন সকালেই ফিরে এসেছিল। জ্বর আর মাথাধরা অসুখ হয় তার। অসুস্থ হয়ে ফিরছে বলে, বাড়ির লোক দুশ্চিন্তামুক্ত হয়। অসুস্থ হওয়ায় রাতে থেকে গিয়েছিল। আর বাড়িতে দুদিন অসুস্থ হয়ে

পড়ে থাকায়, সেদিন রাতে ফেরার দুর্ভাবনা বাড়ির লোকজনদের দূর হয়। তারা সন্দেহমুক্ত হয়ে শান্তি পায়। শান্তি পায় না মিতা। কোনো শান্তি নেই মনে। মনটা শরীরটাকে ভেঙে দিতে চায়। শরীরের ভেতর মনের কোনো আশ্রয় খুঁজে পায় না। সে কারণে শরীরে জ্বর। মাথা ঘোরে। মাথায় এমন ঘূর্ণি আসে যে, টলিয়ে ফেলে দিতে চায় তাকে। আছাড় মারতে চায় তাকে।

তার এই অসুস্থতায়, সকলের চোখে এক দয়ার্দ্রভাব পায় মিতা। এতে সে আরো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়াটা সে চায়ও। কারো ভাল মন্দে নেই। কেউ এসে তার কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করবে না। একা থাকতে চায় সে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট পায়। বুকে ব্যথা। শরীর দুর্বল। হাত মুঠো করবার শক্তি নেই। অনেকক্ষণ বসার পর উঠতে গেলে মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে আছাড় মারতে চায় তাকে। নিশ্বাস বুকের ভেতর আটকে যায় যেন।

দুদিন বাড়িতে আছে, একটিবারও দিপু তার কাছে আসেনি। দিপু এমনই তাকে ত্যাগ দিয়েছে। দিপুকে নিয়ে ত থাকে নি। দিপু আসবে কেন? এখন দিপুকে চাইলে পাওয়ার কোনো উপায় নেই। দিপু তাকে যেমন অবহেলা করে চলে যাবার, চলে যাবে। একটিবারও ভুল করেও দিপু তাকায় না। ভুল করে একটিবারও কাছাকাছি আসে না, কাছে আসে না। পাশ দিয়েও যায় না। পাশেও আসে না। নিজেরই ভুল হয়। কাদের ছেলে ওটা? কে? সংসারের ভেতর থেকে দিপু তার চোখে কেমন অচেনা হয়ে উঠেছে।

সকালবেলা তার ঘরের সামনে উঠোনে দরজার সামনে জুড়িসুড়ি বসে থাকে মিতা। পিঠ ও হাত দুটি আঁচলে ঢেকে নিয়েছে। কুঁজো হয়ে বসে আছে। তারই চোখের সামনে সতীশ বিন্দু শ্যামল দিপুর দৈনন্দিন বয়ে চলে। সে না থাকলেও এমন রকম বইতই। থাকলেও বয়। ওদের কোনো ব্যাঘাত হয় না। বিন্দু তার হামা দেয়া ছেলেকে উঠোন থেকে যেমন রকম কোলে তুলে নেয়, তেমনভাবেই তুলতো, তেমনভাবেই তোলে। সতীশের ডাকে থমকে যাবার এক সাংসারিকতা আছে। তাকানোর ভেতর। তাকানোর বিনিময়ের ভেতর সাংসারিকতা, প্রেম।

বিন্দু তার ছেলেকে পরিষ্কার করে, একটা জামা পরিয়ে দিতে ঘরে ঢুকল। সতীশ এই সময় উঠোন থেকে বিন্দুর ঘরে বিন্দুর কাছে ছুটে গেল। দাম্পত্যের টান। সংসারের কথা বোধহয় বলে নিতে চায়। দরজা দিয়ে দেখা যায়, বিন্দুর দুরন্ত চলাচল।

ছেলেকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে আসছে সতীশ। পাশে পাশে বিন্দু আসছে। ছেলের সঙ্গে বিন্দু খেলছে। টুকি টুকি খেলছে। বিন্দুর ছেলেও খিল খিল হাসছে। বিন্দুর ছেলের চোখে কাজল দিয়েছে বিন্দু। বিন্দুর ছেলেকে সুন্দর দেখাচ্ছে।

দিপু বিন্দুদের ঘরের সামনে উঠোনে বসে পড়ছে। তার পাশে মুড়ির বাটি। একটু করে খাচ্ছে আর পড়ছে। মিহি কণ্ঠ দিপুর। কার ছেলে পড়ছে? অন্য কারো ছেলে যেন। অপরিচিত হয়ে থাকে দিপু।

শ্যামল ঘাট থেকে মুখ ধুয়ে এল। হাতে ব্রাশ।

শ্বশুর ঘরের দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে আছে। অন্ধ। কাশির ব্যারাম। সতীশ ঘর থেকে জামা প্যাণ্ট পরে আসে। ছেলেটা তার বুকে থাকে। জামার বোতাম লাগাতে পারে না সতীশ।

একটা ডিসে রুটি তরকারি দিয়ে যায় সতীশকে বিন্দু। তারপর রান্নাঘরে ঢুকে যায় আবার।

এবার সকলকে চা দেবে বিন্দু, এই মুহূর্তটা জানে মিতা। বিন্দু সংসারে থাকে, সংসারের আনন্দ নিয়ে। এসব দেখে মিতা। মিতা সকলকে দেখতে থাকে। সকলেই তাকে কেমন এড়িয়ে থাকে।

বিন্দু ডিসে করে চায়ের কাপ সাজিয়ে মুখ টিপে উঠোনের দিকে এগিয়ে আসে। শ্বশুরকে চা দেয়। শ্যামলকে চা দেয়। একটু চা দিপুকে দিল। একটু পরে সতীশকে চা দেবে। সতীশ তার সাইকেল সারাইয়ের কারখানা চলে যাবে, তাই খেয়ে নিচ্ছে। শেষে, ফেরার পথে, মিতার কাছে চলে আসে বিন্দু। চায়ের কাপটা পাশে বসিয়ে দেয়।

মিতা চায়ের কাপটার দিকে তাকায়। কাপটা উঁচুনিচু মাটিতে বসেছে। একটু নড়ে গেছে। খানিকটা চা চলকে পড়ে গেছে।

সতীশ সাইকেল বের করে উঠোন পেরয়। তার কাছে এগিয়ে যায় বিন্দু। কিছু একটা বলতে। কিছু একটা আনার কথা বলতে গেল বোধ হয়। বিন্দু গেল, বিন্দু এমন প্রতিদিন যায়। বিন্দু ফিরে আসছে। হাসি লেগে আছে মুখে। বিন্দুর চোখ পড়ে যায় মিতার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে মিতার দিকে এগিয়ে আসে বিন্দু। মিতা বুঝতে পারে, বিন্দুর চোখে চোখ পড়ে যাওয়ায়, বিন্দু তার কাছে এগিয়ে আসছে। না হলে না দেখার মত করে চলে যেত। না দেখার সচেতনতায় তাকে এড়িয়ে যেত।

'কি হল, চা খেলে না ?'

'খাচ্ছি।'

'শ্যামল —' কথাটা বলে শ্যামলের দিকে ফেরে, বিন্দু। এই কথার সুযোগে শ্যামলের দিকে এগিয়ে যায় বিন্দু। 'এখুনি বেরবে নাকি ?'

মিতা বুঝল বিন্দু তার কাছ থেকে সরে থাকতেই চায়। কাছে আসে যখন কর্তব্যপালন করে।

'শ্যামল বলল 'বেরব।'

শ্যামলও বেরিয়ে যাবে। শ্যামল ঘরে থাকেই না একেবারে। রাজনীতির নানা প্রোগ্রামে তাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। রাতে শুধু ঘুমতে আসে। কোনো কোনো রাতে ফেরেও না।

দিপু পড়ছে।

শ্বশুরমশাই কাশছে।

রোদ খেলা করছে উঠোন তলায়। একটা একুনে শালিক উঠোনতলার রোদের ভেতর চরে বেড়াচ্ছে। থুব থুবিয়ে হাঁটে। রোদ মেখে মেখে বেড়াচ্ছে। মিতার চা খেতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু চা খায় না। হাতের কাছে চায়ের কাপের চা-টা পড়ে পড়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। উঠতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু উঠতে পারছে না। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে বিন্দুর হাঁটাচলা, সাংসারিকতাকে। বিন্দু রান্না ঘরের ভেতর নড়ে চড়ে। নিজের ইচ্ছে মত ঘাটে চলে যায়। দত্তদের পুকুরের শীতল জলে পা ডুবিয়ে আসে। মুখে জল ছিটিয়ে আসে। ভিজে পা থেকে জল গড়ায়। শ্বশুরের হাতে ধরা বিন্দুর ছেলে শান্ত হয়েই থাকে।

দিপু পড়তে পড়তে বিন্দু কাছে আছে কি না লক্ষ করল। বিন্দু কাছে নেই দেখে উঠে দাঁড়ায় দিপু। ঘরে ঢুকে যায় দিপু। কি একটা পকেটে নিয়ে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। তারপর পাড়ায় বেরিয়ে যায়। পড়া থেকে উঠে খেলতে যাচ্ছে, মিতাকে ভয় করে না দিপু। মিতা তার মা, কাকিমা ত নয়! কাকিমা তার সব। মা, দিপুর তেমন কেউ নয়। মিতার চোখের সামনে দিপু বেরিয়ে যায়।

এসব দেখে মিতা।

বিন্দু রান্নাঘরের ভেতরই ঢুকে বসে আছে। এটা ওটা কাজের ভেতর সে আছে।

মিতার বড় রাগ হয়। সকলের ওপর। রাগে হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। মাথা ঘুরে যায়। বুকের ভেতর যেন কেমন হয়ে ওঠে। হঠাৎ ভাবে, তার ভাবনায় এ সত্য উদয় হয়, নরেন নিষ্ঠুর, নরেন মিথ্যুক। সে নরেনকে আর ভালবাসবে না। ভালবাসলেও কি নরেনকে চোখে চোখে পাবে? কাছে পাবে? ভাল-বাসলে আরো জ্বলতে হবে তাকে। সে দহন অসহনীয়। নরেন শ্যামলীকেই কাছে কাছে পাবে, শ্যামলীকে কাছে কাছে রাখতে চাইবে। শ্যামলী নরেনের কাছে কাছে থাকে। নরেনকে কাছে কাছে রাখতে চাইবে। মাঝখানে নরেনকে ভালবেসে কষ্ট পেয়ে কি লাভ হবে তার?

আঁচলে কান্নার মুখ চেপে ধরে মিতা। শরীর কেঁপে ওঠে।

তবুও নরেনকে তার ভাল লেগেছিল। ভালবেসেছিল। নরেনেরও তাকে ভাল লেগেছিল। নরেনও তাকে ভালবেসেছিল। একথা মিথ্যে নয়। এ কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। নরেনকে না পাওয়ার বেদনার ভেতর এই সত্যকে মেরে ফেলতে চায় না মিতা। এই সত্যকে জিইয়ে রাখতে চায়। নরেন ও তার মধ্যে প্রেম হয়, তাকে মিতা নিজের মধ্যে জাগরুক রাখে। শুধু এইটুকু, এইটুকু নিয়েই সে বাঁচবে? তাছাড়া উপায় কি?

এইটুকু হারিয়ে না যায়, এইটুকু সত্যের মোহন মুখ তার চোখের আড়ালে করবে না বলে সে ফিরে যেতে চায় সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে। যতটুকু আছে তাকেও অবলম্বন করতে চায় মিতা। সে নরেনের ফর্মাঘরেই ফিরে যাবে।

নরেন তার বউ বাচ্চা নিয়ে কারখানায় থাকবে। নরেনের কাছে কর্মচারীমাত্রই হয়ে থাকবে। নরেনের ফর্মাঘরে থাকবে, এইটুকু না হারিয়ে যায়। হয়তো কখনো কোনোদিন নরেন ফর্মাঘরে এলে, নরেনকে অন্তত একটু দেখতে পাবে।

তাছাড়া তাকে কাজে যেতেই হবে। বসিয়ে বসিয়ে তাকে কে খাওয়াবে। এক দেড় মাস বসিয়ে খাওয়াবে। তারপর ? তারপর ওরাই বোঝাবে, তাদের বোঝা হয়ে আছে। সে খেটে অন্তত তার খরচটা চালাবে, ওরা সেটা চাইবে। তাছাড়া ঘরে বসে থেকে করবে কি মিতা ? এমনিতে মরে থাকে। ঘরে থাকলে আরো মরে থাকবে।

খিদে নেই। টাটকা বিচ্ছেদ নরেনের সঙ্গে। এখন এতটা হবেই। সে জানে ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যাবে। যেমন ভাবে সমস্ত কিছু গড়ায় তার নিজস্ব ধরন নিয়ে গড়াবে।

বড় ব্যথা, বড় কষ্ট।

ঘরে ঢুকে পড়ে শাড়ি পরতে শুরু করে মিতা।

ফর্মাঘরে ঢুকতেই মিতা দেখে সবিতা। সবিতা কাজ করছে।

'এই যে দিদি এলে !' সবিতা লাফিয়ে ওঠে।

সবিতাকে দেখে কেন জানি মিতার ভাল লাগে। ফর্মাঘরে সবিতার সঙ্গে কাজ করতে তার ভালই লাগবে। অন্তত সঙ্গে কেউ থাকবে তার। একা একা কাজ করা যায় নাকি ? সবিতার দিকে তাকিয়ে হাসল মিতা।

'দ্যাখ তোর জায়গায় তক্তি ফেলি নি।'

'তাই ত দেখছি।'

'কি শরীর খারাপ হয়েছিল তোর দিদি ?'

'জ্বর।'

'একা একা কাজ করতে করতে হাঁপিয়ে উঠছিলাম। ভাবি, এই আসে, এই আসে। দুদিন এলি না। পড়ে পড়ে ঘুমালি খুব ?'

'না। ঘুম কি হয় নাকি ?'

'আমারও ঘুম খুব কম হয়, জানিস দিদি !'

'ঘুম না হলে, আর কি করা যাবে বল !' সবিতার সঙ্গে কথা বলায় শান্তি খুঁজে পায় মিতা। একটু ভেতরের দিকে গিয়ে শাড়ি বদলায়। জামা খুলে ফেলে, অন্তর্বাস খুলে ফেলে। পরে আসা শাড়িটা [illegible]াটি করে দাঁড়িতে ঝুলিয়ে দেয়। মনে মনে ভাবে, একবার ধোয়া শাড়ি পরলে নেতিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে খুলে ফেলে আলগোছে তুলে না রাখলে ন্যাতা ন্যাতা হয়ে যাবে শাড়িটা।

সবিতার মুখোমুখি বসে মিতা। 'আমি জানি তুইই কাজ করছিস।'

'জানলি কী করে ?'

'আমিই ত চাবি দিয়ে বলে গেলাম, অন্য কাউকে রাখতে, শরীর খারাপ।

কাজের চাপ। এমনিতে দুজন কাজের লোক রাখার কথা। তাই তাড়াতাড়ি চলে এলাম।'

'দুদিনের বেশি ডুব মারলে মালিকরা বেকায়দায় পড়ে—বেশ করেছিস তাড়াতাড়ি এসে। আমাকেও বলল, আপনি কাজ করেন, উনি এলে উনিও করবেন।' ছোট ডিবে থেকে কি যেন চিমটি কেটে নিয়ে খায় সবিতা।

'কি খাচ্ছিস রে ?'

'বলব না।'

'বল বলছি !'

ডিবেটা বাড়িয়ে ধরে মিতাকে। 'জর্দা।'

'ও মা জর্দা খাস ?'

'পান সঙ্গে আনি। আজ আনি নি। পানের সঙ্গে একটু একটু করে জর্দা খাই। আজ এমনিতেই খাচ্ছি। খেয়ে দ্যাখ, বেশ লাগবে। বেশ কেমন নেশা নেশা লাগবে। মাথাটা চনমনে করে রেখে দেবে।'

এক চিমটি জর্দা তোলে মিতা। গালে ফেলে দেয়।

সবিতা বলল 'প্রথমটা চিবিয়ে, একবার থুতু ফেলে নে। বেশ লাগবে।' মিতা চিবোয়। বেশ লাগে কিন্তু। বেশ সুগন্ধি। মাথার ভেতর এক চিনচিনে ভাব আসে।

'কেমন লাগছে ?'

'ভাল।'

'পানের সঙ্গে খেলে আরো ভাল লাগবে।'

'আমিও খাব এবার থেকে।'

'রোজ ?'

'হ্যাঁ, প্রতিদিন।'

'আমি ত প্রতিদিন খাই।'

মণ্টু দাঁড়িয়ে আছে দরজায়।

মিতা হাঁকে 'এই মণ্টু, এদিকে আয়।' মিতা উঠে দাঁড়িয়ে ব্যাগ থেকে পয়সা বের করে।

মণ্টু কাছে আসে।

'দুটো পান আনত। জর্দাপান।—কি জর্দা রে ?'

সবিতা বলল 'শিব জর্দা।'

'শিব জর্দা দিয়ে দুটো পান আনবি, বুঝলি ?'

মণ্টু চলে যায়।

দুজনে চোখাচুখি হাসে।

সবিতা বলল 'কাজে বসবি না দিদি ?'

'আরে থাম থাম, একটু বসি, জিরোই জর্দাপান খাই, তারপর।'

'তুই কতই যেন গুণ্ডি খাস, পান না খেয়ে কাজে বসতে পারছিস না।'

'পারছি না ত। বেশ চনমনে রাখে মাথাটা।'

'এখুনি জর্দাতে মজে গেলি ?'

'না গিয়ে পারি ?'

'বেশ।'

'বেশ বেশ বেশ।'

মণ্টু পান আনে।

একটা পান নিজে নিয়ে অন্যটা সবিতাকে বাড়িয়ে দেয় মিতা।

চিবোতে শুরু করে। গা দোলায়। মাথা দোলায়।

সবিতা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে মিতাকে।

'এই, মাথা ঘুরছে রে সবিতা।'

'হি হি হি' হেসে গড়িয়ে পড়ে সবিতা। 'কেমন বাহাদুরি! যা কিছুটা পিক ফেলে আয়।'

মিতা উঠে দাঁড়িয়ে দরজার কাছে গলির মুখে যায়। টলে পড়ে যাচ্ছিল দরজায় বাঁ-হাত চেপে নিজেকে সামলায়। একটু পিক ফেলে আবার ফিরে আসে নিজের জায়গায়। তাকিয়ে দেখল সবিতা হাসছে।

'কি হল, মাথা ঘুরছে ?'

'ঘুরুক। বেশ লাগছে কিন্তু ?'

মিতা কাজে বসে যায়।

সবিতা কাজ করতে করতেই বলে 'কি অমন গুনগুন করে গাইছিস ? জোরে গা না!'

'কেন, গান শুনতে ইচ্ছে করছে বুঝি তোর।'

'তুই গাইলে আমি শুনতে পারব না ?'

মিতা গেয়ে ওঠে। 'পান দিনু সুপারি দিনু ভিনদেশীয়া খাইও অঞ্চল কাইটা রুমাল দিনু বাতাসে উড়াইয়ো বন্ধু রে…' কলিটা গেয়ে গেয়েই চলে মিতা। কাজ করতে করতেই গায়। মিতাকে বড় উচ্ছল লাগে।

'অন্য একটা গা না দিদি। তোর গলায় আজ গান ভাল জমছে। সেই গানটা গা না 'নাই টেলিফোন, নাই রে পিওন, নাই রে টেলিগ্রাম, বন্ধুর কাছে মনের খবর কেমনে…'

'যা, এ গানটা ভাল নয়।'

'তবে অন্য গান ধর।'

'চুপ কর। মনে করতে দে।'

'আরে দে দে কানাইলাল বসন আমার হাতে দে / কুলনারী মরি লাজে যে / আমরা যত কুলনারী স্নান করি এই জলে / বসন লইয়া কানাই উঠল কদম ডালে রে · তুমি ত সুন্দর কানাই, আমি তোমার মামি / কোন সোহাগে কহ কথা আমি তোমায় জানি'…গানের সুরে ও কথায় মিতার শরীর দোলে। এবং চোখে

এক নাচুনি খেলা করে। সুর ও কথায় মজা দিয়ে গান গায়। তাতে সে মজা পায়। মজা দেয় সবিতাকেও। এই গানের ভেতর কাজ একটা গতি পায়। একটার ওপর আর একটা ফর্মা রেখে সেলাই করে, সুতো টানে, কনুই ভাঁজ খাওয়া দুটি হাত আড়াআড়ি আগায় পেছয়। নমনীয়, অথচ দ্রুতগতি। মন গুঁজে রাখে কাজের ভেতর। একটা ফর্মা সেলাই হয়ে গেলে আর একটা ফর্মা টেনে নেয় সহসা। তার সঙ্গে গান চলে। রসের গান না হলে জমেই না। গানের সুর ও কথার আঘাতে কাজের ভেতর শরীরে এক তরঙ্গ সৃষ্টি করবে। তরঙ্গায়িত দেহ কাজের ভেতর তবে আনন্দ খুঁজে পায়। একই গানের কথা, একই সুর, দীর্ঘ সময় ধরে বয়ে যেতে থাকে। তার কোনো বিরাম নেই। গেয়েই চলে। গেয়েই চলে। আরে দে দে কানাইলাল, সুরে কথা, কথায় সুর মিলেমিশে যায়। হঠাৎ মিতার কণ্ঠে গানটা সরে যেতে থাকে। একটু আগেও বোঝা যায় নি গানটা সে সরিয়ে রাখবে। একেবারে থেমে যায়। দুজনের মাঝখানে এক নীরবতা এঁটে আসে। এই নীরবতা দিয়ে বোঝা যায়, তাদের মাঝখানে গানটা কত প্রাণবন্ত ছিল। এবং তাদের গানের নিহিতে কত মৃত নীরবতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। এই নীরবতার ভেতরই বাতাসে ধুলো ময়লা উড়ে উড়ে ঘরের ভেতর ঝুল জমে। ব্যথার ভেতর ব্যথা জমে।

এই নীরবতা সইতে পারে না মিতা। কিন্তু নীরবতা ত একসময় আসেই। কিন্তু তবুও সে চেষ্টা করে সরব উচ্ছল হয়ে উঠতে। মৃত নীরবতাকে সরিয়ে সরিয়েই বাঁচে, অধুনার জীবনে। স্মৃতির জীবনে বাঁচে না। স্মৃতির জীবন সাম্প্রতিকের যাপনের কোনো কিছু নয়। অন্য রাষ্ট্র, অন্য দেশ ছিল তার দেশ। স্বামী ছিল, সংসার ছিল। চেনা আকাশ ছিল, চেনা মাটি। চেনা গাছপালা। চেনা নদী, চেনা দিঘি, চেনা পথ ঘাট, চেনা মানুষ, ঘাস, ফড়িং, পাখপাখালি, সোহাগসৌন্দর্যে ছিল। সবকিছুই সে হারিয়েছে। তার মৃত নীরবতার ভেতর এসব মৃত অতীতের বাস। সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে তার বাঁচা কোনো অতীত দৃশ্যে বাঁচা। কোনো মৃত নক্ষত্রের মত দৃশ্যমান হয়ে থাকা। সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ড মৃতশ্বাসে ভবতে থাকে। পূর্ববাংলার ঝঞ্ঝাতাড়িত মানুষদের নিয়ে এই নেটিভ এলাকা। তাদের স্বজনদের মৃত্যুশ্বাস তারা ফেলে গেছে। আজও যারা আসে হয় বিধবা, নয় বিধবার সন্তান। তাদেরও মৃত্যুশ্বাস থাকে নিশ্বাসে, বাতাস ভরিয়ে দেয়। দরিদ্রসীমার নীচে নীচে জীবন জীবিকা, মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করেই বাঁচা।

সবিতা—'কি হল গা থামালি ?'

'না গান থাক, কথা বল।'

'কি কথা বলব ?'

'কিছু একটা বল।'

'কথা খুঁজে পাই না।'

'নতুন কথা মনে করলে পাবি না, পুরনো কথাই বল। তোর ভাইয়ের কথা বল।'

'ঐ ত মারামারি করে বেড়ায়, পাড়াতে। তোর দেওর শ্যামল ?'

'পার্টি করে বেড়ায়।'

'তোর ছেলেটা ত তোর জায়ের ন্যাওটা।'

'তোর ছেলেও ত তোর বৌদির কাছে থাকে।'

'তোর শ্বশুর সারারাত কাশে ত ?'

'চোখ খুইয়েছে. এখন কিছু আর দেখতে পায় না।'

'রাতে ঘুম কম হয় কেন বল ত ?'

'জানি না।

'নিজে হাতে রান্না করতে আর ইচ্ছে করে না, বল ?'

'না. নিজে হাতে রান্না করতে আর ইচ্ছে করে না।'

'কেন ?'

'জানি না।'

'শুতে যাবার আগে মুখে হাতে পায়ে জল দিয়ে নিবি।'

'জল কোনো কোনোদিন দিই, কোনো কোনোদিন দিই না।'

'প্রতিদিন দিলে আরাম পাবি।'

'আরাম আর কি পাওয়া যায় !'

'না তেমন আরাম পাওয়া যায় না।'

'তবে যে বলিস ?'

'লোকে বলে বলে বলি। তোর ত আবার খাওয়াতে রুচি নেই।'

'একেবারেই খেতে পারি না।'

'মাথা ঘোরে, টলে টলে পড়ে যাই যেন।'

আবার তারা নীরব হয়ে পড়ে। একই কথা, বার বারই তারা বলে থাকে। মৃত সব কথাগুলো। নতুন কোনো কথা নেই। বলতে বলতে তারা ক্লান্ত হয় বলে, তাদের নীরব হয়ে যেতে হয়।

সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে যে শব্দবন্ধ উড়ে বেড়ায়, থেকে যায় অস্থানিক, সেই শব্দমালা নীরবতারই সগোত্র। নীরবতাকে আরো স্পষ্ট করে দেয়। নীরবতা সেই সব শব্দমালার পিঠে পড়ে আলোকিত হয়। কাটিং মেশিনের কোপ পড়ে জীর্ণ দেয়ালের পাঁজর নড়িয়ে। ঠেলা রিকশর বিলম্বিত চলে যাবার শ্লথতা। সাইকেলের ক্রিং ক্রিং। রাস্তায় মানুষের হেঁটে যাবার ম্লান কলরব। নদীর কলস্বনের মত অবাধ নয়। উচ্চকিত নয় গলিতে হেঁটে যাবার হালকা পদশব্দ। ঘিঞ্জি কারখানাগুলি। একটার গায়ে আর একটা। অন্ধকার সেঁতসেঁতে। আকাশ পৌঁছতে পারে না। উপচে পড়া দুর্গন্ধে ভরা পায়খানা-বাথরুম পূতিগন্ধময় ড্রেন। এঁটো ও লেইয়ের গন্ধ বাতাস ভরিয়ে রাখে। একটা ছোট ঘরে আট দশজন কাজ করে। কোনরকমে বসার জায়গাটা পায়। ঘরের মাথায়

মাচা বেঁধে আরো অস্বাস্থ্যকর করা হয়েছে। যেন অন্ধকূপ।

বই বাঁধাই, খাতা বাঁধাই, রুলিং, খাম তৈরি, প্যাড, লেবেল, জুতোর বাক্সো, ফাইল, লেমিনেশন, পাঞ্চিং, সিলস্ক্রিন, নাম্বারিং এসব কাজ উচ্চকিত শব্দমালা তৈরি করতে পারে না।

আর রাতে সাঁইত্রিশ নম্বর ওয়ার্ড মৃত শহর মনে হয়। নগরীর ধ্বংসস্তূপ মনে হয়। নীরবতাই তার প্রমাণ দেবে। প্রমাণ দেবে কৃপণ লাইটপোস্টের আলো। গলির নিহিতে পেঁছয় না, এমনই তার অন্ধকারের গভীরতা। কিছু শিকড়চ্ছিন্ন মানুষের এখানে জীবন-জীবিকা নির্ধারিত। জীবিকা নির্ধারিত, জীবন নিয়ন্ত্রিত। শ্রমিকদের মাসিক আয় ষাট টাকা থেকে ছশো টাকা পর্যন্ত। শিশুরা যাট টাকা পায়, অথবা পেট-ভাতে খাটে। মহিলারা দুশো থেকে আড়াইশো টাকা এক মাসের খাটুনির মজুরি পায়। দক্ষ শ্রমিকরা পাঁচশো টাকা থেকে ছশো টাকা রোজগার করে। সে যখন দক্ষ হয়, তখন তার বয়স বাড়ে, পরিবারও বেড়ে থাকে। মৃত সহবাসে থাকতে হয় তাদের।

মৃত হয়ে থাকা আর মৃত্যু দুটো আলাদা জিনিশ। মৃত্যুঘটনা মৃত হয়ে থাকার প্রতীকমাত্র হয়ে উঠতে পারে। মৃত্যু এমনই চিরন্তন চিরসত্যে প্রোথিত যে, তার কাছে মৃত হয়ে থাকার ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া মুশকিল। কেননা মানুষ মরণশীল। এই চিরসত্য দিয়ে মৃত হয়ে থাকার ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেয়া যাবে, নিষ্প্রভ করে দেয়া যাবে। সেহেতু কোনো মৃত্যুঘটনার সঙ্গে মৃত হয়ে থাকাকে প্রতীক হিশেবে নেবার একটা অর্থ আছে। একটি মৃত্যু দিয়ে এই কাহিনীর সমাপ্তি হলেও, সেটা মৃত্যু নয়। মৃত হয়ে থাকারই প্রতীক হবে মাত্র। আর গল্প উপন্যাসে রূপক অলঙ্কারে অন্বিত করারও একটা দায় থাকে। মানুষের জন্ম দৃশ্যকেও ত প্রতীক করা যেত? মানুষের জন্মও ত চিরসত্য ঘটনা। না। মৃত্যু প্রতীক করলে, মৃত হয়ে থাকাকে সত্য করা হয়, মৃত হয়ে থাকার ভেতরও ত জন্ম থাকেই। আর জন্মকে উৎস করেই মৃত্যুকে প্রতীক করা হচ্ছে।

মৃত্যুটা আর সকলের মৃত্যুর মতই স্বাভাবিক। যেমন গ্রামে গঞ্জে শহরে মানুষ বিনা চিকিৎসায়, অনাহারে উপবাসে, দুর্ঘটনায়, রোগভোগে মরে, তেমন রকমই মতি মরে যাবে। মতির মৃত্যু অলৌকিক কিছু হবে না। মতির মাথায় টিনের কোনা গেঁথে গিয়েছিল। চিকিৎসা না করবার দরুন তার মৃত্যু হচ্ছে। স্বাভাবিক মৃত্যু। আবার চিকিৎসিত হয়েও ত মানুষ মরে। এ মৃত্যুকেও ধরে নেয়া যেতে পারে তেমন রকমও স্বাভাবিক মৃত্যু! আন্ত্রিক, জণ্ডিস, কলেরা মহামারীর মত মৃত্যু। স্বাভাবিক মৃত্যুর বাস্তবিকতার রকমটাই এখন এই রকম। অনেক মানুষ একই রকমভাবে মরলে সেটা স্বাভাবিক মৃত্যু হিশেবে গণ্য হয়ে থাকে।

যে কাহিনীর শেষ নেই, মৃত্যু দিয়ে শেষ করা, শেষ করার প্রতীকমাত্রও হয়ে উঠতে পারে। ফলে মৃত্যু দৃশ্যটা শেষ হিশেবে বেছে নেয়া হল। অথচ মৃত্যুটা কাহিনীর শেষ নয়। লেখার পূর্ণচ্ছেদ মাত্র।

মকবুলের রুলিং কারখানায় মতির বড় জ্বর, জ্বর নিয়ে পড়ে আছে দুদিন। কাজ করতে পারে নি। হাঁটাচলা করতে পারে নি। মাথায় ক্ষত। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ক্ষত থেকে মাথায় দপ দপ শব্দ শুনতে পায় মতি সারাক্ষণ। মাথাটা তার ফুলে গেছে। বেঢপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চোখের মণি দুটো তার উজ্জ্বল ও নরম। এমনিতেই তার চোখ দুটি খুব সুন্দর। সুন্দর তার কণ্ঠস্বরও। সুন্দর ছিপছিপে তার শরীরের গঠনও। হাত পা বুক গলা চিবুকের মধ্যে যৌবনোত্থিত এক কমনীয়তা মেখে আছে।

সারাক্ষণই মতি পড়ে রয়েছে রুলিং মেশিনের গায়ে সরু ফাঁকটিতে। সেখানে প্রতিদিন ঘুমোয়। গায়ে জ্বর, মাথায় ব্যথা। হাঁপিয়ে উঠছে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। বুক ভরে সম্পূর্ণ নিশ্বাস নিতে পারছে না। কম করে বাতাস নেয় বলে হৃৎপিণ্ড, বুকের ভেতর তুমুল তোলপাড় জানায়। মাথার ভেতর দপ দপ্ দপ্ দপ্। এই চোখে তাকিয়ে থাকা তার ফুরোয় না। তাকিয়ে থাকে বৃদ্ধ আজাদের দিকে।

আজাদ ভাঙা শরীরে হাতে একটা গ্লাস নিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে। দোকানে গেল। আজাদ চলে যাবার পর একা ভাল লাগে না মতির। আর লোডশেডিং চলছে। একটা কেরোসিনের কুপি জ্বলছে ধোঁয়া ওগরাতে ওগরাতে। সেদিকে একবার তাকায় মতি। কুপির চারদিকেই কিছুটা আলো আর চারপাশে ছায়া অন্ধকার। মতি ভাবে, এই অন্ধকার ছায়ার ভেতর যদি একটা জোনাকি উড়ে উড়ে বেড়ায়, ভাল লাগে তার। এক দেয়াল থেকে আর এক দেয়ালে উড়ে উড়ে যাবে। অন্ধকার শূন্যে উড়ে বেড়াবে। স্বর্ণরেখা উড়বে অন্ধকারে। অন্ধকার মুছে দিয়ে দিয়ে আলোর স্বর্ণরেখাটা উড়ে যাবে। স্বর্ণরেখাটা মুছে মুছে অন্ধকার তৈরি করবে। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে মতি, তেমন একটা জোনাকি দেখার প্রত্যাশা তৈরি হয় তার। জোনাকি নেই। সে নীরব হয়ে ঘরের অন্ধকারের দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। বুকে সম্পূর্ণ বাতাস নিতে না পারার পীড়ন সহ্য করে তার বুক। তার তাকানোর ভেতর দেখা শেষ না হবার এক মায়া প্রতীয় হয়ে ওঠে। অথচ স্থবিরতায় তার বসে থাকা।

মতি একটু ঘুরে বসে কুপির শিখার দিকে তাকায়। একটা কালো ধোঁয়া উঠছে শিখার ভেতর থেকে।

বৃদ্ধ আজাদ ফিরল। হাতে ধরা গ্লাসে গরম দুধ। ধোঁয়া উড়ছে। আজাদের অন্য হাতে একটা কোয়ার্টার পাউরুটি। দেখে মতির খিদে অনুভূত হয়।

বৃদ্ধ আজাদের মতির জন্যে কিছু করার চেষ্টা। এমনিতে তার পারার কথা নয়। মতির জন্যে একটু গরম দুধ আর রুটি এনেছে। মতির কাছে বসিয়ে দেয় রুটি দুধ।

আজাদকে হাসিমুখে দেখে মতি।

আজাদ ঝুঁকে পড়ে মতির দিকে। এমনিতে আজাদ সোজা দাঁড়াতে পারে

না। ঝুঁকে পড়াই তার স্বভাব—'আর জ্বরে আছে?'

মতি মৃদু স্বরে বলল 'কি জানি।'

আজাদ তার বাঁ হাতটা মতির কপালে ছোঁয়ায়—গরম দুধের গ্লাস ধরা ডান হাতটা কপালে ছোঁয়ায় না—অভিজ্ঞ আজাদ। 'এই ত জ্বর আছে।'

'নিজে বুঝতে পারছি না, গায়ে জ্বর আছে কি না।'

'বাড়ি যেতে পারলে, যেতিস?'

'হ্যাঁ।' সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ে মতি। মনে পড়ে যায় মায়ের কথা। ভাই বোনদের কথা। গ্রামের মাট ঘাঠ তার বুকের ওপর জেগে উঠছে। মায়ের জন্যে মন কেমন করে উঠছে তার। কতদিন মায়ের কাছে যায়নি, মাকে দেখে নি।

'নে, খেয়ে নে।'

কেমন কান্না পায় মতির। কাঁদলে ব্যথা লাগবে, তাই কাঁদতে পারে না। তাকিয়ে তাকিয়ে আজাদকে দেখে।

অমনি বাতি চলে আসে।

আজাদকে আরো স্পষ্ট দেখতে পায় মতি। খেতে শুরু করে মতি। দেখে আজাদ বিছানা পাতছে। কেমন নুয়ে ভেঙে পড়া লোকটা। মতি জানে, তাকে খুব ভালবাসে। সেও আজাদকে বড় ভালবাসে। তার জন্যে খাবার এনে দিচ্ছে। মতির পয়সা নেই, নিজের পয়সায় খাওয়াচ্ছে।

বিছানায় এবার বসে আজাদ। বসে বসে মতির দিকে তাকিয়ে মতির খাওয়া দেখছে। মতি ভেবেছিল, পাঁউরুটিটা সব খেয়ে ফেলবে। এখন আর পারেনা। অর্ধেক খেয়ে আর খেতে পারে না।

মতি দেখল গেলাসে জল গড়িয়ে দিয়েছে আজাদ। আজাদকে দেখল। আজাদ তার দিকেই তাকিয়ে বসে আছে।

খাওয়ার পর আরো কষ্ট হয় মতির। বুকের ভেতরটা ধকধকাচ্ছে।

আজাদ বলল 'এবার শুয়ে পড়।'

মতি শোয়। কিন্তু কাত হয়ে আজাদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আজাদ বলল 'আলো নেভাব কিন্তু।'

'না, আলো জ্বলুক।'

'আলো জ্বললে আমার যে কষ্ট হয়।'

'তুমি ত এখন ঘুমোবে না, জ্বলুক—আর তুমি কথা বল।'

'কী কথা বলব?'

মতি বুঝতে পারে, আজাদের এখন কথা বলতে ইচ্ছে করছে। তারও কথা বলতে, শুনতে ইচ্ছে করছে। আজাদের যখন কথা বলতে ইচ্ছে করে না, হাজার ডাকেও সাড়া পাওয়া যাবে না। নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে তখন। 'কথা বল না, তুমি যা জানো। বল না ওস্তাদ। তোমার ওস্তাদ লতিব মিয়ার কথা বল।'

'লতিব ওস্তাদ আর বেঁচে নেই। সে কবে মরে গেছে।'

'বল বল।'

'সে বলতো এই রুলিঙের কারখানায়, তার ওস্তাদরা মশারি খাটিয়ে কাজ করতো।'

'কেন?'

'কাজটা দেখে কেউ যদি শিখে নেয়।'

'তারপর?'

'তারপর কত কারখানা গড়ে উঠতে দেখলাম।'

'তারপর?'

'তারপর, ব্রিটিশ আমলে রাস্তা ঝাঁট দিয়ে যেত কর্পোরেশনের লোক। ভিস্তি অলা জল ছেটাতো। সন্ধেবেলা গ্যাসের বাতি জ্বালিয়ে যেত। হোটেলঅলা পচা খাবার খাওয়াচ্ছে কিনা সরকারের লোক দেখে যেত।'

'তোমাদের সময়ে সিনেমা কথা বলত না যে।'

'টকিতে কথা এল। সে কি ভিড়। বাব্বা। লোক পাগল হয়ে গেল।'

'তারপর?'

'সোনার সংসারের মত বই।'

'বল বল।'

'এক পয়সায় নাস্তা হয়ে যেত। আমার এক পয়সা ছিল।'

'তারপর?'

'তখন রুলিং কারখানা মাত্র আট দশখানা ছিল।'

'বল।'

'অফসেট এসে রুলিং কারখানা মার খাচ্ছে!'

'হ্যাঁ।'

'কারখানা গড়ছে, কাজ কোথা?'

'বল বল।'

'খেয়ে যুত নেই, খাবার কথা শুধু ভাবি।'

'তারপর?'

'একজন বন্ধু ছিল, সে ত কবে মরে গেছে। নাম ছিল তার গাঁদা মিয়া। দোস্ত ছিল। কত মানুষ চোখের সামনে মরে গেল। কত মানুষ দুনিয়া থেকে হারিয়ে গেল। আমি মরছি না কেন? ছেলে, ছেলের বউ খেতে দেয় না। আর তেমন খাটতে পারি না। চোখে দেখতে পাই না। কবে মরে যাব টুক করে।'

'বল।'

'আর বলতে পারি না।' শুয়ে পড়ে বৃদ্ধ আজাদ। শরীরে তার জ্বরার কষ্ট। চিৎ হয়ে শুয়ে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে, কথা বলতে চায় না।

মতি বুঝতে পারে, তার কথা শুনতে ইচ্ছে করলেও আজাদকে দিয়ে একটাও আর কথা বলানো যাবে না। জেগে পড়ে থাকবে। অথচ ডাকলেও সাড়া দেবে

না। এমনটা ব্যবহার আজাদের প্রতিও করে থাকে মতি। মতির এখন কথা শুনতে ইচ্ছে করে, শুনতে পায় না।

আজাদ আলো নিবিয়ে দিয়েছে। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে মতি জোনাকি খোঁজে। কোনো জোনাকি নেই। নেই জোনাকির উড়ে যাবার স্বর্ণরেখা। আলো মুছে মুছে আগের আলোকিত রেখাকে মুছে ফেলার খেলা নেই। পরের আলোর রেখা আগের আলোয় রেখাকে মুছে ফেলবে। চোখের সামনে অন্ধকার চাক বেঁধে আছে। মাথার ক্ষতর ভেতর থেকে তার দপ দপ শব্দ হয়। একটু নিশ্বাস নিতে পারে, অনেকটা পারে না। নিশ্বাস নেয়াটা ধীরে ধীরে কমে আসছে তার, সে টের পায়। শরীরের ভেতর কেমন যেন হতে থাকে। বুকের ভেতর দম বন্ধ করা তৈরি হচ্ছে। একটু বাতাস বুকের ভেতর নিয়ে যেতে পারে, আবার দীর্ঘক্ষণ ধরে দমবন্ধ করা ছটফটানি বয়ে চলে।

সে বুঝতে পারে, তার ঘাড় কেমন শক্ত হয়ে উঠছে। হাত পায়ে মোচড় দিচ্ছে। সে ডেকে ওঠে 'ওস্তাদ !'

আজাদ কোনো উত্তর দেয় না। আজাদের কথা বলতে ইচ্ছে করছে না বলে উত্তর দিচ্ছে না। অথচ জেগে পড়ে আছে।

'ওস্তাদ !'

কোনো উত্তর নেই। আজাদ জেগে আছে, তার নড়াচড়ার শব্দ পাওয়া যায়। পাশ ফিরে শোবার শব্দ পাওয়া যায়।

মতি যতটুকু বুকের ভেতর বাতাস নিতে পায়, ততক্ষণ কথা বলতে পারে। দমবন্ধ অবস্থায়, তার বুকের ভেতর তুমুল হুটোপাটি চলে। তখন একটুও কথা বলতে পারে না। ডাকে 'ওস্তাদ !'

উত্তর দেয় না ওস্তাদ।

মতি বুঝতে পারে, সে মরে যাচ্ছে। তবু সে যতটুকু কথা বলার শক্তি পায়, তার কাছের মানুষ আজাদকে ডাকে 'ওস্তাদ !'

সে যখন কথা বলতে চায়, যখন আজাদের কথা বলতে ইচ্ছে করে না, সেই রকম আজাদ না কথা বলার নিঠুরতায় আছে।

আর কথা বলতে পারে না মতি। তার ঠোঁটদুটি নড়ে, কথা বেরয় না। দম বন্ধ হয়ে আসার সময়টা ক্রমশ বাড়ছে। শরীর বেঁকে চুরে যাচ্ছে। একটু পরে একটু বাতাস নিচ্ছে। কণা বাতাস। সে জানছে, সে মরে যাচ্ছে। না সে মরবে না। এমন একটা প্রতিরোধ তার মনে ধরে রাখতে থাকে। না সে মরবে না। যতক্ষণ তার চৈতন্য থাকে সে মনে ধরে রাখে তার নিজস্ব প্রতিরোধ. সে মরবে না।